কলিকাতার ইতিবৃত্ত

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত

ঃ ভূমিকা ঃ

নিশীথরঞ্জন রায়

পুস্তক বিপণি

কলিকাতা ৭০০০০৯

প্রকাশকের নিবেদন

কলকাতা সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বেড়েই চলেছে। এই আগ্রহের অন্যতম কারণ বোধ করি এক ধরণের বিস্ময়বোধ। একালের কলকাতায় বসে ভাবতে অবাক লাগে জলাজঙ্গলে ঢাকা অস্বাস্থ্যকর এক বাদা অঞ্চল কি করে এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-নগরীতে রূপান্তরিত হল। কলকাতার ক্রম-বিকাশ ও বিবর্তনের সেই বিচিত্র কাহিনীই প্রাণকৃষ্ণ দত্তের এই বই।

স্বীকার করা প্রয়োজন, কলকাতা নিয়ে হৈ হৈ শুরু করেছিলেন সাহেবরাই। এই শহর তাঁদেরই হাতে গড়া, কাজেই এর প্রতি অদ্ভুত এক মমতাও ছিল তাঁদের। বাঙালীর কলকাতা-চর্চায় হাতে-খড়িও তাঁদেরই অনুপ্রেরণায়। কলকাতা-প্রেমিক সাহেব এবং তাঁদের বাঙালী শিষ্যদের কলকাতা-চর্চার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। তাঁরা ভাবতেন এবং লিখতেনও যে, জোব চার্নক সাহেবের শেষবার কলকাতায় আসার দিনটি থেকেই কলকাতার ইতিহাসের সূচনা। এই দিনটি অর্থাৎ ২৪ আগস্ট ১৬৯০ কলকাতার ইতিহাসে স্মরণযোগ্য নিঃসন্দেহে, কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও মনে রাখা প্রয়োজন ইতিহাসে আকস্মিকতার কোন স্থান নেই। চার্নকের আসার আগেও কলকাতা ছিল, যে কলকাতার কালসীমা কয়েক শতাব্দী পিছিয়ে যাবে।

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত যে 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' লেখেন 'নব্যভারত' পত্রিকায়, তাতে প্রাক্-চার্নক ও উত্তর-চার্নক দুই যুগের ইতিহাসই ধরা আছে। আর আছে আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতার মানুষজন, তাঁদের আচার ব্যবহার, রীতিনীতি পালপার্বণ ধর্মকর্ম ও লোকবিশ্বাসের অনুপুঙ্খ বিবরণ। বস্তুত বাংলা ভাষায় নেটিভ কলকাতার ইতিহাস রচনার এই প্রথম প্রয়াস। কালজীর্ণ সাময়িকপত্রের ধূসর পৃষ্ঠা থেকে আশী বছর পর এই প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হল সেই দুর্লভ রচনা।

পরিশিষ্টে সংকলিত শরচ্চন্দ্র দেবের 'কলিকাতার ইতিহাস' বাঙালীর কলমে কলকাতা সম্পর্কে প্রথম বাংলা লেখা, যা ছাপা হয়েছিল। ছিয়ানব্বুই বছর পূর্বের 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় মুদ্রিত এই রচনা মূলত কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতে ইংরেজ শাসনের সূচনা ও প্রসারের কাহিনী।

প্রবীণ ঐতিহাসিক, প্রখ্যাত কলকাতা বিশারদ শ্রীনিশীথরঞ্জন রায় তাঁর বহুবিধ ব্যস্ততার মধ্যেও যে মূল্যবান ভূমিকাটি লিখে দিয়েছেন, সেটি এই বইয়ের সম্পদ।

বর্তমান গ্রন্থপ্রকাশে সবচেয়ে বেশি সাহায্য করেছেন শ্রীঅশোক উপাধ্যায়। এই বই-এর যাবতীয় পরিকল্পনা তাঁরই। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

এই বই প্রকাশের ব্যাপারে পরামর্শ পেয়েছি শ্রীশৌরীন্দ্রকুমার ঘোষ, অধ্যাপক ড. অলোক রায় ও অধ্যাপক ড. স্বপন বসুর কাছে।

শ্রীসুনীল দাস নির্দেশিকা প্রস্তুত করে দিয়েছেন। গ্রন্থ-পরিচিতি সংকলন করেছেন শ্রীবিমলকুমার পাল। শ্রীতরুণচাঁদ দত্ত নানাপ্রকারে সাহায্য করেছেন। শ্রীশংকরলাল ভট্টাচার্য, শ্রীহরিপদ ভৌমিক, শ্রীবিনয় জোশী এবং শ্রীপল্লব মিত্র কোন কোন ব্যাপারে সাহায্য করেছেন। বস্তুত এঁদের আন্তরিক ও সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়া আমাদের পক্ষে এ বই প্রকাশ করা সম্ভব হত না। এঁদের সকলকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

একটি গুরুতর মুদ্রণপ্রমাদের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। ৬৪ পৃষ্ঠার ৭ম লাইনে ‘দশ শতাব্দীর’ স্থলে পড়তে হবে ‘সপ্তদশ শতাব্দীর’।

ভূমিকা

ভারতের বহু শহরের তুলনায় বয়সের হিসেবে কলকাতা অর্বাচীন। তবু দেশ বিদেশ জুড়ে কলকাতা সম্পর্কে মানুষের মনে যতো অনুসন্ধিৎসা ভারতবর্ষের আর কোন শহর সম্পর্কে সম্ভবতঃ ততো নয়। ইংরেজ শাসন আমলে কলকাতাকে নিয়ে ইংরেজ মহলে ছিল গর্ববোধ। ইংরেজরা মনে করতো এই আজব শহরটি তাদেরই সৃষ্টি—বনজঙ্গল ভর্তি, নিচু, স্যাঁতস্যাঁতে, অস্বাস্থ্যকর এক জলাভূমিকে তারাই একদিন রূপান্তরিত করেছিল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রাসাদ-নগরী রূপে। ইংরেজ আমলের কলকাতা নিয়ে তাই ইংরেজ মহলে আত্মতুষ্টির অভাব ছিল না। এদের প্রচার এবং আনুকূল্যের ফলে বিদেশে শহর কলকাতা সম্পর্কে দেখা দিয়েছিল গভীর ঔৎসুক্য। তাছাড়া বিদেশে কলকাতা সম্পর্কে ঔৎসুক্য শুধু ইংরেজ সাম্রাজ্যের রাজধানী—এই পরিচয়টি আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। কলকাতা ছিল তখন প্রাচ্যদেশে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধানতম কেন্দ্র। সুয়েজের পূর্বাঞ্চলে ব্যবসায় বাণিজ্যে যাঁরা আগ্রহী ছিলেন তাঁদের কাছে কলকাতা ছিল ভূস্বর্গের নামান্তর—এখানকার জলে মাটিতে হাওয়ায় ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি। কলকাতায় পদার্পণ করার সুযোগ যাদের ঘটেনি তাদের মনেও কলকাতা সম্পর্কে আগ্রহের জোয়ারে কখনও ভাঁটা পড়তে দেখা যায়নি। তাছাড়া সাম্রাজ্য রক্ষার পবিত্র দায়িত্ব নিয়ে অথবা পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার বাহক হয়ে এদেশের মাটিতে যাঁরা সাময়িক আশ্রয় নিয়েছিলেন (পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে সাম্রাজ্য বিস্তারের ফলে এদের সংখ্যা ক্রমশঃ স্ফীত থেকে স্ফীততর হয়ে উঠছিল) তাঁদের স্বদেশে বসবাসকারী আত্মীয় পরিজনদের কাছে কলকাতার পরিচয় তুলে ধরার সহজাত প্রবৃত্তিও বাইরের জগতে কলকাতা সম্পর্কে অনেক কৌতূহল জাগিয়ে তুলেছিল। নেহাৎ অ্যাডভেঞ্চার-তাড়িত কিছু দুঃসাহসী মানুষ, কিছু সংখ্যক খাঁটি পরিব্রাজক, কিছু ধর্মপ্রচারক, কিছু ঘরে ফিরে-যাওয়া সিভিলিয়ান যাদের চালচলনে দেখা যেতো নবাবী মেজাজ আর সৌখিনতা সবাই মিলে কলকাতা সম্পর্কে যে সব আজব কাহিনী স্বদেশবাসীদের মধ্যে প্রচারে পঞ্চমুখ অথবা শতলেখনীধারক হয়ে উঠেছিলেন তার ফলেও

বাইরের জগতে এই শহরটি সম্পর্কে দেখা দিয়েছিল বিপুল আগ্রহ। দরিদ্র, অনুন্নত অন্ত্যজ-জাতি-অধ্যুষিত তিনটি নগণ্য গ্রামাঞ্চল জোব চার্ণক এবং তাঁর অনুগামীদের যাদুস্পর্শে কী ভাবে রূপান্তর লাভ করলো জন ও অর্থবলে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ নগররূপে—সেই কাহিনী চিত্তাকর্ষক করে বিপুল আয়াসে প্রচারিত হলো বিশ্বের দরবারে।

ইংরেজ সাম্রাজ্য আজ অন্তর্হিত—তারও আগে থেকেই রাজধানীর পালা-বদল—কলকাতা থেকে দিল্লী। তবু কলকাতা রইলো কলকাতাতেই। ইংরেজ এবং বিদেশী বণিককুল সেদিন রাজধানী স্থানান্তরের সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। শেষ পর্যন্ত তাদের আশঙ্কা মিথ্যা বলে প্রমাণিত হলো। ১৯১২-র পরেও বহুকাল পর্যন্ত কলকাতার বাণিজ্যিক গৌরব অক্ষুণ্ণ ছিল। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে এলো দেশবিভাগের প্রলয়ঙ্কর দুর্যোগ, অগণিত ছিন্নমূল মানুষের গাদাগাদি ভিড়, উপচে-পড়া শহর, দুশো বছরের উপেক্ষিত অকেজো নগর-বিন্যাসের রীতি, হুগলী নদীর ক্রমিক ক্ষীয়মান জলধারা, প্রাকৃতিক বিপর্যয়—সব কিছু মিলে মিশে কলকাতার ভাগ্যে বয়ে আনলো অভূতপূর্ব বিপর্যয়, দারিদ্র্য, স্বাস্থ্যহীনতা, পৌরশাসনে বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনীতিক ভারসাম্যের বিনষ্টি। কলকাতা তাই আজ চিহ্নিত হচ্ছে নানা সংজ্ঞায়—কেউ বলেছেন দুঃস্বপ্নের নগরী, কারো মতে মিছিল আর শ্লোগানের রাজ্য, দারিদ্র্য আর অস্বাস্থ্যের অবাধ বিচরণভূমি। এক কথায়, কলকাতার মতো সমস্যা-জর্জর এমনি আর একটি শহরের দৃষ্টান্ত আজকের পৃথিবীতে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সমস্যাকে কেন্দ্র করেই কলকাতাকে নিয়ে দেশ বিদেশে যতো ভয় ভাবনা। তাই কলকাতা আজ এক বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্নের প্রতীক। ইংরেজ আমলে যাকে নিয়ে একদিন ছিল অপরিসীম কুতূহল; আজ স্বাধীনতোত্তর যুগে তাকে নিয়েই যতো রাজ্যের ভয় ভাবনা। কেউ শিহরিত হচ্ছেন জন-বিস্ফোরণের আতঙ্কে, কেউ শুনতে পাচ্ছেন আগামী দিনের বিপ্লবের পদধ্বনি, কেউ কলকাতার বিড়ম্বিত ভাগ্যের মধ্যে আবিষ্কার করছেন পৃথিবীর অন্যান্য জনবহুল মেট্রোপলিটান নগরীর ভবিষ্যৎ পরিণতির পূর্বাভাষ। রকমফের ভাবনা—তবু ভাবনা তো বটেই; আর এই ভাবনারাশিকে কেন্দ্র করেই কলকাতাকে হাজির করানো হচ্ছে বিশ্বের দরবারে। তাই কলকাতাকে জানার, বোঝার আগ্রহ আগের মতোই দুর্নিবার।

যে শহরটিকে নিয়ে বিশ্ববাসীর কুতূহল আজ পর্যবসিত হয়েছে বিরাট ভাবনায়—সেই শহরের ইতিহাসের গোড়ার অধ্যায়ে রয়েছে এক বিরাট গলদ। জোব চার্নককে নিয়েই কি কলকাতার ইতিহাসের সূচনা? কলকাতার ইতিহাস যে ভাবে ইংরেজদের লেখায় পরিবেশিত হয়েছে তাতে এই কথাটাই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে চার্নক যখন তৃতীয়বার সুতানুটির ঘাটে ভিড়লেন তখন এখানকার বাসিন্দারা ছিল নেহাৎ অনগ্রসর মানুষের দল—শিকারী, নিকারী, জেলে, দুলে, বাগদী। এখানকার জলহাওয়া ছিল নিতান্ত অস্বাস্থ্যকর, বসবাসের সম্পূর্ণ অযোগ্য। চার্নক তো বেশীদিন বেঁচে থাকেন নি—কুঠি আর কুঠিয়ালদের জন্য খানকয়েক ঘরবাড়ি তৈরী ছাড়া আর কিছুই করে যেতে পারেন নি। তারপর কয়েক বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই কলকাতার বুকে গড়ে উঠলো দুর্গ, প্রাকার, পাকা বাড়ি, ব্যারাক, হাসপাতাল, গির্জা ইত্যাদি। আরও পরে সিরাজউদ্দৌলা কর্তৃক কলকাতা আক্রমণ ও অধিকার উপলক্ষ্যে গির্জা সমেত কিছু কিছু বাড়িঘর বিধ্বস্ত হওয়া সত্ত্বেও পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে শহর কলকাতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললো সমৃদ্ধি আর ঐশ্বর্যের পথে। পলাশীর পরবর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে কলকাতা হয়ে উঠলো Village of Palaces। কিন্তু এ কোন্ কলকাতা? অবশ্যই ইংরেজ অধ্যুষিত কলকাতা—ইংরেজদের ভাষায় 'নেটিভ' বা ব্ল্যাক টাউন সম্পর্কে ইংরেজ লেখকরা নীরব।

কিন্তু ব্যাপারটা অন্য রকম। জোব চার্নকের আগেও সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুর ছিল—হতশ্রী, জনবসতিবিরল, শুধুমাত্র অন্ত্যজজনঅধ্যুষিত অঞ্চল বলে কলকাতার ইংরেজদের লেখা যে পরিচয়ে আমরা অভ্যস্ত, সে পরিচয় সত্যিকারের পরিচয় নয়। দেশীয় সাহিত্যের বিভিন্ন সূত্রে প্রাক্-চার্নক যুগের কলকাতার সমৃদ্ধির সুস্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে। মোগল যুগের ইতিহাসেও এ ধরনের ইঙ্গিতের অভাব নেই। ভূতাত্ত্বিক উপাদানও একই সিদ্ধান্তের সমর্থক। একদিকে কালীক্ষেত্রের মাহাত্ম্য, অন্যদিকে ব্যবসায় বাণিজ্যের সম্ভাবনা, ভৌগোলিক নিরাপত্তা, মোগল রাজকর্মীদের কাছারি, তাদের নিয়মিত আনাগোনা, উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের ক্রমিক সংখ্যাবৃদ্ধি, শেঠ বসাকদের বন কেটে বসতি—সব কিছু মিলিয়ে এই সুস্পষ্ট ইঙ্গিতই বহন করে যে চার্নকের কুঠি স্থাপনের অনেক আগে থেকেই সমৃদ্ধির পথে সুতানুটি-কলকাতা-গোবিন্দপুর অঞ্চল যাত্রা শুরু করেছিল।

কলকাতার গোড়াপত্তন ও প্রসারের ইতিহাস লিখে গেছেন ইংরেজ

লেখকরা। তাঁরা সকলেই একবাক্যে চার্নককে বসিয়েছেন কলকাতার প্রতিষ্ঠাতার সম্মানিত আসনে। দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভারতীয় কিংবা বাঙালী ঐতিহাসিকরা কলকাতার ইতিহাস লিখতে প্রয়াসী হন নি। প্রথম বাঙালী যিনি বাংলা ভাষায় কলকাতার সামগ্রিক ইতিহাস রচনায় উদ্যোগী হয়েছিলেন তিনি প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। ১৩০৮ সালের আশ্বিন থেকে শুরু করে ১৩১০ সালের মাঘ পর্যন্ত 'নব্যভারত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' শিরোনামায় তাঁর চৌদ্দটি তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ। একই সময় ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয় অতুলকৃষ্ণ রায়ের *A Short History of Calcutta*। ইংরেজ লেখকরা যে সব উপাদানের উপর নির্ভর করে এই শহরের ইতিহাস লিখে গিয়েছেন, প্রাণকৃষ্ণ এবং অতুলকৃষ্ণ এঁরা দুজন শুধু সেই সব উপাদানের উপর নির্ভর করে থাকেন নি—তাঁরা দুজনেই ভূতাত্ত্বিক এবং এতদ্দেশীয় সাহিত্যিক উপাদানের উপর যথোচিত গুরুত্ব আরোপ করে কলকাতার সূচনাকালের উত্তরণ ঘটিয়েছেন প্রাক্-চার্নক যুগে।

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের কৃতিত্ব এখানেই সীমিত নয়। বাংলা ভাষায় কলকাতার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে তিনিই পথিকৃৎ। 'নব্যভারতে' প্রাণকৃষ্ণের প্রবন্ধগুচ্ছ প্রকাশিত হওয়ার আগে কলকাতার বিভিন্ন দিক—যেমন কালীক্ষেত্র, কলকাতার বড়লোক, মহিলাদের তত্ত্বজ্ঞান সভা, পথঘাট, প্রাকৃতিক পরিবর্তন, 'কলিকাতা' নামের উৎপত্তি, শহরে ইংরেজী চর্চা ইত্যাদি শিরোনামায় কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হলেও সামগ্রিকভাবে কলকাতা নিয়ে কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। ইংরেজী ভাষায় কলকাতার প্রথম ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার কৃতিত্ব যেমন অতুলকৃষ্ণ রায়ের, তেমনই বাংলা ভাষায় কলকাতা নিয়ে একটি গোটা গ্রন্থরচনার প্রথম পরিকল্পনার রচয়িতা প্রাণকৃষ্ণ দত্ত। এটি নিঃসন্দেহে একটি বড়ো ধরণের কৃতিত্ব।

আরও একটি কারণে প্রাণকৃষ্ণের বইটি অসাধারণ। ১৯ শতকের শেষ পর্যন্ত কলকাতা নিয়ে যাঁরা গ্রন্থ প্রণয়ন অথবা প্রবন্ধ রচনা করেছেন, তাঁরা বিদেশীই হোন আর ভারতবাসীই হোন, তাঁরা তাঁদের রচনার সবটুকু জায়গা জুড়ে বর্ণনা করেছেন সাহেব-মেম অধ্যুষিত কলকাতা, কলকাতার য়ুরোপীয় বাসিন্দাদের সামাজিক রীতিনীতি, হালচাল, ব্রেকফাষ্ট, লাঞ্চ, ডিনার, তাদের ঘরবাড়ি, অফিস আদালত, আবদার, হুঁকাবরদার, খানসামা, গোমস্তা, খিদমৎগার সেবিত জীবনের চিত্র, হোয়াইট টাউন, রাস্তাঘাট, যানবাহন, সামাজিক জীবন,

আমোদ প্রমোদ ইত্যাদির। খানসামা খিদমৎগার আর কেরাণী গোমস্তা ছাড়া এতদ্দেশীয় জনসমাজ এবং তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী সেখানে অনুল্লেখিত। প্রাণকৃষ্ণ এই অভ্যস্ত প্রথা অনুসরণ করেন নি। তিনি শুরু করেছেন আদিম বা প্রাক্-চার্নক যুগ নিয়ে। আলোচনা করেছেন নামোৎপত্তি, জনপদ-পরিচয়, কালীঘাট, গোবিন্দপুর, সন্নিহিত অঞ্চল নিয়ে। তার পরের কয়েকটি অধ্যায়ে তিনি তুলে ধরেছেন বিস্তৃতভাবে কলকাতার কয়েকটি প্রাচীন পরিবারের কথা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সুতানুটির ঘোষবংশ (হরি ঘোষ, বারাণসী ঘোষ প্রমুখ) শ্যামবাজারের রামধন ঘোষ, আড়পুলীর শঙ্কর ঘোষ, কাঁটাপুকুরের বসু বংশ, দরমাহাটার কৃষ্ণরাম বসু, শ্যামবাজারের দে সরকার পরিবার (রাজারাম, গুপীচরণ), গোবিন্দশরণ দত্ত, বসুপাড়ার নিধুরাম বসু, বলরাম মজুমদার, পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াবাগান, চোরবাগান প্রভৃতি অঞ্চলের ধনাঢ্য মল্লিক বংশ (জয়রাম, পদ্মলোচন, শ্যামসুন্দর, রামকৃষ্ণ, গঙ্গাবিষ্ণু, চোরবাগানের নীলমণি, রাজেন্দ্র মল্লিক) হাটখোলার দত্ত বংশের আদিপুরুষ, গরাণহাটার বন্দ্যোপাধ্যায় পরিবার, সোনাগাজী, মহম্মদ রামজান, রশিদ মল্লিক, নূরজী মল্লিক। কালীঘাট, চিত্রেশ্বরী, জয়মঙ্গলা, আনন্দময়ী কালীমন্দিরও তাঁর দর্পণে প্রতিফলিত। পুরনো বাজারের মধ্যে পরিবেশিত হয়েছে বাগুয়াবাজার (বাগবাজার), শ্যামবাজার, বৈঠকখানা বাজার, লালবাজার। পথঘাটের পরিচয়ও সন্নিবেশিত রয়েছে তাঁর বর্ণনায়। এ ছাড়া কলিকাতার ইতিবৃত্তে প্রাচীন কলকাতার দেশীয় সমাজজীবন ও আচারব্যবহার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করেছেন তিনি। নেটিভ টাউনের ভারতীয় অধিবাসীদের সমাজজীবনের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ বহু তথ্যের অবতারণা করে বর্ণনা করেছেন সে যুগের আচার আচরণ—স্নান আহ্নিক, ব্যায়াম, ভোজন, সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, পূজা পার্বণ, উৎসব, সতীদাহ, চড়ক, দোল দুর্গোৎসব, আমোদ প্রমোদ। কলকাতা সম্পর্কিত আর কোন গ্রন্থেই ভারতীয় আচার আচরণের এমন বিস্তৃত এবং তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ পাওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ তাঁর নিজের দেখা অথবা প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে শোনা বহু তথ্যেরও সদ্ব্যবহার করেছেন। তাঁর বইটি কলকাতার সমাজজীবনের একটি বিশ্বস্ত আলেখ্য।

আশী বছর আগেকার দুষ্প্রাপ্য পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুচ্ছকে একটি গ্রন্থের আকারে উপস্থাপিত করে প্রকাশক-সংস্থা প্রবন্ধকারের একটি আকাঙ্ক্ষাই শুধু পূরণ করেননি—প্রাচীন কলকাতার জনপদ এবং সমাজজীবন

সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচিত বহু তথ্যের সঙ্গে পাঠকগোষ্ঠীর পরিচয়লাভের সুযোগ দিয়েছেন। প্রাণকৃষ্ণ প্রবন্ধগুলো নিয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করবেন এই আশা পোষণ করতেন। একস্থানে তিনি লিখেছেন:

"যে প্রকার বিশৃঙ্খলভাবে প্রাচীন অধিবাসীদিগের কথা লেখা হইতেছে, তাহাতে অনেক সময় পাঠক মহাশয়দিগের বিরক্তিকর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এ ত্রুটী তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে, কারণ আমরা যখন যাঁহাদের সন্ধান পাইতেছি, তখনই তাঁহাদের কথা প্রকাশ করিয়া সংগ্রহরূপে রাখিতেছি; ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় শ্রেণীবদ্ধ করিব, এখন আমাদের সাধ্যাতীত।" দ্রষ্টব্য পৃঃ ৭৩

প্রাচীন কলকাতার ভারতীয় এবং বাঙালী অধিবাসীদের নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন গ্রন্থ রচিত হয় নি—কিছু কিছু তথ্য বহু বৎসর আগে প্রকাশিত একাধিক গ্রন্থে ইতস্তত: আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন পারিবারিক দলিলপত্র সংগ্রহের কোন সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টা এখন পর্যন্ত হয় নি। এ ছাড়া অন্যান্য বহু সূত্রের এখনও সন্ধান পাওয়া যেতে পারে যাদের সদ্ব্যবহারের কোন পরিকল্পনা এখনও গৃহীত হয় নি। তবু এ বিষয়ে যাঁরা মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করে গেছেন প্রাণকৃষ্ণ তাঁদের অন্যতম হিসেবে আমাদের ধন্যবাদার্হ।

প্রাচীন কলকাতার পরিচয় প্রসঙ্গে প্রাণকৃষ্ণ দত্ত যে সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তাদের কয়েকটি সম্পর্কে মতান্তরের অবকাশ রয়েছে—যেমন শেঠবসাক ও জয়রাম মল্লিকের কলকাতায় বসতিস্থাপনের তারিখ (পৃঃ ১৬, পৃঃ ৬৪), টমাস কিচিনের ম্যাপের তারিখ (পৃঃ ২৮), গোবিন্দশরণ দত্ত ও গোবিন্দপুর নামের উৎপত্তি (পৃঃ ৩৬), নূতন ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের নির্মাণ আরম্ভের কাল (পৃঃ ৩৭), অমি সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত কলকাতার মানচিত্রের তারিখ (পৃঃ ৪৮), বারাকপুরে জোব চার্ণক কর্তৃক স্থাপিত হাট (পৃঃ ৫২)। তবু গ্রন্থকারের কৃতিত্ব এই যে কলকাতার বাঙালী সমাজ সম্পর্কে ইতিপূর্বে অতো তথ্য আর কেউ এক জায়গায় সংগ্রহ এবং পরিবেশন করেন নি এবং কলকাতা বিষয়ক কোন গ্রন্থে কলকাতার বাঙালী অধিবাসীদের পারিবারিক ইতিহাস এবং আচার ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহে আর কোন লেখক এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেন নি। এ বিষয়ে কলিকাতার ইতিবৃত্তের লেখক নিঃসন্দেহে পথিকৃৎ হিসেবে গণ্য হবার অধিকারী।

গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগে সন্নিবিষ্ট হয়েছে একটি দীর্ঘ পরিশিষ্ট, লেখক শরচ্চন্দ্র দেব। প্রকাশক-সংস্থা এই অংশটিকে প্রাণকৃষ্ণ দত্তের রচনার পরিপূরক হিসেবে সংযোজন করেছেন অনুমান করি। এটি আরও আগের রচনা—১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশনা। এতে কলকাতা সম্পর্কে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গেলেও মূলতঃ এতে আলোচিত হয়েছে কলকাতাকে কেন্দ্র করে ১৯ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্যন্ত ভারতে ইংরেজ শক্তির উত্থান ও প্রসারের কাহিনী। কিন্তু পরিশিষ্ট পর্বে লেখক যে সব তথ্যের অবতারণা করেছেন, তাদের সনতারিখের নির্ভুলতার প্রতি তিনি সতর্ক দৃষ্টি দেননি। সন-তারিখ ছাড়াও তথ্যগত কিছু কিছু ভুল পাঠকের চোখে পড়বে। আবুল ফজলের পরিচিতি (পৃঃ ১৫৫), বল্লালসেনের সিংহাসন লাভের কাল এবং তাঁর রাজত্বকাল (পৃঃ ১৫৬), ১৬৭৪ সালে ওরঙ্গজীব কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সনন্দ দান (পৃঃ ১৫৮), চার্নকের মৃত্যুকাল (পৃঃ ১৬০), মুর্শিদকুলি খাঁর বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার পদে নিয়োগ (পৃঃ ১৬২), কলকাতায় প্রথম গির্জা নির্মাণ-কাল (পৃঃ ১৬২), ১৭৩১ সালে সেণ্ট জনস্ চার্চের চূড়া ভেঙে যাওয়ার কাহিনী (পৃঃ ১৬৩), বর্গী আক্রমণের কারণ বর্ণনায় আলিবর্দি কর্তৃক 'কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতির' প্রাণনাশ (পৃঃ১৬৫), সিরাজের আক্রমণের ফলে সেণ্ট জনস্ চার্চের ধ্বংস (পৃঃ ১৬৫) ক্লাইভ ও ওয়াটসন কর্তৃক কলকাতা পুনরধিকারের তারিখ (পৃঃ ১৬৬), হিকির ভারত ত্যাগ (পৃঃ ১৭১), সার উইলিয়ম জোনস্-এর মৃত্যুকাল (পৃঃ ১৭৪), তিরেত্তা বাজারের স্থাপনাকাল (পৃঃ ১৭৭), লর্ড ময়রা অথবা মার্কুইস অব হেষ্টিংস্-এর শাসনকাল (পৃঃ ১৭৯), এগ্রিকালচারাল ও হর্টিকালচারাল সমিতির প্রতিষ্ঠাকাল (পৃঃ ১৭৯), উইলিয়ম কেরীর মৃত্যুকাল (পৃঃ ১৮০), স্যার রাধাকান্ত দেবের জন্মসাল (পৃঃ ১৮৮), কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের প্রতিষ্ঠাকাল (পৃঃ ১৮৯)।

আশা করবো কলকাতা-অনুরাগীদের কাছে 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' একটি গ্রহণযোগ্য এবং মূল্যবান সংযোজন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করবে।

১৫. ৭. ৮১

নিশীথরঞ্জন রায়

সূচীপত্র
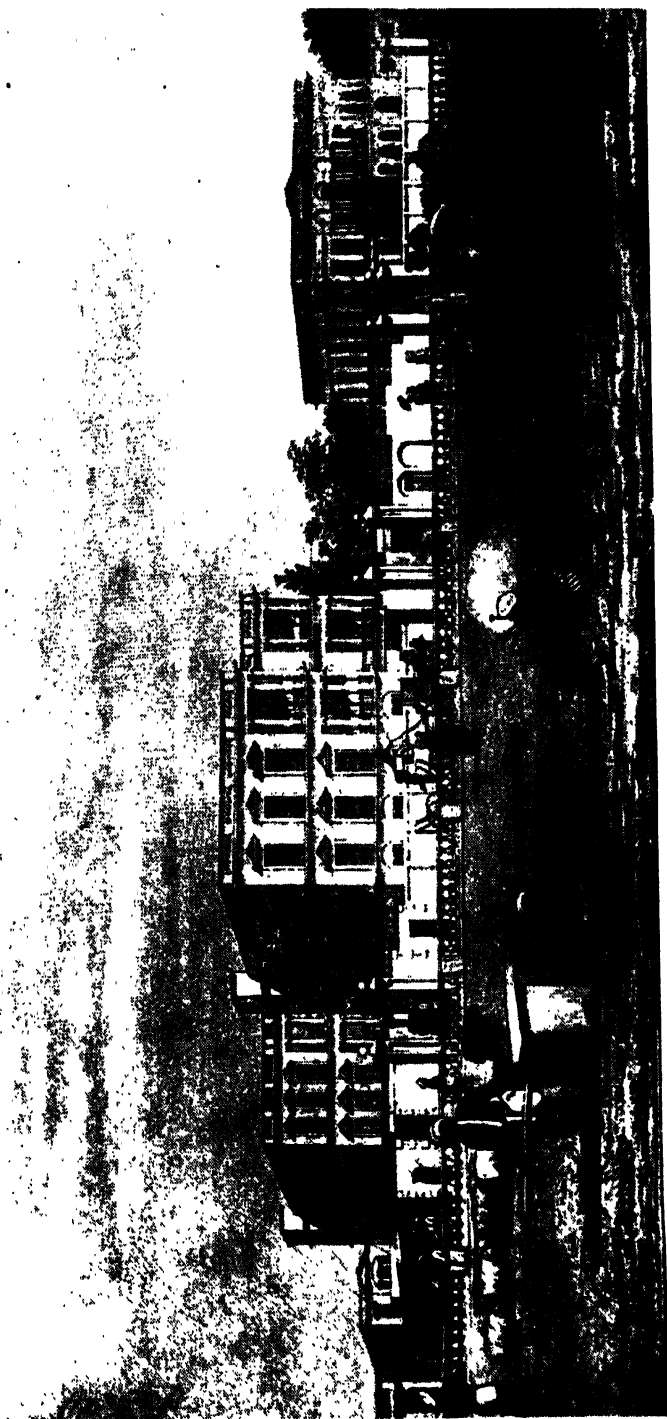
পুরনো কলকাতার সাহেবপাড়া, চৌরঙ্গী রোড — উইলিয়াম উড

কলকাতার সাহেবপাড়ার আরেকটি দৃশ্য — উইলিয়াম উড

পুরনো চিৎপুরের হিন্দু পাড়া—ডয়িলি
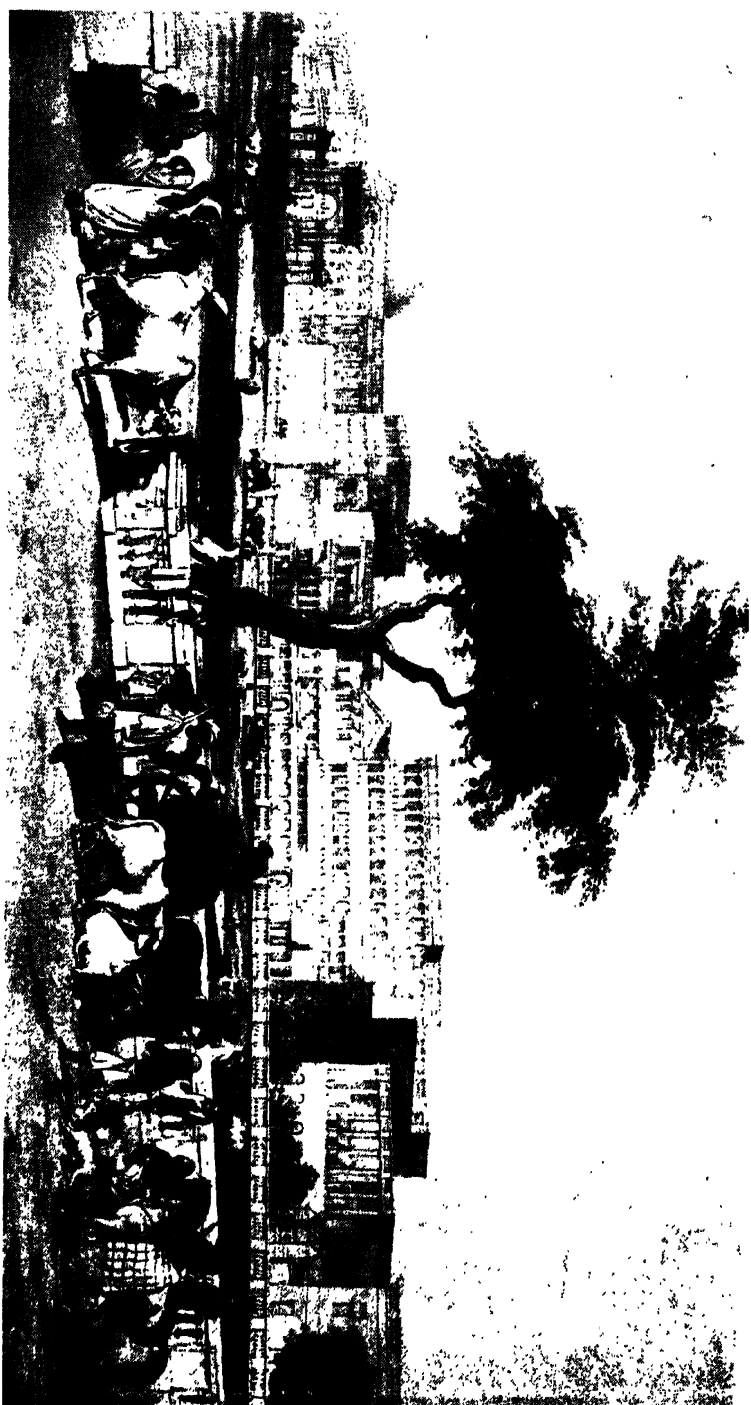
কলকাতার প্রাণধারা-হুগলী নদী – ডি সার্ ফিল্ড গ্রীন

কলিকাতার ইতিবৃত্ত

ভূতত্ত্ব

ভূতত্ত্ববিদেরা বলেন, অতি পুরাকালে হিমালয় পর্ব্বতও সমুদ্রগর্ভে নিমগ্ন ছিল। হিমালয়ের বিবিধ প্রকার গঠনস্তর ও তদ্গর্ভে নানাবিধ সামুদ্রিক জীবাদির চিহ্ন আবিষ্কার করিয়া তাঁহারা আপনাদিগের মত সপ্রমাণ করিয়া থাকেন। পৌরাণিক সৃষ্টিতত্ত্বও মৌলিক ভাবে উঁহাদিগের মত সমর্থন করিতেছে। হিমালয় সমুদ্র হইতে উত্থান করিবার বহুকাল পর পর্য্যন্ত সমুদ্র উঁহার পদতল ধৌত করিত, এমন কি, উঁহারা ইহাও বলেন যে, ভারতবর্ষে মনুষ্য সমাগমের পরেও হিমাচলের ৩০মাইল দক্ষিণে সমুদ্র-তরঙ্গ উত্থিত হইত। কালে অগ্ন্যুৎপাতে উত্তর-বাঙ্গালার সৃষ্টি হইয়াছে, ইহা আমাদের ন্যায় অবৈজ্ঞানিকেরাও সহজে বুঝিতে পারেন। উত্তর-বাঙ্গালার যে কোন স্থান খনন করিলেই গন্ধক-জরিত লৌহ Vitrified Iron যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়, সেই জন্য অনেক স্থানের মৃত্তিকা দেখিতে যেন ১ নম্বর সুরকির মত লোহিত বর্ণ। এই লৌহে উৎকৃষ্ট অসি প্রস্তত হইত, "লৌহার্ণব" গ্রন্থে লিখিত আছে, "বঙ্গদেশজাত অসি তীক্ষ্ণ ও ছেদ-ভেদে পটু।"[১] গলিত লৌহ শীতল হইলে যেমন চাপ্ড়া বাঁধে, অনেক স্থলে মৃত্তিকা খনন করিলে সেইরূপ আকারের লৌহ পাওয়া যায়; উহাকে Iron slag বলে। কুচবিহারের নিম্নে প্রচুর পরিমাণে ঐরূপ লৌহ আছে। এমন কি, যেখানে যেখানে গভীর কূপ খনিত হইয়াছে, প্রায়ই তাহার জল লৌহগন্ধ ও লৌহ আস্বাদে এমন পরিপূর্ণ যে ব্যবহার করা দুষ্কর। কুচবিহারের নিম্নস্থ লৌহ এত উৎকৃষ্ট জাতীয় যে, ভারতের আর কুত্রাপি তদ্রূপ নাই। পুরাকালে উক্ত লৌহে সর্বোৎকৃষ্ট খড়্গ প্রস্তত হইত। "কল্পদ্রুম" অভিধানের "খড়্গপরীক্ষা" গ্রন্থের এক স্থানে লিখিত আছে যে, "নাগার্জুন বলেন, ব্রাহ্মণ জাতীয় সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট খড়্গ স্বর্গতুল্য কুশদ্বীপ[২] ও হিমালয় প্রদেশের কোন কোন স্থানে পাওয়া যায়।[৩] অগ্ন্যুৎপাতে উৎপন্ন দ্বীপ সকলের

উপর হিমালয়স্রাত নদী সকল অবিশ্রান্ত কর্দ্দমরাশি সহ নুড়ীপ্রস্তর আনিয়া ঢালিতে ঢালিতে বহু সহস্র বৎসরে সমুদ্রকে হিমালয়ের নিম্ন হইতে অল্পে অল্পে তাড়িত করিয়া বর্ত্তমান স্থানে রাখিয়াছে।

যে স্থান হইতে গঙ্গা পূর্ব্বাভিমুখী হইয়া পরে মেঘনা নামে সাগরে পতিত হইয়াছে, এবং দক্ষিণাভিমুখী হইয়া ভাগীরথী নামে সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে, এই ত্রিকোণাকৃতি ভূ-ভাগ অর্থাৎ গঙ্গার ব-দ্বীপ দক্ষিণ-বঙ্গ বা বাগড়ি নামে খ্যাত।[৪] যদিও এই জনপদের উল্লেখ প্রাচীন পুরাণাদিতে বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না, এমন কি সার্দ্ধ দ্বিসহস্র বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গাধিপ সিংহবাহুর পুত্র বিজয়ের সিংহল যাত্রার বর্ণনায় দক্ষিণ-বাঙ্গালার কোন উল্লেখ নাই। তত্রাচ ইহাও যে বহু সহস্র বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। মহাভারতে যাহাকে "বঙ্গ" বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা পদ্মার উত্তর, মালদহ জিলার পূর্ব্ব, দিনাজপুর ও কুচবিহারের দক্ষিণ, এবং পূর্ব্ব পার্ব্বত্য প্রদেশের পশ্চিমস্থ স্থান। রাজা বল্লাল সেন খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আপনার অধিকৃত স্থানকে এইরূপে বিভাগ করিয়াছিলেন :—করতোয়া নদীর পূর্ব্বস্থ স্থান বঙ্গ, এক্ষণে যাহাকে পশ্চিম-বাঙ্গালা বলা যায়, তাহাকে তিনি ত্রিকলিঙ্গ মহাপ্রদেশের উত্তর অর্থাৎ উড়িষ্যার অন্তর্গত রাঢ় দেশ; এবং বদ্বীপকে বাগড়ী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন;[৫] করতোয়ার পশ্চিমে বারেন্দ্র।

মহাভারতাদি পুরাণে তাম্রলিপ্ত অর্থাৎ তমলুকের উল্লেখ আছে। যদিও উহা এক্ষণে বঙ্গের মধ্যে, কিন্তু পূর্ব্বে উহা দক্ষিণ-কলিঙ্গ-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দক্ষিণ-বঙ্গ সম্বন্ধে কেবল "সমতট" বলিয়াই উল্লেখ দেখা যায়। ইহাতে বুঝা যায় যে পুরাণাদির সময় দক্ষিণ বঙ্গের উৎপত্তি হইয়াছিল বটে, কিন্তু জনপদে পরিণত না হইয়া সমুদ্রের বেলাভূমির ন্যায় ছিল। রামায়ণে সাগর সঙ্গম এবং ভীষ্মের সাগরতীর্থ দর্শনে ইহা বুঝা যাইতেছে। এক্ষণে যে স্থান দক্ষিণ-বঙ্গের দক্ষিণ সীমা দেখা যাইতেছে, বোধহয়, বহু সহস্র বৎসর ঐ স্থানই সীমা হইয়া আছে। এই সীমা গঙ্গাসাগর হইতে মেঘনার মহানা পর্য্যন্ত ১৮০ মাইল, দুর্লঙ্ঘ্য অসংখ্য স্বাভাবিক দুর্গের দ্বারা রক্ষিত। ঐ সকল দুর্গ আর কিছুই নহে, অসংখ্য সাগরাবর্ত্ত ও চোরা বালি, কোথাও সমতল কোথাও পর্ব্বতাকারে প্রাচীরের ন্যায় স্থাপিত। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র প্রতি বৎসর শত কর্দ্দম আনিয়া বঙ্গসাগরে ঢালিতেছে, তাহা আমরা বর্ষাকালে এক কলস গঙ্গার জল তুলিয়া পরদিন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য হই। এত মৃত্তিকা পাইয়াও

দক্ষিণ-বাঙ্গালা উন্নত ও সাগরের দিকে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। কারণ বঙ্গ সাগরের মধ্যস্থলের গভীরতা ১০৭১০ ফিট, আবার সুন্দরবনের ঠিক নিম্নে সাগর-গর্ভে একটী গহ্বর আছে, তাহার উপর শত শত ঘূর্ণী দিবারাত্র ক্রীড়া করিতেছে। ইহার গভীরতা শুনিলে ভয়ে প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, ১২ হাজার ফিট, দুই মাইলেরও অধিক। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া কর্দ্দমরাশি ঢালিয়া দিয়াও এই গহ্বর-রাক্ষসদিগের উদর পূরণ করিয়া উঠিতে পারিতেছে না, সুতরাং বাঙ্গালা আর অগ্রসর হইবে কি প্রকারে? অগ্রসরও যেমন হইতেছে না, তেমনি উন্নত হইতেও পারিতেছে না। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের বন্যায় নিম্ন বঙ্গ ডুবিয়া যাইত, তাহার কর্দ্দমরাশি বৎসর বৎসর জমিয়া এবং তৎসহ উদ্ভিজ্জ সার মিশ্রিত হইয়া বহুকালে সমতট কিছু পরিমাণে উন্নত হইলে, স্থানে স্থানে গ্রাম নগরাদি নির্ম্মিত হইতে হইতে সম্মুখস্থ গহ্বরের আকর্ষণে আবার ধসিয়া গিয়া সমতট হইয়া যাইত, সুতরাং উন্নত হইতে পারে নাই। ভূতত্ত্ববিদেরা বিবিধ প্রকারে ইহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। নিম্নবঙ্গের অধিবাসীরাও মৃত্তিকার নিম্নে বৃক্ষাদির চিহ্ন পাইয়া উহা সহজে বুঝিতে পারেন। সুন্দরবন প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকার নিম্নে অনেক সমৃদ্ধ জনপদের ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

গত চৈত্র মাসের "নব্যভারতে" একটী প্রবন্ধের মর্ম্মে বুঝা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশ্বম্ভর সুর নামক মিথিলাবাসী জনৈক ক্ষত্রিয় জলমগ্ন ভুলুয়া নামক স্থানে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি অল্প মাত্র মৃত্তিকার নিম্নে প্রস্তরময়ী বরাহী মূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়া তাঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে উক্ত বংশের শেষ রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের রাজত্ব ধ্বংস হইবার পর হইতে এখন পর্য্যন্ত উক্ত দেবী মূর্ত্তি তাঁহাদের পুরোহিত বংশের গৃহে পূজিত হইতেছেন। এই প্রস্তাবে জানা যায়, চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশ এমন বর্দ্ধিষ্ণু জনপদ ছিল যে, বহুদূর হইতে প্রস্তর মূর্ত্তি আনাইয়া তাহার পূজা পর্য্যন্ত করিত। একদিন অকস্মাৎ সমুদ্রগর্ভে সমস্ত অধিবাসী সহ জনপদ বিনষ্ট হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। আবার ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, ১৫৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ভুলুয়া প্রভৃতি স্থান ভীষণ জলপ্লাবনে জনশূন্য হইয়াছিল, ইহা রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের অব্যবহিত পরে বলিয়া অনুমান হয়। সে প্লাবনে গঙ্গাতীরের সবিশেষ ক্ষতির কথা শুনা যায় না।

ভারতলক্ষ্মীর সিংহাসন স্বরূপ কলিকাতা নগরী যেখানে থাকিয়া আপনার ঐশ্বর্য্য গর্ব্বে জগৎকে চমকিত করিতেছে, সে স্থানও এই বদ্বীপের দাক্ষিণ পশ্চিমে

অবস্থিত থাকায় কতবার যে ইহাকে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করিতে হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা দুষ্কর। কলিকাতার যে কোন স্থান গভীর রূপে খনন করা যায়, কোথাও মনুষ্যের বসবাসের চিহ্ন স্বরূপ দগ্ধ মৃত্তিকা বা ধাতু দ্রব্যের চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল উদ্ভিজ্জসার ও নদীর স্তরই দেখা যায়। লালদীঘি, গোলদীঘি, মনোহর তলাও প্রভৃতি খননকালে ঐরূপ চিহ্নই পাওয়া গিয়াছে। পূর্ব্ব বাঙ্গালা রেলওয়ের সিয়ালদহ ষ্টেসনের দক্ষিণে যে পুষ্করিণী আছে, তাহা খননকালে যে সকল স্তর আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহার বিবরণ নিম্নে দেওয়া যাইতেছে। প্রথম এক ফুটের উপরের মৃত্তিকার নিম্নে তিন ফিট পরিষ্কার নদীর বালুকা, তৎপরে ছয় ফিট, কোন কোন স্থানে আট ফিট সরু বালুকাসহ উদ্ভিজ্জসার ও ঝিনুক গুগলি পাওয়া গিয়াছিল, তাহার নিম্নে ছয় ফিট, কোথাও আট ফিট নীলবর্ণের আঁটাল মৃত্তিকা, তৎপরে একপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা পাওয়া যায়। ঐ মৃত্তিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে জ্বলিয়া ছাই হইয়া যায়,[৬] তাহার তলে বালি মাটীর সহিত সারি সারি সুন্দরী বৃক্ষের গুঁড়ি সকল বসিয়াছিল। এই গুঁড়িসহ মাটীর উচ্চতাও ছয় হইতে আট ফিট, তন্নিম্নে আবার ঐরূপ স্তর সকল বাহির হইয়াছিল।

১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই মে তারিখের কলিকাতা গেজেটে লিখিত আছে, "চৌরঙ্গীর কোণের দীঘির নিম্নে বালুকা থাকায় গ্রীষ্মকালে পুষ্করিণী শুকাইয়া যায়, সেইজন্য উহাকে অধিকতর গভীর করিতে গিয়া চারি ফিট নিম্নে সারি সারি পুরাতন বৃক্ষের মূল পাওয়া গিয়াছে, পরীক্ষায় সমস্ত সুন্দরী বৃক্ষ বলিয়া প্রমাণিত হইল।" কয়েক বৎসর হইল, দমদমার একটী পুষ্করিণী খননে গভীর স্থান হইতে ঐরূপ বৃক্ষ এবং একটী হরিণের শৃঙ্গ ও কঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। ইহাও শুনা যায়, গার্ডেনরিচের নিকট একটী পুষ্করিণী খননে একখানি নৌকা বাহির হইয়াছিল।

এসিয়াটিক সোসাইটীর জর্ণালের নবমভাগে কলিকাতার নূতন দুর্গে একটী গভীর কূপ খননের বৃত্তান্ত লিখিত আছে। তাহাতে দেখা যায়, সিয়ালদহের ন্যায় স্তরের পর স্তর পরপর বাহির হইয়া ১৫৯ ফিট নিম্নে হরিদ্রাবর্ণ সূত্র-চিহ্ন বিশিষ্ট আঁটাল মৃত্তিকা এবং ১৮০ ফিট নিম্নে পিটকোলের সহিত ছাঁচি কুমড়ার বিচি ও ইক্ষুপত্র পাওয়া গিয়াছিল। ১৯৬ ফিট নিম্নে লৌহসংযুক্ত মৃত্তিকা দেখা গিয়াছিল। ৩৫০ ফিট নিম্নে একটী কুকুরের কঙ্কাল এবং ৩৭২ ফিটের পর একটী কচ্ছপের খোলা বাহির হইয়াছিল। এখনও গঙ্গায় সেই জাতীয় কচ্ছপ প্রচুর বিচরণ করিতেছে। ৩৮০ ফিট নিম্নে যথেষ্ট পরিমাণে

ঝিনুক ও গুগলির আবরণ উঠিয়াছিল, তাহার নিম্ন স্তরে আবার উদ্ভিজ্জসার সহ মৃত্তিকা এবং গাছের গুঁড়ি দেখা দিল। ৩৯২ ফিট নিম্নে উদ্ভিজ্জ কয়লার সহিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পার্ব্বতীয় কাষ্ঠ খণ্ড উঠিল, ৪০০ ফিট নিম্নে একখানি চূণা পাথর এবং তৎপরে ৮১ ফিট সমুদ্র তীরের ক্ষুদ্র বালুকার সহিত পর্ব্বত নিঃসৃত ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড বাহির হয়, তন্মধ্যে চূণা পাথরের এবং স্বচ্ছ প্রস্তরের ও অভ্রের খণ্ড সকল যথেষ্ট পরিমাণে ছিল। এইরূপ ৪৮১ ফিট খননের পর কার্য্য বন্ধ হইয়া যায়। এই ৪৮১ ফিট উচ্চ হইতে কত সহস্র বৎসর লাগিয়াছিল, তাহা বলা যায় না; কারণ এই পরিমাণের মধ্যে বারবার উন্নতি ও অবনতির প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কে বলিতে পারে যে, কোন্ দিন এই প্রাসাদপূর্ণ নগরী সমস্ত ধন ঐশ্বর্য্য সহ আবার সাগর জলে নিমগ্ন হইবে না?

পৃথিবীর অধিকাংশ সমুদ্র অপেক্ষা বঙ্গোপসাগরে ঝড়ের উপদ্রব অত্যন্ত অধিক। ভাদ্র, আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসেই প্রায় প্রবল ঝড়ের আক্রমণ দেখা যায়; তৎসঙ্গে সমুদ্রের জল প্রাচীরের ন্যায় উচ্চ হইয়া আসিয়া দেশ ও নগরাদি ভাসাইয়া লইয়া যায়। সময় সময় তৎসহ ভূমিকম্প হইয়া আরও বিপদ ঘটায়। ইতিহাসে একবার ঐরূপ দৈব বিড়ম্বনার একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম। ১৭৩৯ খ্রীঃ বিলাতের Gentlemen's Magazine নামক পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, "১৭৩৭ সালের ১১ অক্টোবর তারিখের রাত্রে গঙ্গার মুখে ভয়ানক ঝড় উঠিয়া উত্তর মুখে বহুদূর পর্য্যন্ত আসিয়াছিল, তাহার সহিত অবিশ্রান্ত প্রবল বৃষ্টি ও ভূমিকম্প হওয়ায় গঙ্গার উভয় পার্শ্বের অপর্য্যাপ্ত ক্ষতি করিয়াছে। "Gal Gata"[৭] দুই শত অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছে, ইংলিস চর্চ্চের মহোচ্চ চূড়া না ভাঙ্গিয়া এককালে মাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। সমুদ্র জল ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া আসায় গঙ্গায় প্রায় ২০ হাজার জলযানের চিহ্ন এককালে বিলুপ্ত হইয়াছে, ইংরাজদিগের ৯ খানি জাহাজ গঙ্গায় ছিল, তাহার ৮ খানি মালপত্র ও নাবিকদিগের সহিত বিনষ্ট হইয়াছে, ওলন্দাজদিগের চারিখানি জাহাজের মধ্যে কেবল একখানি ভগ্নাবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। বড় বড় দুই হাজার মোণি বোঝাই দেশীয় নৌকা বৃক্ষাদির উপর দিয়া ভাসাইয়া চারিক্রোশ দূরে লইয়া ফেলিয়াছে। কলিকাতার পূর্ব্বে একটী লবণ হ্রদ আছে (বাদা) তাহা পূর্ব্বে অত্যন্ত গভীর ছিল। ঐ ভূমিকম্পে হঠাৎ উচ্চ হইয়া উঠিল। সহর ও পল্লীগ্রামের নানা স্থানের মাটী ফাটিয়া নর্দ্দমার ন্যায় হইয়া গিয়াছে। অসংখ্য পশু ও প্রায় তিন লক্ষ লোক প্রাণ

হারাইয়াছে। তাহার পর পুষ্করিণী ও নর্দ্দমায় মৃতদেহ ও উদ্ভিদ সকল পচিয়া দেশে মহামারী উপস্থিত করিয়াছে।"

সে সময় কলিকাতা তিনটী গণ্ডগ্রাম হইতে সবেমাত্র সহরে পরিণত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কয়খানি বাটীই বা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে দুইশত গৃহ ভূমিসাৎ হওয়া বড় সহজ কথা নহে। বলিতে গেলে সহরের সমস্ত পাকা বাড়ী পড়িয়া গিয়াছিল। উক্ত পত্রিকার বিবরণ ভিন্ন উক্ত দুর্ব্বিপাকের আর কোন বিবরণ পাওয়া যায় না, কেবল কুমারটুলির গোবিন্দরাম মিত্র বাগবাজারে চিৎপুর রোডের ধারে ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে যে একটী মহোচ্চ চূড়া নবরত্ন নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, উহার সর্ব্বোচ্চ চূড়া বর্ত্তমান অক্টার্লোনী মনুমেণ্ট অপেক্ষাও উচ্চ ছিল, লোকে উহাকে জোড় বাঙ্গলা নবরত্ন বলিত, ঐ ঝড়ে সেই নবরত্নটীও ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। ভগ্নাবশেষ আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহা স্মৃতিপথে উত্তমরূপ জাগরূক আছে। কুমারটুলির মিত্রবংশ বর্ণনকালে নবরত্নের বিশেষ বিবরণ বর্ণিত হইবে। ইংলিশ চর্চ্চের চূড়া "এককালে মাটীর মধ্যে বসিয়া যাওয়া" ঠিক কথা নহে, চার্ল্স ওয়েষ্টন নামে একজন ধনবান অধিবাসী স্বচক্ষে ঐ ব্যাপার দর্শন করিয়াছিলেন, তিনি বলেন, চূড়াটা মাটীর উপর শুইয়া পড়িয়াছিল।

আসল কথা বলিতে অনেক অবান্তর বর্ণনা করিলাম, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। এ সকল ঐতিহাসিক তত্ত্বকথা না লিখিয়া থাকা যায় না! ফলকথা গঙ্গার বদ্বীপ অনেক বার বসিয়া গিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান অবস্থায় আছে। গঙ্গার পূর্ব্ব তীরের সহিত পশ্চিম তীরের তুলনা করিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়, এদিক বসিয়া যাওয়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তদ্ভিন্ন এদিক শনৈঃ শনৈঃ সমুদ্র দিকে অগ্রসর হইতেছে। ৬৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চীন পরিব্রাজক হিয়ানশিকিয়াং তাম্রলিপ্ত নগরকে সমুদ্রতটে দর্শন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সমুদ্র তথা হইতে ৬০ মাইল দূরে চলিয়া গিয়াছে। হিসাব ধরিলে প্রতি শতাব্দীতে প্রায় ৫ মাইল করিয়া ভূমি অগ্রসর হইতেছে। এই সময় মধ্যে তমলুক প্রায় ২০ ফিট উচ্চতা লাভ করিয়াছে।

কলিকাতা সমুদ্র হইতে ১০০ ফুট এবং সাগরদ্বীপ হইতে ৮৬ ফিট উত্তর, ২২'২৩' ২৫" ২ লাটিটিউড উত্তর এবং ৮৮'১৯' ১৬" ২ পূর্ব্ব লনজিটিউডে অবস্থিত।

১. ভারত রহস্য ১৪৭ পৃঃ।

২. পুরাকালে ভারতবর্ষ সপ্ত মহাদ্বীপ এবং একাদশ উপদ্বীপে বিভক্ত ছিল, যথা ৭ মহাদ্বীপ,—জম্বু, প্লক্ষ, শাল্মলী, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক, পুষ্কর। ১১ উপদ্বীপ,—কুরু, চন্দ্র, বরুণ, সৌম্য, নগ, কুমারিকা, গভস্তিমান, রুমঘান, তাম্রপর্ণ, কশের ও ইন্দ্র।

৩. ভারত রহস্য ১৬৬ পৃঃ।

৪. বকানন্ হামিল্টন বলেন, পূর্ব্বে ভাগীরথী দিয়াই গঙ্গার সমস্ত জলপ্রবাহ চলিয়া যাইত। যে সময় কৌশিকী নদী প্রবল বেগে আসিয়া গঙ্গায় মিলিত হইয়াছে, তদবধি পদ্মার প্রবাহ, এবং উহা দ্বারাই গঙ্গার অধিকাংশ জল চলিয়া যায়। প্রসিদ্ধ ভূগোলবেত্তা প্লিনীর সময় ত্রিবেণীর দক্ষিণে ভাগীরথীর প্রবাহ অধিক ছিল না, উহার অধিকাংশ জল সরস্বতী দিয়া বহিয়া যাইত, সেইজন্য সরস্বতী তীরে সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার প্রধান বন্দর ছিল। তিনি বাঙ্গালা প্রদেশকে Ganges Regia অর্থাৎ গাঙ্গরাজ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫. প্লিনি নিম্ন-বঙ্গকে মধ্য-কলিঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৬. এই মৃত্তিকাকে Pit-Coal বলে, কলিকাতার দক্ষিণ আকড়ার নিকট এই মৃত্তিকা এত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় যে তথাকার কুম্ভকারেরা ইহার সাহায্যে আপনাদিগের পণ জ্বালাইয়া থাকে।

৭. হস্তাক্ষরের পত্রে কলিকাতা "Calcutta" না লিখিয়া Calcata লেখা হইয়াছিল, তাহাতে আবার C দুইটী এমনভাবে লেখা হইয়াছিল যে, বিদেশী প্রকাশকেরা C দুইটিকে G অনুমান করিয়া GalGata ছাপিয়াছিলেন, ইহাই আমাদের অনুমান হয়। কোন কোন ইংরাজ ইতিহাসবেত্তা বলেন, সে সময় কলিকাতার নামকরণ না হওয়ায়, এখানে অত্যন্ত মৃত্যু সংখ্যার আধিক্য হেতু Galgatha-র সহিত তুলনায় ইহার নাম Galgata করিয়াছিল এবং তাহা হইতেই Calcutta নামের উৎপত্তি। কিন্তু তাঁহাদের এ অনুমান যে নিতান্ত কাল্পনিক, সময়ে আমরা বিশেষ বিশেষ প্রমাণসহ তাহা সপ্রমাণ করিব।

কালীঘাট

কলিকাতার পুরাবৃত্ত লিখিতে হইলে কালীঘাটের কথাই সর্ব্বাগ্রে লেখা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে যতদূর সংগ্রহ করা যাইতে পারে, তাহা আমরা করিয়াছি, ইহা ভিন্ন আর কোন কথা যদি কেহ জানেন, আমাদিগকে লিখিলে সাদরে প্রকাশিত হইবে।[১] ভারতবর্ষের লোক যখন সভ্যতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া পোতারোহণে পৃথিবীর সকল স্থান ভ্রমণ করিতেন, তখন শক্তি পূজা এদেশের প্রধান ধর্ম্ম ছিল, বর্ত্তমান কালের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা নানা দেশে ভারতীয় দেবদেবীর মূর্ত্তি ও মন্দিরাদি আবিষ্কার করিয়া তাহা দেখাইতেছেন। অগ্নি উপাসনার পরেই শিবোপাসনা এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে শক্তি পূজার প্রবর্ত্তন। মনুসংহিতা, রামায়ণ ও মহাভারতের কালে শিব ও শক্তিই সাধারণ লোকের উপাস্য ছিলেন। ক্রমে পুরাণ, উপপুরাণ ও তন্ত্রশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই পূজার প্রাবল্যই বিশেষরূপে লক্ষিত হইতেছে।

অতি প্রাচীন কালে মহর্ষি নারদকে বৈষ্ণবধর্ম্মের একজন পরাক্রান্ত প্রচারক বা প্রবর্ত্তক বলা যায়। তৎপরে অনেক ঋষি তাঁহার অনুগমন করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু শৈবধর্ম্ম যে তাঁহাদের অপেক্ষা অনেক ঋষি কর্তৃক অধিকতর পরাক্রমে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সন্দেহ নাই। অচেলক সন্ন্যাসীরা চিরদিন শৈবধর্ম্মপ্রচারক। শঙ্করাচার্য্য ও কুমারিল ভট্টের পূর্ব্ব হইতে তাঁহারা ভারতের নানা স্থানের রাজাদিগকে বৌদ্ধধর্ম্ম হইতে শৈবধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া তৎদেশে শিব ও শক্তি উপাসনা প্রবর্ত্তন করিয়াছেন। উড়িষ্যা হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোধান ও ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মাণ অচেলক সন্ন্যাসীদিগের কীর্ত্তি, তাহা উড়িষ্যার ইতিহাসে দেখা যাইতেছে। পুরাকালে অধিকাংশ ঋষি আপনাদিগের জ্ঞান ও ধর্ম্মভাবে রাজাদিগকে এতদূর মুগ্ধ করিতেন যে, তাঁহারাই রাজাদের গুরু পুরোহিত ও প্রধান মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়া সমগ্র রাজ্যে আপনার আচরিত ধর্ম্ম অতি সহজেই প্রবর্ত্তন করিতেন।

বেদ হইতে তন্ত্র পর্য্যন্ত ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসন্ধান করিলে সাধারণভাবে বুঝা যায় যে, বৈদিককালে আর্য্যেরা প্রকৃতির মধ্যে স্রষ্টার অনন্ত শক্তি দর্শন করিয়া নানা নামে তাঁহার স্তব ও আরাধনা করিয়া অগ্নি মধ্যে তাঁহার আহুতি প্রদান

করিতেন। উপনিষদের সময় ঋষিরা পূর্ব্বোক্ত আহুতি অপেক্ষা ধ্যানযোগে অন্তর মধ্যে স্রষ্টাকে সম্ভোগ করাই সমুচিত বিবেচনা করিতেন। তন্মধ্যে যাঁহারা ভাবপ্রধান, তাঁহারা কেবল অন্তরে সম্ভোগ করিয়া পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া সংসারে তাঁহার অদ্ভুত লীলা দর্শন করিয়া নানা রূপকচ্ছন্দে তাহা বর্ণন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। এই স্থানে ভাবের ভিন্নতাহেতু সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাব বলিয়া অনুমান হয়।[২] ভগবানের অনন্ত করুণায় সকলেই বিশ্বাসী থাকিয়া কেহ তাঁহাকে বিষ্ণু, কেহ শিব অর্থাৎ মঙ্গল, আবার কেহ কেহ নিতান্ত আপনার জন না করিয়া থাকিতে না পারিয়া "মা" বলিয়া সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার মহিমা গানে প্রাণ জুড়াইতে লাগিলেন। পরবর্ত্তী ভক্তদিগের হৃদয় কেবল ভাবে সন্তুষ্ট রহিল না, তাঁহারা ভাবের উচ্ছ্বাসে ইষ্টদেবের ভাবময় মূর্ত্তি আকৃতিতে আনয়ন করিয়া নিজে যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তদ্রূপ পুষ্প চন্দন ভোগ নৈবেদ্যাদি অর্পণ করিয়া আত্মবৎ সেবায় আপনার ভাব চরিতার্থ করিতে লাগিলেন। ইহাই পৌরাণিক অবস্থা। পুরাণগুলির মধ্যে অধিকাংশ এবং প্রধানগুলি বৈষ্ণব,[৩] তদাচারীরা প্রায়ই সংসারত্যাগী হইতেন। শৈব বা শাক্ত পুরাণের সংখ্যা অল্প হইলেও তাহার প্রচার অধিক এবং সাধারণ সংসারীদিগের আচরণীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে অনেকগুলি বৈষ্ণব প্রচারকের আবির্ভাব হইয়াছিল, বাঙ্গালায় কেবলমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের দ্বারা বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার হয়, তাহাও শেষাবস্থায়। পুরাণের পর ঘন ঘন উপপুরাণের[৪] আবির্ভাব হইতে লাগিল, ইহাদের মধ্যে বৈষ্ণবদিগের রচিত অতি অল্প, শৈব ও শাক্তেরাই অধিকাংশ উপপুরাণের প্রণেতা। তৎপরে তান্ত্রিক কাল, তন্ত্র সকল বৈষ্ণবধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত, কেবল শিব ও তাঁহার শক্তির উপাসনাদি প্রচার করাই তন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য।[৫]

মহারাজ আদিশূর শাক্ত ছিলেন, তাঁহার সময়েই কাশী হইতে আসামের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত এবং হিমালয়ের তলদেশ হইতে চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ বৌদ্ধধর্ম্ম শূন্য হইয়া শিব ও শক্তির নামে প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। তাঁহার পরবর্ত্তী বাঙ্গালার সমস্ত রাজবংশই বলুন আর পরবর্ত্তী বারভূঁইয়াদিগের কথাই বলুন, সকলেই শাক্ত ছিলেন। রাজা যে ধর্ম্মাবলম্বী, প্রজা তৎ বিপরীত হইলে তাহার আর সে সময় রক্ষা থাকিত না। যদি কেহ ভিন্ন মতাবলম্বী থাকিত, তাহাকে লোকসমাজে রাজধর্ম্ম প্রদর্শন করিয়া অতি সংগোপনে আপন ধর্ম্ম সাধন করিতে হইত। অনেক বৌদ্ধ মন্দির শিব মন্দিরে ও শক্তি মন্দিরে

পরিণত হইল। জলপাইগুড়ীর জল্পেশ্বর মন্দির, কুচবিহারের বাণেশ্বর মন্দির, ঢাকার ঢাকেশ্বরীর এবং তমলুকের বর্গভীমা মন্দিরের গঠন দেখিলে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া অনুমান হয়। অথবা ইহাও বলা যাইতে পারে যে, সে সময় বৌদ্ধদিগের ন্যায় গঠন ভিন্ন অন্য প্রকারের গঠনপ্রণালী প্রচলিত ছিল না। যাহা হউক, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্যন্ত শিব ও শক্তি দেবীই বাঙ্গালীদিগের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন, তাহার সন্দেহ নাই।

ক্রমে দক্ষিণ-বঙ্গ বা বগড়ীতে লোকালয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শিব মন্দির প্রতিষ্ঠা যোত্রমান গৃহস্থের অবশ্য পালনীয় ব্রত বিধায় সর্ব্বত্রই উহা প্রতিষ্ঠিত হইল। ধনবান ভক্তেরা দশমহাবিদ্যার যিনি যে ভাবের উপাসক, তিনি তদনুরূপ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ভাগীরথী ও সরস্বতী তীরেই অধিকাংশ দেবী মন্দির ও শিব মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, চারি পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে কত শত মন্দির যে এই দুই নদী তীরে দণ্ডায়মান ছিল, তাহার কোন তত্ত্ব পাইবার উপায় নাই। চৈতন্যদেব ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরুষোত্তম গমনকালে পথে কতকগুলি প্রধান প্রধান শিব ও শক্তির নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার উল্লিখিত কোন দেব দেবীর মন্দির নদী তীরে দেখিতে পাওয়া যায় না। নদীর কূল-ভঙ্গে সে সমস্ত অদৃশ্য হইয়াছে।

কলিকাতার উত্তর ও দক্ষিণে দুইটী প্রাচীন কালী মন্দির এখন দেখা যায়। ১মটী চিৎপুরে চিত্রেশ্বরী। এই দেবী যে কোন্ কালে কাহার দ্বারা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কিম্বদন্তিতে শুনা যায়, ইনি চিতে নামক দস্যু দলপতির দ্বারা স্থাপিত, তাহারা ইঁহার পূজা করিয়া সম্মতি-সূচক আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইলে জলে স্থলে লুণ্ঠন করিতে যাইত। মন্দিরটী প্রথমে একেবারে গঙ্গার তীরে ছিল, এক্ষণে নদী হইতে অনেক দূরে সরিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বে এখানে নিবিড় বন ছিল, অনেক নরবলি এই দেবীর সম্মুখে হইয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয়টী কালীঘাটের কালী, যাহা আমাদের এই প্রস্তাবের বর্ণনীয় বিষয়। কোন পুরাণে কালীঘাটের উল্লেখ নাই, উপপুরাণের মধ্যে কেবল এক মাত্র ভবিষ্য উপপুরাণের ব্রহ্মখণ্ডের দ্বাবিংশতি পরিচ্ছেদ ৯৮ শ্লোকে লিখিত আছে, "তাম্রলিপ্তে প্রদেশে চ বর্গভীমা বিরাজতে। গোবিন্দপুর প্রান্তে চ কালী সুরধুনী-তটে।"*

কোন প্রাচীন তন্ত্রেও কালীঘাটের উল্লেখ নাই, কেবল মহানীল তন্ত্রে "কালীঘাটে গুহ্যকালী" বলিয়া লিখিত আছে। প্রত্নতত্ত্ববিদ স্বর্গীয় বাবু

গৌরদাস বসাক বলিয়াছিলেন, পঞ্চদশ শতাব্দীর লোকে কালীঘাটের গুহ্য-কালীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিতেন। আচারনির্ণয় তন্ত্র, মহালিঙ্গ রচন তন্ত্র, চূড়ামণি তন্ত্র প্রভৃতি কয়েকখানি আধুনিক তন্ত্রেই কালীঘাটের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।[৭] পীঠমালায় একান্ন পীঠের স্থান নির্ণয়ে কালীঘাটের কালী ও নকুলেশ্বর শিবের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু "দেবী" অর্থাৎ "দেবী ভাগবত" উপপুরাণে ১০৮ পীঠের মধ্যেও কালীঘাটের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে যে চণ্ডীকাব্যে গঙ্গাতীরের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে কালীঘাটের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়[৮] কিন্তু বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সঙ্কলিত উক্ত গ্রন্থে কালীঘাটের কোন কথা নাই। অক্ষয় বাবু ১৭২৮ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রামাণিক লিপি দৃষ্টেই সঙ্কলন করিয়াছিলেন। যশোহর-পতি মহারাজ প্রতাপাদিত্য ঘোর শাক্ত ছিলেন, নিজে যশোহর নগরে যশোরেশ্বরী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া অতি ভক্তিভাবে পূজা করিতেন। তদ্ভিন্ন যে যে স্থানে শক্তি মন্দিরাদি ছিল, সকল মন্দিরেই পূজা উপহারাদি প্রদান করিতেন। কিন্তু কালীঘাটের কালীর কোন উল্লেখ তাঁহার জীবনচরিতে পাওয়া যায় না। বাঙ্গালার এই অংশ যে তাঁহার অপরিজ্ঞাত ছিল, তাহা নহে, কারণ বেহুলায় তাঁহার গমনাগমন ছিল, কলিকাতার সম্মুখবর্ত্তী সালিখায় তিনি একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। "কালীক্ষেত্রদীপিকা"-প্রণেতা বলেন, রাজা প্রতাপাদিত্যের খুল্লতাত বসন্ত রায় ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারীর মন্ত্র-শিষ্য ছিলেন, এই ভুবনেশ্বরই কালীর বর্ত্তমান সেবায়ৎ বংশের আদিপুরুষ ছিলেন, বসন্ত রায় কালীর প্রথম মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বসন্ত রায়ের সহিত প্রতাপাদিত্যের জ্ঞাতিবিরোধ হেতু জ্ঞাতির গুরুর দেবস্থানে না যাওয়া সম্ভব। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা মানসিংহ বাদসাহের পক্ষ হইতে যখন বাঙ্গালায় বিদ্রোহী দমনে আগমন করেন,তখন তিনি একপ্রকার সমস্ত বঙ্গদেশ তন্নতন্ন রূপে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও কালীঘাটের সন্ধান পান নাই। আবুল ফজল আইন আকবরীতে লিখিয়াছেন, ১৫৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল বঙ্গদেশ জরিপে যে খাজানা বন্দোবস্ত করেন, তন্মধ্যে সপ্তগ্রামের অধীন কলকত্তা, বার্ব্বাকপুর ও বাঁকুয়া, এই তিনটী সংলগ্ন পরগনা হইতে নয় লক্ষ ছত্রিশ হাজার দুই শত পনের দাম অর্থাৎ ২৩৪০৫ টাকা খাজানা স্থির করিয়াছিলেন। তখন কালীর অবস্থা এমন ছিল যে, তিনি উহার কোন উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু চৌরঙ্গীর জঙ্গলের কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে আনিয়াছিলেন।

দক্ষযজ্ঞে সতী প্রাণত্যাগ করিলে মহাদেব ত্রিশূলোপরি তাঁহার দেহ স্থাপন করিয়া শোকে উন্মত্তের ন্যায় উক্ত দেহ ঘুরাইতে ঘুরাইতে সমস্ত পৃথিবী .পর্য্যটন করিতেছিলেন। বিষ্ণু সুদর্শন চক্রযোগে সেই দেহ ৫১ অংশে, কোন কোন মতে ১০৮ অংশে ছেদন করেন। যে যে স্থানে সতী-অংশ পতিত হইল, সেই সেই স্থান মহাপীঠ অর্থাৎ মহা পুণ্যক্ষেত্র হইল, মহাদেব প্রত্যেক পীঠস্থানে উপস্থিত থাকিয়া পীঠরক্ষক হইলেন। গঙ্গাতীরে তাঁহার দক্ষিণ চরণের কনিষ্ঠাঙ্গুলী পতিত হওয়ায় এখানে কালী মূর্ত্তি ও নকুলেশ্বর নামে মহাদেবের আবির্ভাব হয়। ইহাই কালীঘাট সম্বন্ধে মূল কথা। কালীর প্রকাশ সম্বন্ধে অনেকগুলি কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে, আমরা যতগুলি সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা নিম্নে প্রকাশ করা গেল।

১ম, পান পোস্তার দক্ষিণে যে স্থানকে পুরাতন পোস্তা বলে, পূর্ব্বে সেই স্থানে কালীর মন্দির ছিল, কোন সময় মন্দির ভাঙ্গিয়া পড়িয়া যাওয়ায় তীর্থ লুপ্ত হয়। গঙ্গার তীরে মন্দিরের সম্মুখ ভাগে সুবিস্তীর্ণ পোস্তা গাঁথা ছিল, চিরদিন তীর্থযাত্রীদিগের এবং নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকলের সুবিধার জন্য সেই পোস্তায় একটী হাট বসিত, মন্দির পড়িয়া গেলেও তাহার পোস্তা বর্ত্তমান থাকায় হাট বসিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইত না, কিন্তু কালীঘাটের নাম লুপ্ত হইয়া কালে উহা পোস্তার হাট বলিয়া পরিচিত হইল। বহুকাল পরে একদল কাপালিক সন্ন্যাসী গঙ্গাসাগরে যাইতেছিলেন, তাঁহারা উপরোক্ত মন্দিরের ভগ্নস্তূপ অনুসন্ধান করিয়া ইষ্টকরাশির ভিতর হইতে চারিটী ছিদ্রসংযুক্ত ত্রিকোণাকৃতি একখানি কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তরফলক প্রাপ্ত হইয়া, উহাই কালীঘাটের কালী বলিয়া সাদরে তাহা লইয়া গভীর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করেন। তাঁহাদের তন্ত্র মত পূজায় নরবলিরও আবশ্যক হয়, সুতরাং লোকালয়ের নিকট উহা নিতান্ত অসুবিধাজনক। এক্ষণে যেখানে কালীঘাট, সেই স্থানে ভীষণ জঙ্গল ছিল। তথায় তৃণ কাষ্ঠাদিতে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহারা পূজা করিতেন। বাহিরের অতি অল্প লোকেই কালীর সন্ধান প্রাপ্ত হইত। কালে উহা লোকসমাজে প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে।

২য়, ভবানী নামক জনৈক ব্রাহ্মণ শাঁখা বিক্রয় করিতেন, একদিন তিনি শাঁখা বিক্রয় করিবার জন্য গঙ্গাতীর দিয়া যাইতেছিলেন, একটী সধবা ব্রাহ্মণী আসিয়া শাঁখা পরিতে চাহিলেন, ব্রাহ্মণ বর্ত্তমান কালীকুণ্ডতীরে তাঁহাকে শাঁখা পরাইয়া কৌড়ী চাহিলে, স্নান করিয়া আসি, বলিয়া স্ত্রীলোকটী কুণ্ডে নিমগ্ন

হইলেন। স্ত্রীলোক জলমগ্ন হইল ভাবিয়া ব্রাহ্মণ তাড়াতাড়ি হ্রদে নামিতে যাইতেছেন এমন সময় জলমধ্য হইতে ব্রাহ্মণী হস্ত তুলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। সেই সময় আকাশ-বাণী হইল যে, আমি কালী, তুমি এই হ্রদতীরে আমার পূজা প্রকট কর, তোমার ঘরে অমুক স্থানে একটী কৌটায় আমি আছি, গৃহে গিয়া দর্শন কর। ব্রাহ্মণ দ্রুতপদে গৃহে গিয়া কথিত স্থানে একটী কৌটা পাইলেন, তাহা খুলিবামাত্র শত সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতি বাহির হওয়ায় ব্রাহ্মণ চমকিত হইলেন, পরক্ষণে দেখিলেন, একটী পদাঙ্গুলী মাত্র। উহা মস্তকে করিয়া তিনি কুণ্ডতীরে আসিয়া মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হন, তাহা স্থাপিত করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। উহা হইতে কালীঘাটের প্রকাশ।

৩য়, এক ব্রাহ্মণ গঙ্গাতীরে সন্ধ্যা বন্দনাদি করিয়া ফিরিবার সময় বনমধ্যে একটী অপূর্ব্ব আলোক দেখিয়া তাহার অনুসরণ করিয়া কালীকুণ্ডতীরে কালীর মুখের প্রস্তর খণ্ড ও একটী প্রস্তরের পদাঙ্গুলী দেখিতে পান, পরক্ষণে কালীর প্রত্যাদেশ শুনিয়া বুঝিলেন, ঐ অঙ্গুলী সুদর্শন-ছেদিত সতীদেহ এবং ঐ প্রস্তর ফলক ব্রহ্মার নির্ম্মিত কালীর মুখমণ্ডল। ব্রাহ্মণ যত্নপূর্ব্বক উভয় খণ্ড একত্র রাখিয়া পূজা করিতেন, বনমধ্যে অনুসন্ধান দ্বারা তিনি নকুলেশ্বরের শিবলিঙ্গও প্রাপ্ত হইলেন। উহা হইতে কালীঘাট।

৪র্থ, নবদ্বীপপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবাব সরকারে ১২ লক্ষ[১০] টাকা খাজানার দায়ে ঋণী হওয়ায় মুর্শিদাবাদে কারারুদ্ধ হন। নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ রাজার গুণগরিমা জানিতেন, অন্যান্য ঋণীদিগের ন্যায় তাঁহাকে কারাগারে আবদ্ধ না রাখিয়া আপনার সভায় রাখিতেন এবং অবকাশকালে তাঁহার নিকট হিন্দু আচার ব্যবহার ধর্ম্মকর্ম্ম ও পুরাণ ইতিহাসাদি শ্রবণ করিতেন। একদিন নবাব নৌকাবিহারে যাত্রা করেন, রাজাকেও সঙ্গে লন, রাজা তাঁহাকে নিজ জমিদারী দেখাইবার উদ্দেশে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনিয়া নৌকা হইতে নামাইয়া পদচারে জঙ্গল মধ্যে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, এই দেখুন আমার জমিদারী, এই সকল ব্যাঘ্র ভল্লুক ও বনশূকর প্রভৃতি আমার প্রজা। তাঁহারা ভ্রমণ করিতে করিতে গঙ্গাতীরে একটী ক্ষুদ্র কুটীরে এই কালী মূর্ত্তি ও তাঁহার উপাসককে দেখিতে পান। রাজা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের সহিত কথাবার্ত্তায় জানিলেন, ইহাই সতী দেবীর অংশপীঠ, ইহার নামানুসারে স্থানের নাম। ব্রাহ্মণ নিতান্ত নির্লোভী, কিছু মাত্র কাহারও সাহায্য-প্রার্থী নহেন, কিন্তু রাজা নবাবকে অনুরোধ করিয়া কালীর জন্য কিছু দেবোত্তর মঞ্জুর করিতে বলেন। নবাব

ব্রাহ্মণের নির্ভীকতা ও একাকী বিজন বনে নিষ্ঠার সহিত নিজ পারমার্থিক সাধন দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, তিনি রাজার অনুরোধ মাত্র উক্ত প্রদেশ কালীর দেব সেবার জন্য প্রদান করিলেন এবং রাজাকেও তাঁহার সমস্ত ঋণ হইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

৫ম, লক্ষীকান্ত মজুমদারের পৌত্র কেশবচন্দ্র মজুমদার যখন ১৭২০ খৃঃ পূর্ব্ব-বাস নিমতা হইতে উঠিয়া বেহলায় বসতি করেন, তখন তিনি প্রত্যহ গঙ্গাতীরে আসিয়া সন্ধ্যা বন্দনাদি করিতেন, কালী তাঁহাকে প্রত্যাদেশ দ্বারা কালীকুণ্ডের তীরে আপনার মুখমণ্ডল দেখান, কেশব মজুমদার তদ্দৃষ্টে ঐ স্থানে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কালীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন।

৬ষ্ঠ, আত্মারাম নামে এক ব্রাহ্মণ স্বপ্নে কালীকুণ্ডতীরে সতী অংশের স্থিতি জানিয়া ঐস্থানে আসিয়া মূর্ত্তি আবিষ্কার করেন, এবং পূজা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

৭ম, বরিসার সাবর্ণ চৌধুরী বংশীয় সন্তোষ রায় কেশব রায়ের পুত্র একদিন সন্ধ্যাকালে কালীঘাটের নিম্ন দিয়া নৌকা করিয়া যাইতেছিলেন, তখন ঐ স্থান ভীষণ জঙ্গল ছিল, ব্যাঘ্র ভল্লুক ভিন্ন কোন মনুষ্যের বাস ছিল না। সন্তোষ রায় বনমধ্যে দেবারতির শব্দ পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, নৌকা হইতে সদলে উঠিয়া গিয়া দেখেন, একজন ব্রাহ্মণ একটী কুটীর মধ্যে কালীদেবীর আরতী করিতেছেন[১১]।

৮ম, বাবু গৌরদাস বসাক বলেন, দশনামী শৈব সন্ন্যাসী চৌরঙ্গী গিরি সশিষ্য গঙ্গাসাগর যাইতেছিলেন, গঙ্গাতীরে কালীর প্রস্তর খোদিত মুখমণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া উক্ত স্থানে কুটীর বাঁধিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পরে জঙ্গল গিরি নামক তাঁহার এক শিষ্যের হস্তে কালী পূজার ভার দিয়া আপনি চলিয়া যান। প্রস্তরফলক প্রাপ্তি সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তি যে, চৌরঙ্গী দেখিলেন, বনমধ্যে এক স্থানে একটী গাভী দাঁড়াইয়া আপনি মৃত্তিকার উপর অজস্র দুগ্ধ-ধারা দান করিতেছে। প্রায় অধিকাংশ দেবাবিষ্কারে এই এক প্রবাদ চিরকাল চলিয়া আসিতেছে, সন্ন্যাসী এই ব্যাপার দেখিয়া সেই স্থান খনন করিতেই উক্ত প্রস্তরফলক দেখিতে পান।

উপরোক্ত আটটী জনশ্রুতির মধ্যে ছয়টী আবিষ্কার সম্বন্ধে, অপর দুইটী আবিষ্কারের পর বড় লোকের আশ্রয় সম্বন্ধে। প্রথম এই ছয়টী মত আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। ৫ম মতে কেশব রায়চৌধুরীর আবিষ্কারের কথা এককালে

অপ্রামাণিক কারণ তিনি ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দের পর কালী আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। দ্বিতীয়টী ভবানী দাস চক্রবর্ত্তীর সমগ্র পরিচয় কালীক্ষেত্রদীপিকায় পাওয়া যাইতেছে, ইঁহার পিতার নাম পৃথ্বীধর চক্রবর্ত্তী, নিবাস খন্যান গ্রাম। ইনি নিরুদ্দিষ্ট পিতার সন্ধানে ভ্রমণ করিতে করিতে কালীঘাটের কালী মন্দিরে উপস্থিত হইলে পুরোহিত ভুবনেশ্বরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ করেন এবং তাঁহারই নিকট বাস করিতে থাকেন। সম্ভবত ইঁহার নামানুসারে ভবানীপুরের নাম হইয়া থাকিবে। মান-সিংহের বাঙ্গালা জয়ের অনতিপূর্ব্বে এই ঘটনা হওয়ায় আমরা ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ভবানী দাসের আগমন ধরিয়া লইলাম। ইঁহার শ্বশুর ভুবনেশ্বর রাজা বসন্ত রায়ের গুরু এবং বসন্ত রায় কালীর প্রথম মন্দির নির্ম্মাতা হইলেও রাজা প্রতাপাদিত্য বা মানসিংহ কেন কালীর তত্ত্ব লন নাই, একথার উত্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে যে, তখন কালীঘাটের নিতান্ত শৈশবাবস্থা, অমন অবস্থায় কালী গঙ্গাতীরে শত শত ছিল, যখন ধনীদিগের আশ্রয়ে আসিয়া আপনার প্রতিপত্তি দেখাইতে সক্ষম হইল, তখন লোকে ইহাঁকে শক্তিপীঠ বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। কিন্তু এই সময় হইতে কালীর শ্রীবৃদ্ধি, তাহার সন্দেহ নাই। অপর চারটীর বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। ১ম জনশ্রুতিতে দেখা যাইতেছে, পোস্তার নিকট হইতে কোন সন্ন্যাসী মুখমণ্ডল তুলিয়া লইয়া গভীর বনমধ্যে প্রবেশ করিয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিলেন। ৩য়টী প্রথমটীকে কোন অংশে খণ্ডন করে নাই, বিশদভাবে বর্ণন করিয়াছে মাত্র। ষষ্ঠটীও ঐরূপ, কেবল ইহাতে ব্রাহ্মণের আত্মারাম বলিয়া নাম পাওয়া যাইতেছে। এই কয়টীর সহিত অষ্টম অর্থাৎ বাবু গৌরদাস বসাকের কথা মিলাইতেও অধিক প্রয়াসের আবশ্যক হয় না। চৌরঙ্গী গিরিকে যদি ইহার আবিষ্কারক বলা যায়, তাহা হইলে কোন আপত্তি হইতে পারে না। একজন জ্যোতি দর্শন করিয়াছিলেন, একজন স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন, আর একজন গাভীকে নিজ হইতে দুগ্ধ দান করিতে দেখিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন, ইহা একই কথা। কারণ দেবাবিষ্কারের এইরূপ কোন না কোন পন্থাই সর্ব্বত্র প্রচলিত। লুপ্ত তীর্থ আবিষ্কার করা সন্ন্যাসীদিগের একটী কর্ত্তব্য কার্য্য। বৈষ্ণব সন্ন্যাসী রূপ ও সনাতন বৃন্দাবন প্রভৃতি লুপ্ততীর্থ আবিষ্কার করিয়াছিলেন। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসী কালীতীর্থ আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়া সফল হইয়াছিলেন, ইহাতে আশ্চর্য্য হইবার বিষয় কি আছে? ইংরাজদিগের আগমন হইতে কলিকাতার দক্ষিণস্থ জঙ্গলের

চৌরঙ্গী নাম[১২] শ্রুত হওয়া যাইতেছে, অথচ এই নামের কোন কারণ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই। "হটপ্রদীপ'' গ্রন্থে চৌরঙ্গী গিরির উল্লেখ আছে, উইলসন সাহেব তাঁহার Religious Sects নামক গ্রন্থের ২১৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন আদিনাথ গোরক্ষের পর চৌরঙ্গী ষষ্ঠ বংশীয় শিষ্য, ভক্ত কবিরের সমকালবর্ত্তী। এই কবির সুলতান ইব্রাহিম লোদির দ্বারা বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, ১৫২৬ পর্য্যন্ত সুলতান লোদির রাজত্বকাল। ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খ্রীঃ অব্দে সেটবসাকেরা গোবিন্দপুর স্থাপন করিয়াছিলেন, বর্তমান কালীঘাটের স্থাপনও ইহার সমকালীন বলিয়া জানাযাইতেছে। এই কাল চৈতন্যদেবের উড়িষ্যা যাত্রার অব্যবহিত পরে, সেইজন্য, তাঁহার জীবনচরিতে কালীঘাটের কোন উল্লেখ নাই। তিনি বৈষ্ণব বলিয়া শক্তি প্রতিমার প্রতি কোথাও অভক্তির পরিচয় দেন নাই, বরং গম্য পথের নিকটবর্ত্তী যে কোন দেব দেবীর মন্দির দেখিয়াছেন অসাম্প্রদায়িক ভাবে সেখানে প্রণামাদি করিতেন। "মাগি লব কৃষ্ণভক্তি সকলের ঠাঁই।" এই কথা বলিয়া তিনি আপনার উদারতার পরিচয় প্রদান করিতেন।

মহানীল তন্ত্র ইহাকে গুহ্যকালী বলিয়াছেন, গৌরদাস বাবুর মতে ১৫ শতাব্দীর লোকেরা কালীঘাটে গুহ্যকালীর অস্তিত্ব বিশ্বাস করিত, এবং কালী আবিষ্কার সম্বন্ধে যতগুলি মত প্রচলিত, সমস্ত গুলিতে কালীর মুখমণ্ডল প্রাপ্তির কথা প্রচলিত আছে, ইহা দ্বারা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্ত্তমান কালীর আবিষ্কার হইলেও প্রাচীন কালে এই কালীর মন্দির নিকটস্থ কোন স্থানে নিশ্চয় ছিল। পোস্তার নিকট থাকাই সম্ভব, কারণ ঐ স্থানটী কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোচ্চ, আদি গঙ্গার মুখ হইমে ৩১ ফুট উচ্চ। ১৫শ শতাব্দীর পূর্ব্বে কোন সময় দৈব উৎপাতে ঝটিকা বা ভূমিকম্পের সহিত জল-প্লাবনে তাহা ভূমিসাৎ হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বে প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, ভুলুয়ার নিকট বিশ্বম্ভর শূর মৃত্তিকা মধ্যে প্রস্তরের বরাহী মূর্ত্তি পাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ উক্ত বরাহী মূর্ত্তি ও কালীঘাটের কালীমূর্ত্তি এক সময়ের উপদ্রবেই অদৃশ্য হইয়া থাকিবে।

বরিষার সাবর্ণ চৌধুরীদিগের আদি পুরুষ কেশব রায় ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দে নিমতা হইতে নবাব মুর্শেদকুলি খাঁর আদেশে দক্ষিণ বাঙ্গালায় খাজনা আদায়ের ভার প্রাপ্ত হইয়া আসিয়া বরিসায় বাস করেন, তখন উহা মুড়াগাছা পরগণা ছিল। কেশব রাম রায় চৌধুরী নাবালক থাকার জন্য রুক্মিণীকান্ত খাঁকে ব্যবহর্ত্তা উপাধি

দিয়া কেশবের ব্যবহর্ত্তা অর্থাৎ ম্যানেজার নিয়োগ করেন, রুক্মিণী রাজা নবকৃষ্ণের প্রপিতামহ। কেশবরাম রায় তখন ঐ অঞ্চলের প্রকৃত জমীদার হন, এবং পাইকান পরগণা পর্য্যন্ত খাজনা আদায়ের ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কলিকাতা প্রভৃতি স্থান তখনও নদীয়া জেলার মধ্যেই ছিল, সেই জন্যই রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আলিবর্দ্দী খাঁকে আপনার জমীদারীর অবস্থা দেখাইবার জন্য চৌরঙ্গীর জঙ্গলে লইয়া গিয়াছিলেন। কালীর অধিকারীদিগের উপাধি হালদার, ইঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষ ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, তাঁহার দুই পুত্র যাদবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, ও রামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, যাদবচন্দ্রের প্রপৌত্র জয়দেব হালদার আর রামচন্দ্রের বৃদ্ধ প্রপৌত্র গোকুল হালদার। গোকুল হালদার সম্পর্কে জয়দেব হালদারের ভ্রাতুস্পুত্র সমসাময়িক। দীপিকার বংশতালিকায় ইঁহারাই প্রথম হালদার উপাধিলব্ধ দেখা যাইতেছে। ১৬০০ খ্রীঃ ভবানীদাস যখন বিবাহিত হইয়াছিলেন, তখন অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার ষষ্ঠ পুরুষের আবির্ভাব অসম্ভব নহে। ঐ সময় নবাব আলীবর্দ্দীর রাজা কৃষ্ণচন্দ্র সহ কালীঘাটে আসিয়া দেবোত্তর দান ও অধিকারীদ্বয়কে হালদার উপাধিতে ভূষিত করা সম্ভব। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তদবধি কালীর প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিলেন যে, মধ্যে মধ্যে কালীর পূজা দিবার জন্য রাজধানী হইতে কালীঘাটে আগমন করিতেন। সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে জগৎসেঠের গৃহে যে চক্রান্ত সভা হয়, রাজা সেই সভায় বক্তৃতাকালীন বলিয়াছিলেন, "আমি কালীঘাটে পূজা দিবার জন্য মধ্যে মধ্যে গমন করিয়া থাকি, আসিবার সময় কলিকাতায় কোম্পানির বড় সাহেবদিগের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আলাপ পরিচয় হইয়া থাকে" ইত্যাদি। উপরে ৪র্থ কিম্বদন্তিতে আলীবর্দ্দীর দেবোত্তর দান আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না, কারণ নবাব আলীবর্দ্দী খাঁ ১৭৪০ খ্রীঃ সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তখন কালীঘাট প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র না থাকিলে, হলওয়েল সাহেব ১৭৫২ সালের রিপোর্টে কালীঘাটের কথা উল্লেখ করিতেন না। মহারাজা বসন্ত রায় আপনার গুরু ভুবনেশ্বর ব্রহ্মচারীকে ১৬ শতাব্দীতে কালীঘাটের ছয় শত বিঘা ভূমি দেবোত্তর দান করিয়াছিলেন, ইহাই যুক্তিসঙ্গত। কারণ উক্ত প্রদেশ সে সময় যশোহর-পতিদিগেরই করায়ত্ত ছিল। সেই জন্যই কোন বর্ত্তমান দপ্তরে উক্ত দেবোত্তরের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। সাবর্ণচৌধুরী কেশব রায়ের পুত্র সন্তোষ রায় কালীর বর্ত্তমান মন্দিরের নির্ম্মাতা। এই সময় কলিকাতায় কোন ধনাঢ্য পরিবারে একটী সামাজিক ক্রিয়া লইয়া দলাদলি হয়, তাহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই—মুন্সী নবকৃষ্ণ মহারাজ ও প্রতিষ্ঠাবান হওয়ায়, সে

কালের পুরাতন ধনবানদিগের মধ্যে অনেকেরই চক্ষুশূল হন। চূড়ামণি দত্ত নামক এক বাবু রাজার প্রতিবাসী ছিলেন। তাঁহার পুত্র কালীপ্রসাদ দত্তের নামে গ্রে ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ষ্ট্রীট বর্ত্তমান আছে। (পূর্ব্বে উহা রাজা নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ছিল।) মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হইতে নীলমণি সরকারের লেন যেখানে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে পড়িয়াছে, ঠিক তাহার সম্মুখে চূড়ামণি দত্তের দক্ষিণমুখী দরজা ছিল, ফটক নহে, বৃহৎ চৌকাটওয়ালা প্রকাণ্ড দরজা। গৃহ মধ্যে সুপ্রশস্ত চাঁদনীওয়ালা উঠান এবং তাহার চারিদিকে দ্বিতল গৃহ। গৃহের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ সীমা কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা বালাখানা ষ্ট্রীট, উত্তর সীমা প্রায়ই সমস্ত রাজা নবকৃষ্ণের জমি। এই গৃহ আজিও অতি সুন্দর ভাবে আমাদের স্মৃতিপটে জাগরূক আছে। গৃহের পশ্চিমে বিস্তীর্ণ উদ্যান ও পুষ্করণী ছিল, পরে সেখানে বাগদী প্রজা বসিয়াছিল, আমরা বাল্যকালে তথা হইতে ছাগদুগ্ধ ও ধাত্রী ডাকিয়া আনিতাম। এখন পুরাতন বাটীর পূর্ব্ব দক্ষিণ কোণের একটী ক্ষুদ্র কুটরী পূর্ব্বের কারুকার্য্য করা কড়িকাষ্ঠ সহ নিচু ছাদ বর্ত্তমান আছে। সর্ব্বদাই চূড়ামণি দত্তের সহিত রাজার বিবাদ বিসম্বাদ চলিত, উভয়ে উভয়কে ঠকাইবার চেষ্টা করিতেন। অবান্তর দু-একটী সেকেলে গল্প যাহা বাল্যকালে বৃদ্ধ কর্ত্তাদিগের নিকট শুনিতাম, তাহা বলিলে বোধ হয় পাঠকদিগের ধৈর্য্যচ্যুতি হইবে না। একদিন এক ব্রাহ্মণ একটি ছোট পাথরবাটি লইয়া রাজা নবকৃষ্ণের বাটীতে গিয়া গোপীমোহন বাবুকে বলেন, আমার ছেলের কাণ পাকিয়াছে, একটু পচা আতর যদি দেন, তাহার কাণে দিব। রাজকুমার সরল ব্রাহ্মণের আতর লইতে পাথরবাটি আনা দেখিয়া আমোদ করিয়া বলিলেন, ঠাকুর, চূড়ামণি বাবুর কাছেই সে আতর আছে, কিন্তু তিনি যে রকম মেজাজের লোক আপনি অত ছোট বাটি লইয়া গেলে বিরক্ত হইতে পারেন, একটা বড় কলসী লইয়া যাইবেন। ব্রাহ্মণ রহস্য বুঝিতে না পারিয়া তাহাই করিলেন। তখন চূড়ামণি বাবু তৈল মাখিতেছিলেন, ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়া কালীপ্রসাদকে ডাকাইয়া বলিলেন আগে গন্ধী (আতরওয়ালা) ডাকাইয়া ব্রাহ্মণকে এক কলস আতর দাও, পরে স্নান করিব। ব্রাহ্মণের সম্মুখেই আড়াই হাজার টাকার আতর কিনিয়া তাহার কলসী ভরিয়া দিয়া বলা হইল, দেখ ঠাকুর, গুপী ছেলে মানুষ, তুমি নবকে গিয়া এই আতর দেখাইয়া আবার আমার নিকট লইয়া আইস। (চূড়ামণি বাবু বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া রাজাকে নব বলিয়া ডাকিতেন)। ব্রাহ্মণ ফিরিয়া আসিলে তাঁহাকে সমস্ত রহস্য

ভাঙ্গিয়া দিয়া আতরটুকু নিজ গৃহে রাখিলেন এবং তাহার মূল্য আড়াই হাজার টাকা ব্রাহ্মণকে প্রদান করিলেন। প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য অনর্থক এই পাঁচ হাজার টাকা খরচ করা হইল। একবার রাজবাটীতে কোন পারিবারিক অনুষ্ঠানে চূড়ামণি দত্তের কন্যা নিমন্ত্রণ রাখিতে যান, তাঁহার অঙ্গুরীতে একখানি বৃহৎ বহু মূল্য নীলকান্ত মণি ছিল, কন্যা নিমন্ত্রণ সভায় পদার্পণ মাত্র উপরিস্থ লোহিত বর্ণের সামিয়ানা ময়ূরপংখী রং ধারণ করিল এবং চারিদিকে এক আশ্চর্য্য বর্ণের জ্যোতি বিকীর্ণ হইতে লাগিল। রাজার ইহার কারণ অনুসন্ধান করায় বাটীস্থ মহিলারা দত্ত কন্যাকে রাজার নিকট লইয়া গিয়া উক্ত নীলাযুক্ত অঙ্গুরী দেখান, রাজা প্রস্তরের বিস্তর প্রশংসা করিয়া ছিলেন। কন্যা গৃহে আসিয়া পিতাকে উক্ত ঘটনা বলিলে তিনি আনুষ্ঠানিক উপহারের সহিত উক্ত অঙ্গুরীটীও রাজ-বাটীতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের ২২ নভেম্বর রাত্রে আপনার গৃহের খট্টোপরি নিদ্রাবস্থায় সকলের অলক্ষিতে মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছিলেন। সে সময় এ প্রকার মৃত্যুকে লোকে অপঘাত মৃত্যুর সমান মনে করিত। সজ্ঞানে গঙ্গায় অন্ততঃ তিন রাত্রি বাসের পর নাভিদেশ পর্য্যন্ত গঙ্গা জলে ডুবাইয়া গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম নাম জপ করিতে করিতে গঙ্গাজল পান করিয়া যে মৃত্যু তাহাই হিন্দুরা বাসনা করিতেন। সুতরাং রাজার মৃত্যুতে সাধারণ লোকে কাণাঘুষা করিতে থাকে। চূড়ামণি দত্তের পীড়া সাংঘাতিক আকার ধারণ করিবামাত্র তিনি বহু সংখ্যক ঢুলী আনাইয়া আপনি একখানি রৌপ্যের চতুর্দ্দোলে বসিয়া গঙ্গাযাত্রায় চলিলেন। যাত্রাটী বিবাহযাত্রীর মত হইল, অসংখ্য লোহিত বর্ণের পতাকা, দলে দলে নগরকীর্ত্তন, চতুর্দ্দোলটী নূতন রকমে সাজান, নামাবলীর চন্দ্রাতপ, তুলসীমালার ঝালর, চারিদিকে তুলসী গাছ, মধ্যে চূড়ামণি দত্ত আসন করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার মস্তকের উপর শালগ্রাম-শিলা, সর্ব্বাঙ্গ হরিনামের ছাপে চিত্রিত, পরিধানে রক্তবর্ণের চেলী, পৃষ্ঠে নামাবলী এবং গলে ও হস্তে জপমালা। অগ্রে ঢুলিরা "চূড়া যায় জম জিনিতে" বাজাইতে লাগিল, কীর্ত্তনীয়ারা গাইতে লাগিল :—

"আয়রে আয় নগরবাসী দেখ্‌বি যদি আয়।
জগৎ জিনিয়া চূড়া জম জিনিতে যায়॥
জম জিনিতে যায় রে চূড়া জম জিনিতে যায়।
জপ তপ কর কিন্তু মরিতে জানিলে হয়॥"

রাজবাটীর সম্মুখে বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া নানা অঙ্গভঙ্গীর সহিত এই গান গাহিয়া

চূড়ামণি দত্ত অগ্রসর হইলেন। রাজবাটীর লোকে চূড়ামণি বাবু কর্ত্তৃক এই ব্যাপারে কিরূপ মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কয়েকদিন গঙ্গাবাস করিয়া সত্য সত্য জম জিনিতে গমন করিলেন। চূড়ামণি নিজে জম জিনিলেন বটে, এদিকে কিন্তু তাঁহার পুত্র বাবু কালীপ্রসাদ এক মহা বিপদে পড়িলেন। চারি দিকে জনরব উঠিল, কালীপ্রসাদ বাবু এক মোগল বাইওয়ালীর গৃহে রাত্রি যাপন করেন। সুতরাং তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধে কোন কায়স্থ উপস্থিত হইবে না। কায়স্থদিগের জন্য কালীপ্রসাদ তত উদ্বিগ্ন হন নাই, কারণ সে সময় কলিকাতায় কায়স্থদিগের অনেকগুলি দল ছিল, রাজাদিগের দল ভিন্ন সকল দল নিশ্চয় উপস্থিত থাকিবে আশ্বাস পাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণদিগের জন্য বড় চিন্তা হইল। কলিকাতা ও নিকটস্থ অধিকাংশ ব্রাহ্মণ রাজবাটীর বৃত্তিভোগী ও অনুগত,[১৩] ইহারা উপস্থিত না থাকিলে এবং দান গ্রহণ না করিলে কিরূপে পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন হইতে পারে? এই বিপদে আক্রান্ত হইয়া কালীপ্রসাদ বাবু মহামতি রামদুলাল সরকার মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিতে গেলেন। সরকার মহাশয় তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, আপনার কোন চিন্তা করিবার আবশ্যক নাই, আমার এবং আপনার বাক্সে একটী পয়সা থাকা পর্য্যন্ত যাহাতে আপনার পিতৃদেবের শ্রাদ্ধক্রিয়া রীতিমত সম্পন্ন হয়, তাহা আমি করিব। রামদুলাল বাবু বরিসার সাবর্ণ চৌধুরী বৃদ্ধ সন্তোষ রায় মহাশয়ের নিকট গমন করিয়া কালীপ্রসাদের প্রতি অত্যাচারের কথা জানাইয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করায়, তিনি নিশ্চিন্ত হইতে বলিয়াছিলেন। সন্তোষ রায় কুলশীল, ধনমানে ও প্রতিপত্তিতে সে সময় দক্ষিণ বঙ্গে একমাত্র সমাজপতি ব্রাহ্মণ। অসংখ্য ব্রাহ্মণ তাঁহার পিতা কেশবরাম রায়ের এবং তাঁহার নিকট ব্রহ্মোত্তর লাভ করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছেন, সুতরাং তাঁহার ব্রাহ্মণের অভাব নাই। নির্দ্দিষ্ট দিনে আপনি অসংখ্য ব্রাহ্মণ লইয়া শ্রাদ্ধ সভায় উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিয়াছিলেন। এই শ্রাদ্ধে কালীপ্রসাদ বাবু উপরোক্ত ব্রাহ্মণদিগের বিদায়ের জন্য ২৫ হাজার টাকা দান করেন। সন্তোষ রায় ব্রাহ্মণদিগকে বলেন, লোকে বলিবে, আমরা টাকার লোভে পতিত ব্যক্তির পিতৃশ্রাদ্ধে সভাস্থ হইয়াছিলাম, এ অপবাদ রাখা অপেক্ষা এই টাকা কালী দেবীর মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করি, ইহাই আমার ইচ্ছা। কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে আপত্য না করায়, তাহাই হইল। বর্ত্তমান মন্দির সেই মন্দির, অন্যান্য অনেক ধনীলোক ইহার নিকটস্থ অন্যান্য মন্দির এবং আবশ্যকীয় গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। কালীক্ষেত্র-দীপিকা বলেন,—প্রধান মন্দিরটি

আট কাঠা ভূমির উপর ৬০ হাত উচ্চ হইয়া দণ্ডায়মান, ইহার ভিতরের পরিসর ৫০ হস্ত, নির্ম্মিত হইতে ৭।৮ বৎসর সময় লাগিয়াছিল এবং সে কালের অর্থাৎ শত বৎসর পূর্ব্বের বাজারে প্রায় ৩০ হাজার টাকা ইহাতে ব্যয় হইয়াছে। সন্তোষ রায়ের মৃত্যুর কয়েক বৎসর পরে ১৮০৯ সালে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হয়। একটী ইষ্টক স্তম্ভে চারিটী হুকে চারিটী সোণার হাত এবং উপরে মুখের প্রস্তরখানি বসান আছে। জনশ্রুতি যে সতীর পদাঙ্গুলী প্রস্তরবৎ হইয়া ঐ স্তম্ভ মধ্যে আছে, স্নানযাত্রার সময় হালদার বংশীয় সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যিনি, কেবল তিনি উহা বাহির করিয়া গঙ্গাজলে অভিষেক করাইয়া থাকেন। এখন যে প্রকার কালী মূর্ত্তি সচরাচর দেখা যায়, পূর্ব্বের কোন কালী মূর্ত্তিই তদ্রূপ ছিল না। তমলুকের বর্গভীমা, চিৎপুরের চিত্রেশ্বরী, কালীঘাটের কালী, প্রতাপাদিত্যের যশোরেশ্বরী, সকলই কিম্ভূতকিমাকার। যশোরেশ্বরীরও মুখমণ্ডল ব্যতীত অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ছিল না। অনুমান হয়, কালীঘাটের কালীর অনুকরণেই উহা নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

১৬শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে প্রথমে চৌরঙ্গী গিরির তৎপরে জঙ্গল গিরির নাম পাওয়া যাইতেছে, ইঁহারা সমসাময়িক। তাহার পর একেবারে ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী হইতে ধারাবাহিক অধিকারীদিগের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু সময় ধরিলে ভুবনেশ্বরের পূর্ব্বে আর কয়েকজন অধিকারী থাকা সম্ভব। কারণ চৌরঙ্গী ১৬শ শতাব্দীর প্রথমে আর ভুবনেশ্বরকে উক্ত শতাব্দীর সম্পূর্ণ শেষ ভাগে দেখিতেছি। তিন বা চারি পুরুষের বংশাবলী ধরা হয় বটে, কিন্তু গুরু শিষ্য বংশ সে হিসাবে ধরা যাইতে পারে না, পাঁচ ছয় পুরুষের কম গুরু শিষ্যের বংশ হইতে পারে না। অনুমান হয়, জঙ্গল গিরি ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে আরও দুই তিনজন সেবক ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। বোধ হয় যে আত্মারাম ব্রহ্মচারীর নামে আবিষ্কারের জনশ্রুতি আছে, তিনিই ভুবনেশ্বরের পূর্ব্ববর্ত্তী অধিকারী থাকিবেন। ভুবনেশ্বর চক্রবর্ত্তী ব্রহ্মচারী পর্য্যন্ত তান্ত্রিক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার জামাতা ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী বৈষ্ণব, বোধ হয় শ্যামরায় নামক কৃষ্ণবিগ্রহ তিনিই কালীর সহিত রাখিয়া মন্দিরে পূজা করিতেন। দীপিকা বলেন, ১৭২৩ সালে নবাবের কোন কর্ম্মচারী কালী কৃষ্ণ এক মন্দিরে দেখিয়া দুঃখিত হন এবং শ্যামরায়ের স্বতন্ত্র মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। অধিকারীরা সর্ব্বপ্রথমে আপনাদিগের পারিবারিক পূজা করেন, কিন্তু ইঁহারা বৈষ্ণব বংশ বলিয়া আপনাদিগের নিত্য পূজায়

বলিদান করেন না, কেবল মহাষ্টমী দিবসের পূজায় একটীমাত্র ছাগ বলি দিয়া থাকেন। প্রত্যহ যে অসংখ্য ছাগ মহিষ বলি হয়, তাহা অপরাপর যাত্রীদিগের প্রদত্ত।

১. "নব্যভারতের" গত সংখ্যায় ৩২১ পৃষ্ঠায় "ভূতত্ত্ব" প্রস্তাবের শেষে ১০০ ফিট ও ৮৬ ফিটের স্থানে ১০০ মাইল ও ৮৬ মাইল হইবে।

কলিকাতার পুরাতন কোন কথা, পুরাতন বংশাবলী, পুরাতন লোকদিগের জীবনচরিত ও গল্প যিনি পাঠাইবেন, সাদরে গৃহীত হইবে। যাহা প্রকাশিত হইতেছে, তাহার মধ্যে যে সমস্ত ভ্রম থাকিবে, যিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা সংশোধন করিয়া পাঠাইবেন, আমরা তাহার নিকট বিশেষ বাধিত হইব।

২. যদিও আর্য্যজাতি প্রধানত সৌর, গাণপত্য, শাক্ত, শৈব, ও বৈষ্ণব, এই পাঁচ সম্প্রদায়ে বিভক্ত, কিন্তু এক্ষণে শাক্ত ও বৈষ্ণব এই দুই সম্প্রদায়েরই প্রাধান্য দেখিতে পাওয়া যায়।

৩. অষ্টাদশ পুরাণ যথা :—অগ্নিপুরাণ, কূর্ম্মপুরাণ, গরুড়পুরাণ, নারদীয়-পুরাণ, পদ্মপুরাণ, বায়ুপুরাণ (শৈব), বামনপুরাণ, বরাহপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ব্রহ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ, ভবিষ্যপুরাণ, ভাগবতপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ, মার্কণ্ডেয়পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, স্কন্দপুরাণ।

৪. উপপুরাণ যথা :—আদিত্য, কল্কি, কাপিল, কালিকা, দুর্ব্বাসা, দেবী, নন্দী, নারদ, নৃসিংহ, বশিষ্ঠ, বৃহদ্ধর্ম্ম, ব্রহ্মাণ্ড, ভবিষ্য, ভৃগু, মহেশ্বর, মানব, মুদ্গল, শাম্ব, শিব, সনৎকুমার। এই কয়েকখানি প্রধান, তদ্ভিন্ন আরও উপপুরাণের নাম শুনিতে পাওয়া যায়।

৫. তন্ত্রশাস্ত্রের সংখ্যা নাই, প্রায়ই আবিষ্কৃত হইতেছে, তন্মধ্যে নিম্নে কয়েকখানি প্রচলিত তন্ত্রের নামোল্লেখ করা গেল, যথা :—আচার নির্ণয়, কালীবিলাস, কামাখ্যা, কুলাবতী, কুলার্ণব, গুপ্তসাধন, চূড়ামণি, নিত্যা, নিরুত্তর, পিচ্ছিলা, বিশ্বসার, বৃহদ্যামল, মহানির্বাণ, মহাশীল, মহালিঙ্গরচন, মেরু, যোগিনী, শ্যামারহস্য, সারদা, বরাহী, ডামর, কাত্যায়ণী, তদ্ভিন্ন রাধা ও বিবর্ত্ত-বিলাস নামে দুইখানি বৈষ্ণবতন্ত্রও বিলক্ষণ প্রচলিত।

৬. ইহাতে কালীঘাটের প্রাচীনত্ব প্রমাণ অপেক্ষা ভবিষ্য উপপুরাণেরই আধুনিকতা সপ্রমাণ হইতেছে, কারণ গোবিন্দপুর ১৫২০ হইতে ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দের

মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে। গোবিন্দপুর আলোচনাস্থলে তাহা বিশদরূপে আলোচিত হইবে।

৭. তন্ত্রচূড়ামণিতে, কেবল কালীঘাটের কালীর উল্লেখ পাওয়া যায়, এমন নহে, নলহাটীর কালী, বেহালার বেহুলাদেবী এবং রাজা প্রতাপাদিত্যের স্থাপিত যশোরেশ্বরী কালীর পর্য্যন্ত উল্লেখ আছে। তাহাতেই বুঝা যায়, তন্ত্রচূড়ামণি প্রতাপাদিত্যের সময়ে লিখিত। পরে হইলে যশোরেশ্বরী উল্লেখ থাকিত না, কারণ তিনি মানসিংহের পুরাতন রাজধানী অম্বরে বিরাজ করিতেছেন। "বঙ্গীয় সমাজ" লেখক বাবু সতীশচন্দ্র রায়চৌধুরী ১৬০ পৃঃ লিখিয়াছেন, "প্রতাপ প্রতিষ্ঠিত সেই মন্দির ও দেবীমূর্ত্তি অদ্যাপি বর্তমান আছেন।" আমাদের অনুমান হয়, পরে দ্বিতীয় মূর্তি গঠিত হইয়াছে।

৮. বটতলার মুকুন্দরামের চণ্ডীতে লিখিত আছে :—

ত্বরায় বহিছে তরি তিলেক না রয়।
চিৎপুর সালিখা সে এড়াইয়া যায়॥
কলিকাতা এড়াইল বেনিয়ার বালা।
বেতড়েতে উত্তরিল অবসান বেলা॥
ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলীর পথ।
রাজহংস কিনিয়া লইল পারাবত॥
বালুঘাট এড়াইল বেনের নন্দন।
কালীঘাটে গিয়া ডিঙ্গা দিল দরশন॥

আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, উপরোক্ত কয়েক ছত্র প্রকৃত মুকুন্দরামের লিখিত কিনা। প্রথমত সে সময় কলিকাতার এখনকার মত অবস্থা ছিল না যে, তাহার নাম অবশ্য লিখিতবা, বরং সুতানুটী ও গোবিন্দপুর সে সময় কলিকাতা অপেক্ষা অধিক প্রসিদ্ধ ছিল। বেতড় ও বালুঘাটা গঙ্গাতীরে কোথায় পাইলেন, জানিনা, বেতড় হাবড়ার অন্তঃপাতী একটী গণ্ডগ্রাম, গঙ্গাতীর হইতে প্রায় তিন ক্রোশ পশ্চিম, বালুঘাটা কলিকাতার পূর্ব্বে, গঙ্গার সহিত তাহারও কোন সংশ্রব নাই। যদি বলা যায়, মুকুন্দরাম নিজে এসব না দেখিয়া লোকমুখে স্থানগুলির নাম শুনিয়া লিখিয়াছেন, তাহাও অসম্ভব, কারণ ১৫৪৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার নাম কেবল তৌজিভুক্ত ছিল, তাহাও কলিকাতা নহে "কলকত্তা"। ইহাতে অনুমান হয়, কলিকাতা রাজধানী হইবার পর কোন লিপিকর মুকুন্দরামে ঐ কয় ছত্র সংযোগ করিয়া থাকিবেন, অথচ

লিপিকরও এই সকল স্থান নিজে দেখেন নাই। বাবু অক্ষয় সরকারের লিপি সেই জন্য প্রামাণিক বলিয়া অনুমান হয়।

৯. আমাদের বর্ত্তমান গবর্ণর জেনেরল লর্ড কর্জ্জন বাহাদুর যে প্রকার ঐতিহাসিক তত্ত্বপ্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে আমরা সাহসী হইয়া তাঁহাকে অনুরোধ করিতেছি, তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক পুরাতন পোস্তার স্থানে স্থানে বোরিং যন্ত্র দ্বারা পরীক্ষা করাইলে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে।

১০. কেহ কেহ ৫২ লক্ষ লিখিয়াছেন। বাবু কালীময় ঘটক লিখিয়াছেন, রাজার পিতার আমলের ১০ এবং তাঁহার নিকট হইতে ১০ এই ২০ লক্ষ টাকার দায়ে তিনি আবদ্ধ হন।

১১. ৩য়, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম কিম্বদন্তি কালীক্ষেত্রদীপিকা নামক পুস্তক হইতে সারসংগ্রহ।

১২. কলিকাতার, অর্থাৎ বর্ত্তমান লালদীঘির দক্ষিণ হইতে বহুদূর দক্ষিণ পর্য্যন্ত একটী জঙ্গল বহু কাল হইতে বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু পূর্ব্বে উহার কোন নাম ছিল না। চৌরঙ্গী সন্ন্যাসীর কালীপ্রতিষ্ঠা ও তাঁহাদের উহার মধ্যে বাসের জন্য উহার নাম চৌরঙ্গী হওয়া ভিন্ন আর কোন প্রমাণিত নাম পাওয়া যায় না। ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে নবাবপুত্র মীরণ কোম্পানিকে যে কলিকাতা পরগণার সনন্দ দিয়াছিলেন, তাহাতে চৌরঙ্গীর জঙ্গল কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে আর কতক অংশ পাইকান পরগণার মধ্যে বলিয়া লিখিত ছিল।

১৩. কুমারটুলীর বাবু অভয়চরণ মিত্রের মাতৃশ্রাদ্ধেও এইরূপ উৎপাত হইয়াছিল, তাহা কুমারটুলীর মিত্র বংশ বর্ণনা কালে লিখিত হইবে।

নামকরণ, সীমা ও গোবিন্দপুর[১]

নামকরণ

সহরের নাম 'কলিকাতা' বা 'ক্যালকাট্টা', কিরূপে হইল ইহা লইয়া অনেক মত ও প্রবাদ প্রচলিত আছে, যথা—(১) কিলকিলা নগরী, (২) কোলখাতা, (৩) কোলেকাতা, (৪) যক্ষপুরী, (৫) গলগাটা, (৬) কালকাটা, (৭) খালকাটা, (৮) কালীঘাটা, (৯) কালীকোটা, (১০) আলীনগর।

কোন কোন বিজ্ঞ প্রাচীন অধিবাসীর বিশ্বাস, দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে যে কিলকিলা নগরীর উল্লেখ আছে, তাহারই অপভ্রংশে কলিকাতা নাম প্রচলিত হইয়াছে।

বাবু গৌরদাস বসাক একটী বক্তৃতায় উল্লেখ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, পূর্ব্বে এখানে কোল জাতির অধিবাস ছিল, নিম্নশ্রেণীর লোকদিগের কুটীরশ্রেণীকে খাতা বলে, তাহা হইতে কোলখাতা নাম পরিবর্তিত হইয়া ক্রমে কলিকাতা হইয়াছে।

অন্য মতে প্রকাশ, এই স্থান পুরাকালে কৈবর্ত্ত জাতির বাসস্থান ছিল। তাহাদের অনেকেই নৌকা বাহিয়া বা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। গঙ্গার ধারে এবং যে খালটী গঙ্গা হইতে বাদা পর্য্যন্ত প্রবাহিত থাকিয়া কলিকাতাকে চৌরঙ্গী জঙ্গল হইত স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, সেই খালের ধারে বাস করিত। কৈবর্ত্তদিগের মধ্যে "কোলে" একটী সাধারণ উপাধি, সচরাচর লোকে "কোলে কৈবর্ত্ত" বলিয়া থাকে। সেই কোলেদিগের বসতি হেতু স্থানের নাম "কোলেকাতা" যাহা হইতে এক্ষণে কলিকাতা হইয়াছে।

কিলকিলার ন্যায় "যক্ষপুরী"ও একটী পুরাতন স্থানের নাম, সংস্কৃত গ্রন্থে পাওয়া যায়, অনেকে কলিকাতাকে সেইস্থান বলিয়া উল্লেখ করেন।

আমরা প্রথম প্রস্তাবে বলিয়াছি, ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের বিলাতের Gentlemen's Magazine পত্রিকায় কলিকাতার ঝড়ের উল্লেখে ইহাকে "Gal Gata" বলিয়াছিলেন। তদ্দৃষ্টে কোন কোন ইতিহাস লেখক প্রথমে ইংরাজেরাই এই স্থানকে উক্ত নাম প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করেন।

আর একটী সাধারণ প্রবাদ এই যে, একজন ঘাসুড়িয়া ঘাস কাটিয়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, জনৈক ইংরাজ জাহাজ হইতে নামিয়া আসিয়া আপনার ছড়িগাছটী

ঐ ঘাসের গাদার উপর ঠেসাইয়া এই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় ঘাসুড়িয়া মনে করিল, ঐ ঘাস কবে কাটা হইয়াছে তাহাই বুঝি জিজ্ঞাসা করিতেছে। সে উত্তর করিল, কালকাটা, অর্থাৎ কল্য কাটিয়াছি। ইহা শুনিয়া সাহেব স্থানের নাম "কালকাটা" স্থির করিয়া লইলেন। এই "কালকাটা" শব্দের ভিতরেও দুই মত আছে। অন্যমতে বলে, প্রথমে যখন ইংরাজেরা আপনাদিগের দাঁড়াইবার এবং দ্রব্যাদি জাহাজ হইতে নামাইবার নিমিত্ত কতকগুলি লোককে জঙ্গল কাটিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, একজন সাহেব একটী কর্ত্তিত বৃক্ষের নিকট দাঁড়াইয়া কাঠুরিয়াকে স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করায় সে ভাবিল, কবে ঐ গাছটা কাটা হইয়াছে তাহাই জানিতে চায়, তদুত্তরে বলিল, কালকাটা।

জনৈক প্রত্নতত্ত্ববিদ্ কলিকাতা রিবিউ পত্রিকার ১৮শ ভাগের ২৭৭ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, তিনি ১৭২৪ খৃঃ পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের কোন চিঠিপত্রে "ক্যালকাট্টা" নাম খুঁজিয়া পান নাই, সুতরাং মহারাট্টা খাল কাটার পর "খালকাটা" শব্দ হইতে ক্যালকাট্টা হইয়াছে, অনুমান করেন।

অনেকে বলেন, কালীঘাট হইতে কালীঘাটা, তাহার অপভ্রংশে কলিকাতা নাম প্রচলিত হইয়াছে।

অনেক বিজ্ঞলোকের বিশ্বাস, বর্ত্তমান কালীঘাট আধুনিক, পূর্ব্বে নিজ কলিকাতাতেই কালীর মন্দির ছিল, তাহাকে লোকে কালীকোটা বলিত, সেই কালীকোটা শব্দ হইতে ক্রমে অপভ্রংশে "কলিকাতা" হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদিগকে জয় করিয়া ইহার নাম আলিনগর রাখিয়াছিলেন।

এখন একে একে এই কয়টী প্রবাদ বিচার করিয়া দেখা আবশ্যক। কিলকিলা পুরী যে কলিকাতা, তাহা কেবল কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশ হইতে অনুমান মাত্র। আগামীবারে আমরা ইহার আলোচনা করিব। কোল জাতি এই বন ও জলাভূমিতে এমন কি উপার্জ্জনের পন্থা পাইবে যে, বংশ পরম্পরায় এখানে বাস করিয়া আপনাদিগের নামানুসারে স্থানের নামকরণ করিবে? তাহাদের সমস্ত জাতি কি একেবারে অদৃশ্য হইল? বরং কোলেকাতা কতকটা সম্ভবপর হইলেও হইতে পারে। কারণ দক্ষিণ বঙ্গে গঙ্গার পশ্চিম তীরে কৈবর্ত্ত জাতিরা বহুকাল হইতে বসবাস করিতেছে, তাহাদের কোন বংশ সুবিধা বুঝিয়া এখানে আগমন করা অসম্ভব নহে। কোন ইতিহাস লেখক বলিয়াছেন, এখানকার একটী উচ্চ ভূমিতে ধীবরেরা জাল

শুকাইতে দিয়াছে এবং তাহার নিকট তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটীরগুলি তিনি জাহাজ হইতে দেখিয়াছিলেন। বোধ হয় তিনি পুরাতন পোস্তার উচ্চস্থানের উপরই জাল শুকাইতে দেখিয়া থাকিবেন। উপরে যে খালের কথা লিখিত হইয়াছে, সুবিখ্যাত ইতিহাসবেত্তা অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের মানচিত্রে তাহা সুন্দররূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐ খাল কলিকাতা ও গোবিন্দপুরের সীমা। বর্ত্তমান পুলিস ঘাটকে পূর্ব্বে কুচাগুড়ি ঘাট বলিত, ঐ ঘাট হইতে হেষ্টিংস ষ্ট্রীট দিয়া ঠিক গবর্ণমেণ্ট প্রাসাদের উত্তর ফটকের স্থান পর্য্যন্ত খালটী সমরেখায় আসিয়া ঐ স্থান হইতে ধনুকাকৃতিভাবে ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীটের উপর দিয়া, ওয়েলিংটন স্কোয়ার পার হইয়া ক্রীক রোর উপর দিয়া, সিয়ালদহের দক্ষিণ বাহিয়া বাদায় মিশিয়াছিল। এখন যে স্থানকে জেলেটোলা বলে তাহা ইহার তীরে এবং এই স্থানের মৎস্যজীবীরা অতি প্রাচীন অধিবাসী। কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহ কোলে উপাধিধারী ছিল কি না এবং তাহার নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে, ইহাও কেবল অনুমান মাত্র। যক্ষপুরী কখনই কলিকাতার নাম ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, ১৫৪০ খ্রীঃ ডিঃ বারোস বাঙ্গালার যে মানচিত্র প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহাতে নিম্ন বঙ্গে এই কয়টী স্থানের উল্লেখ আছে, সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং বাঁটরা। বরাহনগরটী গঙ্গার পশ্চিম দিকে লিখিত হইয়াছে। আগড়পাড়ার নিম্নে যক্ষ তাহা Xos বলিয়া লিখিত, ইহাকে যদি যক্ষ বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে উহা আগড়পাড়ার এতদূর নিম্নে যে তাহাকে কলিকাতার স্থান বলিয়া মনে হয়। তাঁহারা চক্ষে দেখিয়া যতদূর পারিয়াছেন চিত্রিত করিয়াছেন মাত্র,এমনকি অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপ দেখিলেও যখন হাস্য সম্বরণ করা যায় না, তখন ডিঃ বারোসের দোষ কি? ১৭৯৪ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণমেণ্ট কাউন্সিলে কলিকাতার যে সীমা নির্ণয় হয়, তাহাতে দেখা যায়, বাগবাজারের সম্মুখে গঙ্গার পশ্চিমে এখনকার ঘুসড়ির নাম সে সময় পর্য্যন্ত যক্ষপুর ছিল। ডিঃ বারোস ভ্রমক্রমে বরাহনগরটী গঙ্গার পশ্চিমে এবং যক্ষপুরটী পূর্ব্বে লিখিয়াছেন। ১৭৩৯ সালের Gentlemen's Magazine মধ্যে Gal Gata দেখিয়া যাঁহারা এই স্থানের ঐ নাম ইংরাজেরা প্রদান করিয়াছিলেন, এবং উহা হইতে ক্রমে ক্যালকাট্টা হইয়াছে অনুমান করেন, তাঁহাদের ইহা সম্পূর্ণ ভ্রম। তাঁহাদের যুক্তি এই যে, কলিকাতায় প্রতি বৎসর অত্যন্ত অধিক লোক পীড়ায় প্রাণত্যাগ করিত, সেই জন্যই ইহাকে ইংরাজেরা শ্মশান মনে করিতেন। যীশু খ্রীষ্টকে যে শ্মশানে হত্যা করা হইয়াছিল তাহার

নাম "গলগোথা", তদনুসারে এই স্থানেরও নামকরণ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রস্তাবের ৩২০ পৃষ্ঠায় টিপ্পনিতে উল্লেখ করিয়াছি যে, বৈদেশিক নূতন স্থানের নাম না জানায় এবং পত্র লেখকের সাবধান হইয়া স্থানের নাম না লেখায় পত্রিকা-প্রকাশকেরা ভ্রমক্রমে C দুইটীকে G করিয়াছেন মাত্র। কর্ণেল ইউল বলেন, পূর্ব্বের সমস্ত চিঠিপত্রাদিতে সুতানুটী ও গোবিন্দপুরেরই নাম প্রদত্ত হইয়াছে, Documentary Memoirs of Job Charnock পুস্তকে ১৬৮৬ খ্রী: ৩১ ডিসেম্বরের পত্রে "কলিকাতার" উল্লেখ দেখা যায়।

ঘাস বা গাছ "কাল কাটিয়াছি" এই কাল কাটা হইতে ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি সম্পূর্ণ গল্প কথা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সুতরাং উহার আলোচনা অনাবশ্যক। উপরোক্ত কলিকাতা রিভিউর লেখক ১৭২৪ সালের পূর্ব্বে কোথাও ক্যালকাট্টা নামের উল্লেখ না দেখিয়া মহারাষ্ট্রা খালকাটা হইতে ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি বিবেচনা করা তাঁহার ভ্রান্তি মাত্র, কারণ কর্ণেল ইউল ১৬৮৬ সালের পত্রে ক্যালকাট্টার নাম নিজে দর্শন করিয়াছেন। অবশ্য জব চার্ণক প্রথমে সুতানুটীতে অবতীর্ণ হইয়া উক্ত গ্রামের মধ্যেই কুঠী প্রস্তুত করায় অধিকাংশ পত্রাদিতে সুতানুটীর ঠিকানা দেওয়া হইত, গোবিন্দপুরেও একটী বৰ্দ্ধিষ্ণু বাজার থাকায় তথায় বাণ্য ক্রয় বিক্রয় হইত, তদুপলক্ষে গোবিন্দপুরের নামও প্রচলিত হইয়াছিল। কলিকাতা গ্রামে তখন তেমন হাটবাজার না থাকায় উহার কোন উল্লেখের আবশ্যক হয় নাই। ১৬৮৬ সালের উক্ত পত্রে কলিকাতা গ্রামের সম্বন্ধে কোন প্রয়োজনীয় কারণে উহার উল্লেখ হইয়া থাকিবে। যেরূপেই হউক যখন নাম ছিল প্রকাশ হইতেছে, তখন আর ১৭২৪ সালের পর খালকাটার স্মরণার্থ ক্যালকাট্টা নামের উৎপত্তি কখন সম্ভবে না। বরং উক্ত লেখক রীতিমত অনুসন্ধান করেন নাই বলিয়া বুঝা যাইতেছে। আর একটী কথা এই যে, তিনি ১৭২৪ সালের পূর্ব্বে ক্যালকাট্টা নাম দেখেন নাই ইহাতে বুঝা যায় ঐ সালে দেখিয়াছেন। কিন্তু মহারাষ্ট্র খাল ১৭৪০ খ্রীঃ কাটা হইয়াছিল।

কালীঘাট হইতে কালীঘাটা, তাহা হইতে কলিঘাটা পরে কলিকাতা হওয়া অপেক্ষা কালীকোটা হইতে পরে পরে কলিকোটা, কলকোটা, কলকত্তা এবং ক্যালকাট্টা বা কলিকাতা হওয়াই অধিক সম্ভাবনা। যে রূপেই পরিবর্ত্তিত হউক, কালীর নামানুসারে স্থানের নাম হইয়াছে তাহার কোন সন্দেহ নাই। আজি ও জ্, স্তন ত্যাগ করিলে অনেক লোক "কালী কলকত্তাওয়ালী" বলিয়া থাকেন। ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে টমাস কিচেন তাঁহার ম্যাপে কলিকাতার নাম

কালীকোটা লিখিয়াছেন, আরও কোন কোন ভ্রমণকারী কালীকোটা বলিয়াছেন।

আইন আকবরী গ্রন্থে দেখা যায় ১৬৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল সমস্ত মোগল সাম্রাজ্য নূতন ভাবে রাজস্ব বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালাকে যে কয় সরকারে বিভক্ত করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে সাতগাঁ অর্থাৎ সপ্তগ্রাম একটী প্রধান সরকার, ইহার অধীনে ৫৩টী মহাল ছিল। ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন ১৭৮৩ খৃঃ উহা অনুবাদ করিয়া গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারেন হেষ্টিংসকে উৎসর্গ করেন। তাঁহার গ্রন্থের ২য় ভাগের ২০৮ ও ২০৯ পৃষ্ঠায় এই মহালগুলির তালিকা ও কোন্ মহালে কত খাজনা নির্দ্দিষ্ট ছিল, তৎসমস্তই লিখিত আছে। বড় বড় মহাল গুলির নিরস্ব খাজনা তহসিল ছিল। ছোট ছোট মহালগুলি দুইটী এবং কোন কোন গুলি তিনটীও একসঙ্গে খাজনা ও তহসিল বন্দোবস্ত হয়। সমস্ত সাতগাঁ সরকারের খাজনা ৪ লক্ষ ১৮ হাজার ১১৮ টাকা, তদ্ভিন্ন যুদ্ধকালে আবশ্যক হইলে এই সরকার হইতে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৬ হাজার পদাতিক সৈন্য দিবার নিয়ম হয়। সাতগাঁ সরকারের মধ্যে মাকুমা, কলকত্তা ও বার্ব্বাকপুর এই তিনটী মহাল এক তহসিলে বন্দোবস্ত, ইহার খাজনা, ৯ লক্ষ ৩৬ হাজার ২১৫ দাম। টাকায় ৪০ দাম, তদনুসারে ২৩ হাজার ৪০৫ টাকা ছয় আনা হয়। বার্ব্বাকপুরটী আবার হাজিপুর মহালের সহিত এক তহসিল বন্দোবস্ত দেখা যায়। ইহাতে বোধ হয় উক্ত বার্ব্বাকপুরটী একটী সুবিস্তীর্ণ মহাল থাকায়, তাহার কতক অংশ হাজিপুর মহালের সহিত, আর কতক মাকুমা ও কলকত্তা নামক ক্ষুদ্র দুইটী মহালের সহিত আবদ্ধ করা হইয়াছে। গ্লাডুইনের মাকুমাকে অন্যান্য অনুবাদকেরা বাঁকুয়া লিখিয়াছেন। আবার হলওয়েল সাহেব বাগুয়া লিখিয়াছিলেন। এখন আমরাও বাগুয়া বলিতেছি।

মুড়াগাছাও একটী স্বতন্ত্র মহাল বলিয়া লিখিত আছে, পাইকান পরগণার কোন উল্লেখ তাহাতে নাই, কিন্তু ইংরাজদিগের আগমন কালে ইহা কলিকাতার নিজ দক্ষিণে ছিল, তাহা কালীঘাট প্রস্তাবে উল্লিখিত হইয়াছে। মুড়াগাছা পাইকানের পূর্ব্ব দিকে। হাজিপুর বর্ত্তমান ডায়মণ্ড হারবার। ডায়মণ্ডহারবার অতি নূতন নাম, ১৭৮০ সালের রেনেলের ম্যাপে ঐ স্থানে কেবল ডায়মণ্ড পয়েণ্ট বলিয়া লিখিত আছে। এখনও অধিবাসীরা উহাকে হাজিপুর বলিয়া থাকে। বার্ব্বাকপুর হাজিপুর ও কলকত্তার সহিত সংযুক্ত থাকায় উহা বজবজ হইতে গোবিন্দপুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত বলা যাইতে পারে। মাকুমা বা বাঁকুয়া অথবা বাগুয়া

নিশ্চয় কলিকাতার উত্তর। কলিকাতার প্রথম ম্যাজিষ্ট্রেট, যাহাকে সে সময় জমীদার বলিত সেই হলওয়েল সাহেব তাঁহার ১৭৫২ সালের রিপোর্টে লিখিয়াছেন,—কলিকাতা চারিভাগে বিভক্ত ১ম ডিহি জাননগর[২] ও কলিকাতা, ২য় গোবিন্দপুর, ৩য় সুতানুটী, ৪র্থ বাগুয়া কলিকাতা। এখন আমরা বুঝিতেছি, কলিকাতা আধুনিক নাম নহে, পূর্ব্বে ইহাকে কালীকোটা বলিত। আজিও যেমন বেহার হইতে পঞ্জাব পর্য্যন্ত সমস্ত লোক "কলকত্তা" বলে, উত্তর পশ্চিম-বাসী রাজা টোডরমলও তেমনি কালীকোটাকে কলকত্তা বলিয়াছিলেন। ইহাতে অনুমান করা যায় "কলকত্তা" নাম রাজা টোডরমলেরই প্রদত্ত। তৎপরে এখানকার অধিবাসীরা কলিকাতা নামকরণ করিয়াছেন। সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া ইহার নাম আলীনগর রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পরে ইংরাজেরা তাহা অগ্রাহ্য করিয়া পুরাতন নামই বাহাল করেন, কেবল আলীপুর বলিয়া একটী গ্রামের নাম হয়।

সীমা

কলিকাতার দক্ষিণ সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে, প্রথমত কুচাগুড়ি বা পুলিস ঘাট হইতে যে খালের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা ত স্বাভাবিক সীমা ছিলই, তৎপরে দেখা যায়, ১৭০০ খ্রী: কোম্পানি নবাব আজিম উসানের নিকট যে ইজারা পান, তদনুসারে পুরাতন দুর্গের কিয়দ্দূর দক্ষিণে একটী সূচ্যগ্র স্তম্ভ ছিল বলিয়া ইতিহাসে দেখা যায়। ইহাতেও পূর্ব্বোক্ত সীমাই স্থির হইতেছে। পূর্ব্বসীমা ডিহি সিয়ালদহ, ডিহি সুরা, ডিহি বাহির সিমলা (গড়পাড়), ডিহি মাণিকতলা। উত্তর সীমা ডিহি সুতালুটী। সুতালুটীর দক্ষিণ সীমা নবাব মীর বহরের ঘাট হইতে আরম্ভ করিয়া জোড়াবাগান, মেছুয়াবাজার, জোড়াসাঁকোর দক্ষিণ দিয়া ঝামাপুকুরের উত্তর হইয়া মাণিকতলা পর্য্যন্ত। পূর্ব্বসীমা ডিহি মাণিকতলা ও ডিহি উল্টাডিঙ্গী। উত্তর সীমা বর্ত্তমান শোভাবাজার ষ্ট্রীট যাহা পূর্ব্ব কেটো ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ছিল, তথা হইতে শ্যামবাজার ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত। এই শ্যামবাজার ষ্ট্রীট অতি পুরাতন রাস্তা, ১৭৫৬ সালের ম্যাপেও ইহাকে দেখিতে পাওয়া যায়।[৩] সুতালুটীর উত্তরে বাগুয়া। এই বাগুয়া বাজার হইতে বর্ত্তমান বাগবাজার হইয়াছে।

১৭৮০ সালে কোম্পানি নবাবের নিকট হইতে যে তিনখানি গ্রাম ইজারা লন, তাহা সুতালুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর নহে, বাগুয়া, সুতালুটী ও কলিকাতা। তাহার সীমানা এইরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল যথা;—উত্তর সীমা বরাহনগর[৪] দক্ষিণ সীমা গোবিন্দপুরের উত্তর উপরোক্ত নালা, পশ্চিম সীমা গঙ্গা এবং পূর্ব্ব সীমা বাদা[৫] দীর্ঘে নদীর ধারে ছয় মাইল। যেরূপ দক্ষিণ সীমাস্তম্ভের কথা উপরে লিখিত হইয়াছে, উত্তরেও ঐরূপ একটী সীমাস্তম্ভ ছিল, তাহা আমাদের স্মরণ আছে। বাগবাজারের উত্তরে চিৎপুর রোড যেখানে পূর্বদিকে বাঁকিয়া গিয়াছে, সেই কোণের কয়েক হস্ত পশ্চিমে গঙ্গাতীরে প্রায় চারি ফিট চতুষ্কোণ দশ ফিট ফিট উচ্চ ইষ্টক নিৰ্ম্মিত সুচ্যগ্র একটী স্তম্ভ ছিল পোর্ট কমিশনরেরা কয়েক বৎসর হইল উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। ১৭৯৪ খ্রীঃ ১১ই সেপ্টেম্বর গবর্ণর জেনেরলের কাউন্সিলে কলিকাতার একপ্রকার সীমা নির্দ্দেশ হয় যথা;— উত্তর সীমায় যক্ষপুর (ঘুসড়ি) হইতে বর্ত্তমান টালার পুলের নিম্ন পর্য্যন্ত, পূর্ব্ব সীমা মহারাষ্ট্র খালের পশ্চিম পাড়, দক্ষিণ সীমা পার্ক ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব প্রান্তে যে পুরাতন সমাধিক্ষেত্র আছে, তথা হইতে আদি গঙ্গার মুখ দিয়া গঙ্গার পশ্চিম তীর পর্য্যন্ত, গঙ্গার পশ্চিম তীরে ভাটার সময় যে পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই পর্য্যন্ত সীমা।

গোবিন্দপুর

রেশম ও তুলার জন্য বঙ্গদেশ চিরদিন পৃথিবীতে আদরিত। অতি পুরাকালে রোমক প্রভৃতি স্থানের সম্রাটদিগের বিলাস পদার্থের জন্য সহস্র বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া বণিকেরা সপ্তগ্রামে আগমন করিতেন। সপ্তগ্রাম বাঙ্গালার রাজধানী না হইলেও বাণিজ্যস্থান বিধায় ধনরত্নে পরিপূর্ণ ছিল। অসংখ্য অর্ণবপোত ইহার নিকট আসিয়া সরস্বতী সলিলে দণ্ডায়মান থাকিত। তাহারা কেবল বস্ত্র প্রার্থনা করিত না, ভারত-জাত অন্যান্য নানাবিধ বস্তুতে আপনার উদর পূর্ণ করিয়া লইয়া যাইত। সুতরাং কি গোলকুণ্ডের হীরক কি তিব্বতের স্বর্ণ ও মৃগনাভি, কি লঙ্কা দ্বীপের মুক্তা, কি কাশ্মীরের সুদৃশ্য সাল, কি ঢাকার সূক্ষ্ম মসলিন, ভারতের যেখানে যে কোন শিল্প দ্রব্য, আহরীয় দ্রব্য প্রভৃতির সমস্তের বৃহৎ বৃহৎ ভাণ্ডার লইয়া সকল স্থানের বণিকেরা এখানে বাস

করিতেন। তন্তুবায় জাতির শেঠ ও বসাকেরা এখানকার বস্ত্র ব্যবসায়ী ছিলেন। বাঙ্গালায় যে প্রদেশে সূক্ষ্ম বা সুচিত্রিত ছিট প্রভৃতি বস্ত্রের নির্ম্মাতা তন্তুবায়েরা বাস করিত, সেই সেই স্থানে শেঠ ও বসাকদিগের কুঠী থাকিত। তথাকার অধ্যক্ষ সেখানে পর্য্যাপ্ত বস্ত্র একত্র করিয়া সপ্তগ্রামের প্রধান বাণিজ্যালয়ে পাঠাইত। এইরূপে চারিদিক হইতে রাশি রাশি মূল্যবান বস্ত্র আসিয়া তাঁহাদের ভাণ্ডার পূর্ণ করিত। বিদেশীয় বণিকদিগকে তাহা বিক্রয় করিয়া ইঁহারা নানা দেশীয় ধনে আপনাদিগকে যথেষ্ট ধনবান করিয়াছিলেন। কেবল যে তাঁহারা ধনবান হইয়াছিলেন তাহা নহে, দেশ বিদেশে বিশেষ সম্মানও লাভ করিতেন, শেঠ শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

যে সময় পদ্মানদী প্রবাহিত ছিল না, গঙ্গা অষ্টসখী লইয়া রাজমহল পর্ব্বত সীমার পূর্ব্বতল দিয়া দক্ষিণমুখী হন, কিয়দ্দূরে আসিয়া সরস্বতী ও যমুনা তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন। তখন গঙ্গা দুঃখে ক্ষীণ কলেবরা হইয়া কালী-কোটাকে অর্দ্ধবেষ্টন করিয়া, পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে সঙ্গিনী অন্বেষণে গমন করেন এবং মগরার নিকট আসিয়া অন্য দুএকটী সখী পাইয়া পশ্চিম দক্ষিণে অগ্রসর হন কিয়দ্দূরে শাঁখরাইলের নিকট আসিয়া দেখেন, আনন্দে বিস্ফারিতা সরস্বতী দামুদরের সহিত বিবাহিতা হইয়া আসিয়াছেন। তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতে যাইতে রূপনারায়ণ আসিয়া প্রণাম করিল কিছু পরে কালী নদী আসিয়া মিলিল। কালী নদী আসিয়া যেন গঙ্গাকে বেষ্টন করিয়া বরণ করিতে লাগিলেন, সেইজন্য একটী সুবিস্তীর্ণ ঘূর্ণীজল এখনও দেখা যায়, শ্রীমন্ত সওদাগর উহাকে কালীয়াদহ বলিয়াছেন, তিনি সেই দহে কমলেকামিনীকে গজ গিলিতে দেখিয়াছিলেন।[৬] গঙ্গা উহাকেও সঙ্গে লইয়া সগরবংশ উদ্ধারে প্রস্থান করিলেন। আদি গঙ্গাকে বামে রাখিয়া খিদিরপুর মেটেব্রুজ প্রভৃতির নিম্ন দিয়া যে পথে এখন গঙ্গা চলিতেছেন, পঞ্চদশ শতাব্দীতে উহা একটী সামান্য খাল মাত্র ছিল। ঐ খাল দিয়া হিজলী হইতে ছোট ছোট ডোঙ্গায় লবণের আমদানী হইত। খালটী দস্যু তস্কর ভয়ে লোকের অগম্য ছিল। চৈতন্যদেব ঐ খাল দিয়া পুরুষোত্তমের দিকে গমন করিয়াছিলেন। সাধারণ লোকে ইহাকে এখন কাটী অর্থাৎ কাটা গঙ্গা বলে। ১৬শ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর প্রারম্ভে ত্রিবেণীর নিকট চড়া পড়িয়া সরস্বতীর স্রোতপথ উচ্চ হইয়া পড়ায় ভাগীরথী দিয়া অধিকাংশ জল চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। তদবধি উপরোক্ত হিজলীর খাল প্রবল হওয়ায় গঙ্গার সমস্ত জল ঐ পথে বহিয়া যায়, উহাতেই আদিগঙ্গা মজিয়া গেল।

সরস্বতীরও ক্রমে ক্রমে মধ্যে মধ্যে এমন চড়া পড়িতে লাগিল যে, বড় বড় অর্ণবপোত যাতায়াত করা বিপদজনক হইয়া উঠিল। বুদ্ধিমান শেঠ ও বসাকেরা নদীর অবস্থা দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, এ স্থানে আর অধিক দিন ব্যবসায় চলিবে না। নানা কারণে তাঁহারা সপ্তগ্রাম ত্যাগ করা যুক্তিসিদ্ধ মনে করিলেন। বিদেশী পোতসকল যেখানে গভীর জল পাইবে, সেই পথেই যাইবে। হিজলীর খাল দিয়া যখন ভাগীরথীর স্রোত প্রবল হইল, তখন ঐ পথ দিয়াই জাহাজ আসিবে, এই ভাবিয়া উহার শীর্ষদেশে আপনাদের নূতন বাসস্থান মনোনীত করিলেন। নূতন স্রোতের ধারে বাসস্থান না করার প্রধান কারণ এই যে, যদিও গঙ্গার জল উহা দিয়া যাইতেছে তত্রাচ উহা গঙ্গা নহে, উহার পতিতপাবনী শক্তি নাই। হিন্দু গঙ্গাতীরে বাস, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাজলে সর্ব্বপ্রকার পারমার্থিক কার্য্য সম্পাদন করিয়া গঙ্গাতীরে মানবলীলা সম্বরণ করাই মুক্তির একমাত্র উপায় বলিয়া বিশ্বাস করেন। এই গঙ্গাবাসের জন্য, এখানে বাসস্থান স্থির করেন। আরও কারণ আছে, একেত সাতগাঁয় আর সুবিধা নাই, তারপর নূতন রাজা মুসলমানদিগকে তাঁহারা অত্যন্ত ভয় করিতেন; বহুদিন পর্য্যন্ত হিন্দুদিগের বিশ্বাস ছিল, মুসলমান গৃহে পদার্পণ করিলে গৃহদেবতার দেবত্ব থাকে না, গৃহস্থেরাও হিন্দুত্ব বর্জ্জিত হন। ইহার একটী দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া গেল :—হুগলী জেলার অন্তর্গত দেবানন্দপুরের নাম অনেকে শুনিয়া থাকিবেন। পূর্ব্বে ঐ গ্রামের অন্য নাম ছিল, অনুমান ১৬৩০ খ্রীঃ বাদসাহ পুত্র সাজিহান উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার সময় সপ্তগ্রাম দেখিবার মানসে সরস্বতী নদীতে নৌকাযোগে ভ্রমণ করিতেছিলেন। উপরোক্ত গ্রাম্যঘাটে তিনি নৌকা লাগাইলে গ্রামবাসীরা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া বাদসাহ দেখিবার জন্য বিষম জনতা করিল। দেবানন্দ দত্ত নামে জনৈক কায়স্থ যুবা আরব্য ও পারস্য ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তিনি স্নান করিবার জন্য নদীতীরে গিয়া নৌকার অতি নিকটে দণ্ডায়মান হন। নৌকায় সে সময় একখানি পারস্য কাব্য পাঠ হইতেছিল। পাঠক একস্থানে অশুদ্ধ উচ্চারণ করায় চপল যুবা হাস্য সম্বরণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার হাসিতে সাজিহানের দৃষ্টি পড়ায় তিনি উঁহাকে ধরিতে আদেশ করেন। দেবানন্দ ধৃত হইবামাত্র অপর দর্শকেরা উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিল, অনেকে দেবানন্দের গৃহে গিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা মাতাকে এই সংবাদ নানা শাখা-প্রশাখায় সজ্জিত করিয়া প্রদান করিতে লাগিল। সাজিহান নৌকায় দেবানন্দকে আনাইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিলেন এবং তাঁহার হাস্যের কারণ জিজ্ঞাসা করায়

যুবক নির্ভীক চিত্তে কারণ প্রদর্শন করিলে, উক্ত গ্রন্থ পাঠ করিতে আদিষ্ট হন। তাঁহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ, সুন্দর অর্থবোধ এবং ব্যাকরণে সমধিক অধিকারাদি দেখিয়া সাজিহান অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া দেবানন্দ দত্তকে আপনার জনৈক মুন্সী পদে নিযুক্ত করিলেন। পরে তিনি বাদসাহ হইলে দেবানন্দকে যথোচিত পদমর্য্যাদায় উন্নত করিয়াছিলেন। এদিকে বাদসাহ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবানন্দের মস্তকচ্ছেদন করিয়াছেন বলিয়াই গ্রামস্থ সকলের বিশ্বাস হইল। এখন যেমন অনেক যুবা উচ্চ রাজকার্য্য প্রাপ্ত হইলে ইংরাজ সাজিতে ভাল বাসেন, তখনও অনেক যুবা তদ্রূপ মুসলমান সাজিতেন। দেবানন্দ দীর্ঘশ্মশ্রু ধারণ করিতেন ও মোগলাই পোষাক পরিতেন। কয়েক বৎসর পরে তিনি বাদসাহের নিকট অবকাশ লইয়া স্বদেশে আগমন করেন। বাদসাহের উচ্চ কর্ম্মচারীর উপযুক্ত রেসেলা প্রভৃতি আড়ম্বরের সমস্তই তাঁহার সঙ্গে আসিয়া নিজ গ্রামের ঘাটে লাগিল। যখন লোকজন সহ দেবানন্দ মুন্সী গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তাঁহার মুসলমান পরিচ্ছদ দৃষ্টে কেহই চিনিতে পারে নাই, সকলেই গ্রামে মুসলমান আসিয়াছে দেখিয়া সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। দেবানন্দ মুন্সী ক্রমে আপনার গৃহের পথে অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া তাঁহার বৃদ্ধ পিতা প্রমাদ গনিলেন, "সত্য সত্য মুসলমান যদি আমার গৃহে আসে, তাহা হইলে দেবতাও নষ্ট হইবেন, আমারও জাতি যাইবে, সুতরাং অগ্র হইতে দেবতাকে গলায় বাঁধিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া নদীতীরে প্রস্থান করি," এই বলিয়া সস্ত্রীক দেবতা লইয়া সরস্বতী-তীরে গিয়ে দণ্ডায়মান হইলেন। যেমন শুনিলেন, মুসলমানেরা তাঁহারই গৃহে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি স্ত্রীর হাত ধরিয়া নদী ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। দেবানন্দ গৃহে প্রবেশ করিয়া পিতা মাতাকে ডাকিতে লাগিলেন, গৃহে সকলই আছে কেবল মনুষ্য নাই দেখিয়া সহজেই কারণ বুঝিলেন। তখন আপনার উষ্ণীষ ইত্যাদি নামাইয়া গ্রামস্থ লোকদিগের নাম ও সম্বন্ধ ধরিয়া যখন ডাকিতে লাগিলেন তখন সকলে তাঁহাকে চিনিল, এবং নিকটে আসিয়া তাঁহার বিজাতীয় পরিচ্ছেদের জন্য কি প্রমাদ হইল, তাহা বর্ণনা করিয়া পরিতাপ করিতে লাগিল। উহা হইতেই উক্ত দত্ত পরিবার মুন্সী উপাধি লাভ করিয়াছেন। গ্রামটীও দেবানন্দপুর বলিয়া পরিচিত হইয়াছে। স্বর্গীয় চণ্ডীচরণ মুন্সীর নিকট আমরা এই বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলাম। এই প্রকার জাতি ধর্ম্ম ভয়েও শেঠ বসাকেরা রাজধানীর বহুদূরে জঙ্গলপার্শ্বে বাস করা মঙ্গল ভাবিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, রাজ-কর্ম্মচারীরা, এমন কি নবাব পর্য্যন্ত, ধনবান ব্যবসায়ীদিগের প্রতি সর্ব্বদাই

লোলুপ দৃষ্টিপাত করিতেন। টাকার আবশ্যক হইলেই দিতে হইবে। আর একটী কারণ দেখিতে পাওয়া যায়, এই প্রদেশে তৎকালে বিস্তর তন্তুবায়ের বাস ছিল। সিমলা হইতে বরাহনগর পর্য্যন্ত অনেক তাঁতী বাস করিত, তাহারা চমৎকার ছিট বুনিত। কালীকোটা ইতর লোকদিগের বাসস্থান ছিল বটে, কিন্তু বাগুয়ায় অনেক ভদ্রলোক ও তন্তুবায় বাস করিত। সুতানুটী বাগুয়ার মধ্যেই একটী হাট মাত্র, তথায় তন্তুবায়েরা সুতার তাল ও বস্ত্র বিক্রয় করিত। তদ্ভিন্ন এক্ষণে যাহাকে হাবড়ার হাট বলে তাহা অতি প্রাচীন হাট, পূর্ব্বে ব্যাঁটরার হাট বলিয়া পরিচিত ছিল। ঐ হাটে আজিও বস্ত্র ভিন্ন আর কিছু ক্রয় বিক্রয় হয় না। ব্যাঁটরা অতি প্রাচীন কাল হইতে পরিচিত। উপরে আমরা ডি বারোসের মানচিত্রে ব্যাঁটরার উল্লেখ করিয়াছি, বাবু চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় Account of Howrah নামক পুস্তকে ১০ম পৃষ্ঠায় ব্যাঁটরায় নরসিংদেব চক্রবর্ত্তীর প্রতিষ্ঠিত একটি দেবালয়ের ভগ্নস্তূপের উল্লেখ করিয়াছেন, উহা যে কত শত বৎসরের প্রাচীন, তাহা তিনি স্থির করিতে পারেন নাই।

উপরোক্ত কয়েকটী কারণে সপ্তগ্রামের ধনবান শেঠ ও বসাকেরা পূর্ব্ব-বাস পরিত্যাগ করিয়া নূতন ও পুরাতন গঙ্গার সঙ্গমস্থলে নব-বাস নির্ম্মাণ করেন। বাবু গৌরদাস বসাকের মতে ১৫২০ হইতে ৩০ সালের মধ্যে গোবিন্দপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, পরে তিনি লিখিয়াছেন, "১৫৩০ খ্রীঃ সর্ব্বপ্রথম পর্টুগীজ জাহাজ গঙ্গায় আসিয়াছিল, তাঁহারা গোবিন্দপুরের শেঠ ও বসাকদিগের নিকট বস্ত্রাদি ক্রয় করিয়াছিলেন।" কিন্তু কেরি সাহেবের ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইতিবৃত্তে ৩য় ভাগের ১৩ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, জন সিলভিরা নামক পর্টুগীজ ১৫১৮ খ্রীঃ এখানে আসিয়াছিলেন। তাহার পর অর্ম্মির মতে ১৫৩৪ সালে, অপর মতে ৩৭ সালে পর্টুগীজ সৈন্য গৌড়ের নবাবের আহ্বানে গঙ্গায় প্রবেশ করিয়া হুগলিতে স্থান লাভ করে। পর্টুগীজ সংস্রব হিসাবে ১৫১৫ সালের পর গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়া থাকিবে।

কেবল যে শেঠ বসাকেরাই এখানে বাস করিয়াছিলেন, তাহা নহে। নিকটস্থ অপরাপর কায়স্থাদি ভদ্র ও ধনবান লোকেরাও আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করেন। আমরা শ্রদ্ধেয় কেদারনাথ দত্ত ভক্তি-তীর্থ মহাশয়ের "দত্তবংশ" তালিকায় দেখিতে পাই, গোবিন্দশরণ দত্তও আন্দুল ছাড়িয়া ঐ নব নগরে বাস করিয়াছিলেন। গোবিন্দশরণের পিতামহ কৃষ্ণানন্দ দত্ত চৈতন্যদেবের সমকালীন, ইনি সপ্তগ্রামের একজন ধনবান কায়স্থ, আন্দুলের চতুর্ধরী ছিলেন। নিত্যানন্দ

ইঁহার সপ্তগ্রামের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দশরণ দত্ত মধ্যম, রামশরণ দত্ত জ্যেষ্ঠ, হরিশরণ দত্ত কনিষ্ঠ, ইঁহাদের পিতার নাম কন্দর্পরাম দত্ত,তিনি আন্দুলে বাস করিতেন। গোবিন্দশরণ, বঙ্গীয় দত্তবংশের আদি পুরুষ পুরুষোত্তম দত্ত হইতে ১৭ সপ্তদশ পুরুষ। তিন ভাই বিষয় বিভব লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া স্বতন্ত্র হইলেন। রামশরণ আন্দুলেই রহিলেন, গোবিন্দশরণ রাজা টোডরমলের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন, হরিশরণ মুড়াগাছায় গিয়া বাস করিলেন। রাজা টোডরমল গোবিন্দশরণের কার্য্যে বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য মানসিংহকে আদেশ করেন। মানসিংহ বার্ব্বাকপুরের মধ্যে তাঁহাকে কিছু ভূমি দান করায় তিনি পুরাতন ও নব গঙ্গার সঙ্গমস্থলে বাস করিয়া নিজ নামানুসারে ইহাকে গোবিন্দপুর নাম প্রদান করেন।[৭]

তাহা হইলে গোবিন্দশরণের আগমন ১৬শ শতাব্দীর শেষে বা ১৭শ শতাব্দীর প্রারম্ভে অবশ্য বলিতে হইবে। গৌরদাস বাবু যে সমস্ত ঐতিহাসিক প্রমাণ দিয়াছেন, তাহা ছাড়িয়া আমরা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত যে, ১৬শ শতাব্দীর শেষে গোবিন্দপুর স্থাপিত হইয়াছে।

কেবলমাত্র কেদার বাবুর "দত্তবংশ" আমাদের অবলম্বন নহে। তৎসাময়িক একখানি গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। কবিরাম প্রণীত "দিগ্বিজয় প্রকাশ" মহারাজ প্রতাপাদিত্যের জীবিতকালে লিখিত।[৮] সম্ভবত যে সময় রাজা শালিখার নব-নির্ম্মিত দুর্গে বাস করিতেছিলেন। কবি বলিতেছেন, "গোবিন্দ দত্ত নামক এক রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থ হইতে ফিরিবার সময় কালী তাঁহাকে স্বপ্নে আহ্বান করিয়া "বাদর রসা" নামক আপনার নিকটস্থ স্থানে বাস করিতে আদেশ করেন। গোবিন্দ দত্ত তথায় মৃত্তিকা মধ্যে বিপুল অর্থ প্রাপ্ত হইয়া গৃহাদি নির্ম্মাণ করেন এবং অপরাপর কায়স্থ ব্রাহ্মণ নবশাখাদি সর্ব্ব জাতিকে আহ্বান করিয়া নিজ নামে গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন।"[৯] এই সমসাময়িক ইতিহাসবেত্তার কথা আমরা কিরূপে অবিশ্বাস করিব? সুতরাং আন্দুলের চতুর্ধরী রাজা টোডরমলের সহকারী গোবিন্দশরণ দত্তই যে গোবিন্দপুরের সংস্থাপক তাহা মানিয়া লইতে হইতেছে। গোবিন্দপুরের পূর্ব্ব নাম "বাদর রসা।"

কাল জমীদার অর্থাৎ কলিকাতার বাঙ্গালী সহকারী মাজিষ্ট্রেট গোবিন্দ-রাম মিত্রের জীবনী লেখকও বলিয়াছেন, গোবিন্দরাম মিত্র ১৬২৮ খ্রীঃ পৈতৃক

বাসভূমি ত্যাগ করিয়া চার্ণক সাহেবের সহিত এখানে আসিয়া বাস করিলেন এবং নিজ নামানুসারে গ্রামের নাম গোবিন্দপুর রাখিলেন।[১০] অথচ উহার নিম্নচ্ছত্রে লিখিয়াছেন, ১৬৯৫ সালে যখন গোবিন্দপুরে(!)দুর্গ নির্ম্মিত হয়, সেই সময় তিনি কুমারটুলীতে আসিয়া বাস করেন। উক্ত দুর্গ যে কলিকাতায় নির্ম্মিত হইয়াছিল, লেখক তাহা জ্ঞাত ছিলেন না।

গৌরদাস বাবু বলেন, মুকুন্দরাম শেঠ, কালিদাস বসাক, শিবদাস বসাক, বারপতি বসাক, ও বাসুদেব বসাক এই পাঁচজন বস্ত্র-বিক্রেতা সপ্তগ্রাম হইতে আসিয়া ঐ স্থানে বাস করেন। তন্মধ্যে মুকুন্দরাম শেঠ প্রধান এবং তাহার আনীত গোবিন্দজী বিগ্রহের নামানুসারে গ্রামের নামকরণ করিয়াছিলেন। ১৭৬০ খ্রীঃ নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ আরম্ভ হয়, সম্ভবত ১৭৫৯ খ্রীঃ গোবিন্দপুরবাসী-দিগকে স্বগ্রাম ছাড়িয়া নানা স্থানে প্রস্থান করিতে হয়। শেঠ বসাকেরা অধিকাংশ বড়বাজারে গিয়া বাস করেন, তাঁহাদের গোবিন্দজী বিগ্রহের জন্য গঙ্গার ধারে নূতন দেবালয় নির্ম্মিত হয়, এখনও তিনি সেই গৃহে আছেন, কিন্তু গঙ্গা তাঁহাকে ছাড়িয়া অনেক দূর চলিয়া গিয়াছেন, তিনি টাকশালের পূর্ব্বে দরমাহাটা ষ্ট্রীটের উপর অবস্থিতি করিতেছেন।

গতবারে আমরা বরিষার সাবর্ণ চৌধুরী কেশবরাম রায়ের ব্যবহর্ত্তা রুক্মিনী-কান্ত মজুমদারের পরিচয় দিয়াছিলাম, তিনি সাধারণত ব্যবহর্ত্তা উপাধি লইয়া-ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত্র রামচরণ ব্যবহর্ত্তা উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত হন। অল্প দিন পরে রামচরণ ব্যবহর্ত্তার সহিত জমিদারের মনোমালিন্য হওয়ায় তিনিও গোবিন্দপুরে গঙ্গাতীরে আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। নবাব আলীবর্দ্দী ইঁহাকে প্রথমে হিজলীর নিমক মহলের অধ্যক্ষ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন, কিছুকাল পরে মহারাষ্ট্র উপদ্রব দমনার্থ নবাব যে সৈন্য প্রেরণ করেন, রামচরণ তাহার প্রধান রসদ বিভাগের অধ্যক্ষ হইয়া যান, মেদিনীপুরে এই সৈন্যদল বিনষ্ট হয়, রামচরণও হত হইয়াছিলেন। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে এই ঘটনা হয়। ইতিপূর্ব্বে ১৭৩৭ সালের ঝড় ভূমিকম্প ও জলপ্লাবনে তাঁহার নূতন গৃহখানি গঙ্গাগর্ভে পতিত হওয়ায়, তিনি পরিবার লইয়া সুবা বাজারে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারই কনিষ্ঠ পুত্র মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর।

কালীঘাটের হালদারদিগের আদিপুরুষ ভবানীদাস চক্রবর্ত্তীর পূর্ব্ব পরিণীতা ভার্য্যার গর্ভজাত দুইটী পুত্রও গোবিন্দপুরে বাস করিতেন। তদ্ভিন্ন নানা স্থান হইতে অনেক ধনবান সম্ভ্রান্ত কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈশ্য ও নবশাখেরা আসিয়া

গোবিন্দপুর পূর্ণ করিয়াছিলেন। জানবাজার শাঁখারীটোলা প্রভৃতি স্থানের সদ্গোপদিগের আদি পুরুষেরাও গোবিন্দপুরবাসী হইয়াছিলেন। একটী বর্দ্ধিষ্ণু নগরের উপযোগী হাট বাজার প্রভৃতি এবং আবশ্যকীয় শিল্পী ও কুলি মজুর প্রভৃতিতে লোকালয়টী বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার মহাশয়ের মাতামহের পূর্ব্বপুরুষেরা গোবিন্দপুরের পরিবর্ত্তে শাঁখারীটোলার পূর্ব্বকথিত খালের ধারে অনেক জমী পাইয়া নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে খালধারের ঘোষ বলিত। আর দুইজন সদ্গোপ ঘোষ শাঁখারীটোলার এবং জানবাজারের জমী পাইয়া বাস করেন। হাজরা উপাধিধারী জনৈক সদ্গোপ ভবানীপুরে নকুলেশ্বরের নিকট বাটী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহাদের নামানুসারে হাজরা পুকুর, হাজরা রোড প্রভৃতি আজিও বিদ্যমান আছে।

গোবিন্দশরণ দত্তের পৌত্র রামচন্দ্র দত্ত ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বেই গোবিন্দপুর ছাড়িয়া সুতাণুটী হাটে অর্থাৎ হাটখোলায় আসিয়া বাটী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান মাণিক বসুর ঘাট ষ্ট্রীট হইতে নিমতলা ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত ইঁহাদের নূতন বাটীর পরিসর ছিল। সুরসুনার সুবিখ্যাত সীতারাম আইচের বংশীয় একজন আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিয়াছিলেন, দুর্গ নির্ম্মাণকালে তাঁহার বংশীয় রামগোপাল আইচ ও জগন্নাথ আইচ পটলডাঙ্গায় সুবিস্তৃত জমী পাইয়া বাস নির্ম্মাণ করেন। ঘোষাল বাবুদের বাটীর সংলগ্ন তাঁহাদের বাটী ছিল, তখন মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট হয় নাই, উক্ত রাস্তা তাঁহাদের বাটীর উপর দিয়া গিয়াছে, রাস্তার দক্ষিণের সমস্ত জমী তাঁহাদেরই ছিল। সিমলা মাণিকতলা ষ্ট্রীটের ২৭নং বাটী-নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার বাবু যোগেন্দ্রচন্দ্র আইচ ও ডাক্তার দেবেন্দ্রচন্দ্র আইচ প্রভৃতি ভ্রাতৃগণ রামগোপাল আইচের পঞ্চম পুরুষ। জগন্নাথ আইচের বংশধর জোড়াসাঁকোয় বাস করিতেছেন। জগন্নাথ আইচ অতি বৃদ্ধ বয়সে প্রাণত্যাগ করেন, তাহার পত্নী সহমৃতা হন, গমনকালে তিনি আপনার নাকের নতটী খুলিয়া যে বধূকে দিয়া যান সেই মহিলাকে আমরা দর্শন করিয়াছি।

১. কালীঘাট সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তি পাওয়া গিয়াছে। সাবর্ণ চৌধুরী বংশের কেহ কেহ বলেন,—তাঁহাদের আদিপুরুষ লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় বাদসাহ কর্ত্তৃক মজুমদার হইবার পূর্ব্বে যশোহরপতিদিগের সরকারে কার্য্য করিতেন। বেহালা প্রভৃতি প্রদেশ তাঁহার অধীনে ছিল, তিনিই বেহালার দুর্গ নির্ম্মাণ করেন

এবং বর্ত্তমান স্থানে কালী প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজা বসন্ত রায়ের অনুমতিক্রমে উহার ক্ষুদ্র গৃহ নির্ম্মাণ এবং দেবোত্তর প্রদান করেন। চৌরঙ্গী গিরির কথা উঁহারা স্বীকার করেন না।

২. একখানি পুরাতন ম্যাপে আমরা ডিহি জাননগর ও কলিকাতা এক সীমার মধ্যেই দেখিয়াছি, উক্ত জাননগর বর্ত্তমান জানবাজারের স্থানে। কিন্তু আপজনের ১৭৯২ সালের ম্যাপে বর্ত্তমান থিয়েটার রোডের পূর্ব্বে সার্কিউলার রোডের পরপারে আর একটী জাননগর আছে।

৩. উইলিয়ম বেলীর কৃত ১৭৮৪ সালের ম্যাপে কেটো ষ্ট্রীটের উত্তর এবং চিৎপুর রোডের পশ্চিমে ডিহি সুতানুটী কেন লেখা হইয়াছে জানি না।

৪. বরাহনগর চিৎপুরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত ছিল।

৫. বাদাকে অতি পূর্ব্বে "হাদাদহ" বলিত। নদীর জলে ভগ্ন স্থানকে হানা, ভূমিকম্পে যে কোন স্থান গভীররূপে ধসিয়া গেলে তাহাকে হাদা, অথবা দহ বলিয়া থাকে। আমরা প্রথম প্রস্তাবে নিম্নবঙ্গের সময় সময় ধসিয়া যাওয়ার অনেক প্রমাণ দিয়াছি। কোন সময় বর্ত্তমান বাদাও ঐরূপে ধসিয়া এত গভীর হইয়াছিল যে, তাহার উপর দিয়া সামুদ্রিক পোতসকল যাতায়াত করিত। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহামহোপাধ্যায় ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসের এসিয়াটিক সোসাইটীর প্রোসিডিং পুস্তকে পাঁচখানি সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রস্তাবের পুঁথির উল্লেখ করিয়াছেন, একখানি এমন নষ্ট হইয়াছে যে, তাহার প্রায় কিছুই উদ্ধার করিতে পারেন নাই, অপর চারিখানিতেই হাদাদহের উল্লেখ আছে। লেখকেরা শ্রুতকথা লেখায় উহার স্থান নির্ণয়ে গোলযোগ করিয়াছেন, কেবল একখানিতে আছে হাদাদহ পার হইয়া একটী বাঁক ফিরিয়া জাহাজ মগরায় পঁহুছিল।

৬. মিঃ ডবলি, এচ, কেরি, ভারতবর্ষে এইরূপ ছায়াদৃশ্যের অনেকগুলি বর্ণনা করিয়াছেন।

৭. কেদার বাবু লিখিয়াছেন :—

"শ্রীরামশরণো জ্যেষ্ঠো গোবিন্দ মধ্যমস্তথা।
কনিষ্ঠঃ শ্রীহরিশ্চৈবং কুলাচার্য্যৈর্বিচারিতং॥
বিষয়ানাং বিভাগেষু তেষাং বৈরং পরস্পরং।
অভবৎ স্বল্পকালে তৎ সর্ব্ববিপ্লাবনংপরং॥

গোবিন্দশরণস্ত্যক্তা স্বগৃহে বিষয়াদিকং ।
লেভে তোড়লমলাৎ কার্য্যং ভূমিদানাদিকর্ম্মষু ॥
তোড়লমলস্ত কৃপয়া মানসিংহনৃপায় সঃ ।
অর্পয়ামাস গোবিন্দং জ্ঞাত্বা কার্য্যক্ষমংহি তং ॥
গোবিন্দস্য স্বকার্য্যেষু তুষ্টো রাজা মহামতিঃ ।
আকবরাজ্ঞয়া ভূমিং দদৌ তং গৌড়মণ্ডলে ॥
গঙ্গাপূর্ব্বতটে রম্যে কালিকাপীঠসন্নিধৌ ।
গোবিন্দশরণশ্চক্রে গোবিন্দপুরপত্তনং ॥

৮. প্রতাপাদিত্য ভূপস্য যশোর ভূমিপ পস্য চ ।
গঙ্গাবাস স্থলো রাজন্ ইদানীং বর্ত্ততে নৃপ ॥

দিগ্বিজয়প্রকাশ ৬৮৬ ছন্দ

৯. বিশ্বকোশ ৩য় খণ্ড ২৯৫ পৃষ্ঠা ।

১০. An Account of the Late Govindaram Mitter, page 1.

সন্নিহিত জনপদ[১]

সপ্তদশ শতাব্দী ও তৎপূর্ব্বে কলিকাতার নিকট যে সমস্ত জনপদ ছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া রাখা আবশ্যক। যদিও ইহা পাঠ মধুর হইবে না, তত্রাচ ঐতিহাসিক নিয়মানুসারে তাহাদের নাম প্রভৃতির যতদূর সম্ভব স্থায়িত্ব রক্ষা করা উচিত। গতবারে ৪৯৮ পৃষ্ঠায় ডি বারোসের মানচিত্র সম্বন্ধে লেখা হইয়াছিল, "চক্ষে দেখিয়া যতদূর পারিয়াছেন চিত্রিত করিয়াছেন,' প্রামাণিক গ্রন্থে দেখিলাম, ডি বারোস কখন ভারতবর্ষ চক্ষে দেখেন নাই। তিনি ১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, ১৫৩১ সালে কতকগুলি আবশ্যকীয় অফিসিয়াল কাগজপত্র প্রাপ্ত হন, তদ্দৃষ্টে ১৫৫২, ১৫৫৩, এবং ১৫৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া ভারতবর্ষ ও ইহার নিকটবর্ত্তী দ্বীপসমূহের তাৎকালিক বিবরণ যতদূর পারিয়াছেন, বর্ণন করিয়াছিলেন। ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহারই মানচিত্রে সাতগাঁ, আগড়পাড়া, বরাহনগর, যক্ষ এবং বাঁটর (ব্যাঁটরার) স্থান ও নাম দেখা গিয়াছে, পূর্ব্বে কালীঘাট প্রস্তাবে মুকুন্দরামের চণ্ডীর মধ্যে বেতড়ের উল্লেখকে আমরা ভ্রম বলিয়া মনে করিয়াছি, এখন বুঝা যাইতেছে, ডি বারোসের বাটোরই মুকুন্দরামের বেতড় হওয়া সম্ভব এবং উহা পূর্ব্বে সম্ভবতঃ বহুদূর বিস্তৃত থাকায় কতক অংশ ব্যাঁটরা এবং কোন স্থান পূর্ব্ব-নামে বেতড়ের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। উক্ত গ্রন্থে স্থানগুলির নাম ভৌগোলিক নিকটবর্ত্তী উল্লেখ কোথাও দেখা যায় না, ইহা যে কেবল মুকুন্দরামের দোষ, তাহা নহে, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে চারিখানি সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক প্রাচীন গ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, সমস্তগুলিতেই এই দোষ দৃষ্ট হয়। আমরা মুকুন্দরামের বর্ণনায় যে সকল প্রাচীন স্থানের উল্লেখ পাইতেছি, তাহা এই :—উদ্ধাবন, কৌলগ্রাম, চাকদা, কুমারখালা, হাড়িয়া, মৌনা, হসনপুর, গড়পাড়া, দৌলতপুর, বাল্লা, কাঁকনা, গঙ্গাড়া, কুলীনপাড়া, কুণ্ডরপুর, বাঁকুল্যা, বেলেড়া, কাথড়াপুর, গোমতা, ঘনপাড়া, চন্দ্রখালি, নারায়ণদহী, মানপাড়া, নপাড়া, বাগনপুর, চরথী, আক্লারপুর, নবগাঁ, সোণালিয়া, কোলা, উধনপুর, নৈহাটী, শাঁখারীঘাট, মঙ্গলঘাট, বারেন্দা, রাহুতপাড়া, কাঁকড়াহাটী, বাইগুণকোপ, ললিতপুর, ভায়োসিংহের ঘাট, মাটিয়ারি, বেলনপুর, নবদ্বীপ, মৃজাপুর, নিশ্চিন্তপুর

গোঠপাড়া, শিকড়দহ, মেড়তলা, সমুদ্রগড়ি, পাহাড়পুর, আম্বুয়া মুলুক, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, কোদালিয়া, উলা, কাছিমা, মহেশপুর, হালিসহর, ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম, গরিফা, গোন্দলপাড়া, জগদ্দল, ইছাপুর, মাহেশ, খড়দহ, কোন্নগর, কোতরং, কুচিনান, চিৎপুর, শালিখা, কলিকাতা, বেতড়, ধনস্থ, বালিঘাটা, কালীঘাট, মাইনগর, নাচনগাছা, বারাশত, খলিনা, ছত্রভোগ, রশান, হিমাই, কালীপাড়া, হাতিগড়, মগরা, ফুলিয়া, যশিপুর। ইহার মধ্যে অনেক স্থানের এখন ঠিকানা নাই।

কবিরামের দিগ্বিজয়প্রকাশে নদীয়া, চব্বিশ পরগণা, যশোর ও হুগলী জেলা কিলকিল্লা প্রদেশ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, "ইহার পূর্ব্ব সীমা কালিন্দিকা (অর্থাৎ যমুনা) নদী, পশ্চিম সীমা সরস্বতী। দানগলি[২] নদীতীরে গঙ্গার পার্শ্বে সাড়েশ্বরী দেবী[৩] আছেন। মাহেশ ও খড়্গাদাহ গ্রামের মধ্যে দীর্ঘ গঙ্গার[৪] তীরে মাহেশে রাজা কুলপাল বাস করিতেন। ইহারা দুই ভাই, কুলপাল ও দেশপাল। কুলপাল হইতে হরিপাল ও অহিপাল জন্মগ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণ, তন্তুবায় ও শাঁখারী প্রজা লইয়া হরিপাল সিঙ্গুরের পশ্চিমে "হরিপাল" নামক সমৃদ্ধিশালী গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। অহিপাল মাহেশ ছাড়িয়া ত্রিবেণী সন্নিকটে চক্রদ্বীপ অর্থাৎ চাকদহে ও ডুমুরদ্বীপ অর্থাৎ ডুমুরদহে বাস করেন। অহিপালের তিন পুত্র, কৃতধ্বজ, বিভাণ্ড ও কেশীধ্বজ। কেশীধ্বজ সপ্তগ্রামে গিয়া বাস করেন। কৃতধ্বজের পুত্র বিরলি, সুগন্ধি[৫] গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিয়াছিলেন। বিভাণ্ডের বংশধরেরা জগদ্দলে বাস করেন। কেশীধ্বজ চান্দোল নামক কায়স্থ গ্রামের প্রতিষ্ঠাতা। ব্রাহ্মী (বীরভূমের অন্তর্গত ভদ্রপুরের নিম্ন দিয়া গঙ্গা পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণী নামে নদী ছিল) নদীতীরে কেশীধ্বজের বংশীয় কায়স্থেরা বাস করেন। শিবপুর, বালুকা অর্থাৎ বালি, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর প্রভৃতি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগের বাসভূমি। হুগলির সন্নিকট বংশবাটী গ্রামের নিম্নে দামোদর হইতে খলাপ নদী আসিয়া গঙ্গায় মিশিয়াছে। খলশানী নামক একখানি বৃহৎ গ্রামে ধীবর জাতীয় রাজা বাস করেন। গঙ্গার পূর্ব্বভাগে পাটলী গ্রামে অনেক কায়স্থের বাস। গোবিন্দপুর, ভট্টপল্লী, শৃগালদহ, সারপল্লী অর্থাৎ সুরো প্রভৃতি তিন সহস্র ধনজনসম্পন্ন গ্রাম এই কিলকিল্লা প্রদেশের মধ্যে অবস্থিত।"

চৈতন্যদেবের জীবনচরিতে কালনা, শান্তিপুর, পানিহাটী, আড়িয়াদহ, বরাহনগর প্রভৃতি গ্রামের উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন আন্দুল, সুরসুনা,

সীতারামপুর, মুরাদপুর, বেহালা, রসা পাগলা, বরিষা, হরিনাভি, জাগুলি প্রভৃতি প্রাচীন ভদ্রগ্রামের নাম প্রচলিত রহিয়াছে। নদীয়া হইতে কৃষ্ণনগর, নারায়ণপুর, জাগুলি ও বারাশত হইয়া কলিকাতায় এবং কলিকাতা হইতে বেহালার ভিতর দিয়া কুল্পি পর্য্যন্ত একটী পুরাতন রাস্তা রেনেলের মানচিত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গ্রন্থমধ্যে আইন-আকবরিতে "কলকত্তা" এবং বটতলায় মুদ্রিত মুকুন্দরামের চণ্ডীতে "কলিকাতা" ভিন্ন এই স্থানের ঐ নাম আমরা আর দেখিতে পাইতেছি না।

১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাদসাহ আওরংজেবের পৌত্র বাঙ্গালার নবাব আজিম উসানকে অনেক ধনরত্ন দান করিয়া যে তিনখানি গ্রাম জমিদারদিগের নিকট উচিত মূল্যে ক্রয় করিবার অনুমতি লাভ করেন, অর্মির মতে তাহা সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। কিন্তু কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হামিল্টন্, যিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, তিনি লিখিয়াছেন, "কোম্পানীর অধীনস্থ স্থানের সীমা একদিকে গভর্ণপুর (গোবিন্দপুর) অপর দিকে বর্ণাগুল (বরাহনগর), যেখানে ডচ্ দিগের কুঠী ও বাগান আছে। এই সীমা নদীতীরে ছয় মাইল, স্থলভাগে লবণ হ্রদ পর্য্যন্ত। ইহার মধ্যে দশ বার হাজার লোক বাস করে। ইহারা কোম্পানির খাজনা রীতিমত প্রদান করিতে কোন আপত্তি করে না।" এই লেখায় বুঝা যাইতেছে, বরাহনগরের দক্ষিণ চিৎপুর পর্য্যন্ত কলিকাতা ছিল। তাহা হইলে সুতানুটী নহে, বাগুয়া বটে, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি সুতানুটী বাগুয়ার মধ্যস্থ একটী ডিহি মাত্র।

১. ২য় প্রস্তাবে অর্থাৎ নব্যভারতের ৩৯৭ পৃষ্ঠায় আমরা যে শ্রাদ্ধের গোলযোগের উল্লেখ করিয়াছিলাম যে শ্রাদ্ধের কর্ত্তা কালীপ্রসাদ দত্ত, তাঁহাকে চূড়ামণি দত্তের পুত্র বলা হইয়াছিল। এক্ষণে আমরা একটী শতাধিক বর্ষীয়া বৃদ্ধা'র নিকট শুনিয়া আমাদের ভ্রম সংশোধন করিতেছি। এই মহিলা হাটখোলার মাণিক বসুর বৃদ্ধ প্রপৌত্রী। তিনি ঐ নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন এবং উহার অনেক ব্যাপার তিনি স্মরণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছেন। এমন কি, সেই শ্রাদ্ধ উপলক্ষে সে সময় যে সংগীত রচিত হইয়াছিল তাহারও কতক অংশ তাঁহার স্মরণ থাকায় আমরা সংগ্রহ করিয়াছি। বৃদ্ধার নিকট সেকালের অনেক কথা পাইয়া আমরা বিশেষ উপকৃত হইয়াছি, তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ। তিনি বলেন, কালীপ্রসাদ দত্ত চূড়ামণি দত্তের পুত্র নহেন। হাটখোলার গৌরচাঁদ দত্তের

দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ গোকুলচাঁদ কনিষ্ঠ রামহরি দত্ত, কালীপ্রসাদ এই রামহরির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তাঁহার পিতার শ্রাদ্ধ নহে, জননীর। কালীপ্রসাদ যথার্থ ই একজন মুসলমান নর্ত্তকীর গৃহে যাতায়াত করিতেন, উক্ত নর্ত্তকীর নাম আনার বিবি। শ্রাদ্ধে গোলমাল আর কেহ তত করেন নাই, জ্ঞাতিরা অর্থাৎ দত্তগোষ্ঠীই শেষ পর্য্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং যোগ দেন নাই। শ্রাদ্ধোপলক্ষে যে গানটী রচিত হইয়াছিল, তাহার অংশ এই :—

"দত্ত বাড়ীর তত্ত্ব শুন ভাই :—

* * * *

কেউ সেজেছেন মোল্লারে ভাই,
কেউ সেজেছেন কাজী,
চাকা টুপী মাথায় দিয়ে কেউ সেজেছেন ঘাট মাঝি

* * * *

বিবি আনারের চরিত্র গাই ॥"

এই ব্যাপারে কালীপ্রসাদ শেষ জীবনে সংসার ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে দিবারাত্র বাস করিতেন, এবং যোগধ্যানে জীবনের শেষাংশ যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র শম্ভুচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র, কিন্তু তাঁহাদের বংশধর নাই। রামহরির দ্বিতীয় পুত্র শিবপ্রসাদের মহেশ ও গিরীশ নামক দুই পুত্র ছিল, কেবল মহেশ-চন্দ্রের বংশ আছে। তাঁহার দুই পুত্র, বীরেশ্বর ও কেদারেশ্বর, বীরেশ্বরের কৃষ্ণকিশোর ও নকুড়চন্দ্র নামে পুত্রগণ আছেন। তাঁহারা যদি নিজ পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সম্বন্ধে আরও কিছু জ্ঞাত থাকেন, আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব।

২. বর্তমান ডানকুনীর জলা।

৩. চুঁচুড়ায় সাড়েশ্বরতলা দেখা যায়।

৪. বোধহয় পূর্ব্বে এই স্থানে গঙ্গা বহুদূর পর্য্যন্ত সমরেখায় প্রবাহিত ছিল।

৫. সুগন্ধি গ্রাম হুগলি হইতে পশ্চিম দিকে ধনেখালি পর্য্যন্ত যে রাস্তা গিয়াছে সেই পথে অমরপুরের পশ্চিমে। বসুরায় বংশই এই গ্রামের প্রধান অধিবাসী, পূর্ব্বে ইঁহারা নবাব সরকারে চিকিৎসা ব্যবসা করিতেন, আজিও অনেকে ঐ ব্যবসা অবলম্বন করিয়া আছেন। রায় মহাশয়দের পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ বাঙ্গালার মধ্যে একটা দর্শনীয় বস্তু। অতবড় তোরণ ও পূজার দালান এবং তাহার অদ্ভুত কারুকার্য্য এখন অতি অল্পই দেখা যায়।

কয়েকটি প্রাচীন পরিবার

১

এইচ, বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ সালে Suppplement to Statistical Reporter মধ্যে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন, "এদেশের বায়ুর গুণে কোন কাগজপত্র অধিক দিন থাকে না। গবর্ণমেণ্টের যে সমস্ত দলিলপত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সিরাজউদ্দৌলার হস্তে প্রথমতঃ যে সমস্তই অগ্নিতে দগ্ধ হইয়াছে। তাহার পর যত সংগ্রহ হইয়া ছিল, তাহার অধিকাংশ সঁ্যাতানিতে ও উইপোকায় নষ্ট করিয়াছে, সুতরাং পুরাতন দলিলপত্র দৃষ্টে কলিকাতার পূর্ব্বাবস্থা কিছুই নিরূপণ করিবার উপায় নাই। ভ্রমণকারী ও কোন কোন লেখকের পত্রাংশ লাভ করিতে পারিলে পরম লাভ বলিয়া সেইগুলিকেই অবলম্বন করিয়া যাহা কিছু ঐতিহাসিক তত্ত্ব পাওয়া যায় তাহাই যথেষ্ট।" ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে হলওয়েল সাহেব তাঁহার ডেপুটী গোবিন্দরাম মিত্রের প্রতি সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার চাকুরীর প্রথম হইতে হিসাব দাখিল করিতে বলায় গোবিন্দরাম উত্তরে বলেন, "পূর্ব্বের কাগজপত্র সমস্ত ১৭৩৭ সালের বন্যায় ভাসিয়া গিয়াছে এবং তাঁহার পরের কাগজপত্র উইপোকায় খাইয়াছে।" তিনি আরো বলেন "ইংরাজদিগের আসিবার পূর্ব্বে এ দেশে যাহারা বাস করিত এ পর্য্যন্ত তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারা যায় নাই। যদি কোন দেশীয় চেষ্টা করিয়া কিছু করিতে পারেন, তাহা হইলে হইতে পারে।" তাঁহার উপরোক্ত আক্ষেপোক্তিগুলি প্রতি অক্ষরে সত্য। ইংরাজ আগমন অধিক দিনের নহে, দুইশত বৎসরের কথামাত্র অথচ তাহার পূর্ব্বের অধিবাসীদিগের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। আমরা কলিকাতার অতি পুরাতন অধিবাসী হইয়াও অনেকদিন হইতে যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিয়া অতি সামান্যমাত্র সন্ধান পাইয়াছি। এখনও চেষ্টায় বিরত হই নাই, সন্ধান পাইলেই পাঠকগণকে অবগত করিব।

চিৎপুরে একটী অতি প্রাচীন কায়স্থ বংশ বাস করিতেন, বহুকাল তাঁহারা চিৎপুর ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন, তবুও বাগুয়ার প্রাচীন অধিবাসী বলিয়া তাহাদের কথা অগ্রে লিখিতেছি। মহানাদের দে-বংশীয় কোন ব্যক্তি পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাগুয়া পরগণার চিত্রপুর বা চিৎপুরে আসিয়া বাস করেন, উক্ত শতাব্দীর শেষ ভাগে উক্ত কায়স্থ দে মহাশয়ের পৌত্র চক্রপাণি গৌড়ের নবাবের সেনাপতি ছিলেন। সে সময় লোকে বিদেশে চাকুরীস্থানে প্রায়ই পরিবার লইয়া বাস করিতেন না, চক্রপাণি সাহসীবীর ছিলেন, ভয় কাহাকে

বলে জানিতেন না, বোধ হয় সেই জন্যই সপরিবারে গৌড়ে বাস করিতেন। তাহার একটী পরমা সুন্দরী বিধবা কন্যা ছিলেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার রূপ-লাবণ্যের সংবাদ নবাবের কর্ণে উঠিল। তিনি চক্রপাণি সেনাপতিকে ডাকিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। চক্রপাণি যেমন বীর তেমনই বুদ্ধিমান ছিলেন। নবাবের অভিলাষ শ্রবণমাত্র আপনাকে পরম পুলকিত দেখাইয়া ভাবী জামাতাকে সম্মানের সহিত বার বার অভিবাদন করিয়া বলেন, বাদসাহ আপনি পয়গম্বরের ন্যায় সত্যবাদী, ইহা আমি অবশ্যই আশা করিব যে আপনার এই অভিলাষ পূরণ করিতে আপনি কোন কু-লোকের ছলনা বা বাধা প্রতিবন্ধক গ্রাহ্য করিবেন না। আমার একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, আমাদের কৌলিক প্রথা অনুসারে আমাদের গ্রাম্য দেবতা চিত্রেশ্বরী দেবীর পূজা করিতে হয়, সুতরাং কন্যাকে লইয়া গিয়া চিত্রেশ্বরীর পূজা করিয়া আসিতে দুই সপ্তাহ মাত্র বিলম্ব হইতে পারে। যদি সেই সময় মধ্যে কোন কু-লোক আপনার মন ফিরাইয়া দেয়, তাহা হইলে আমার এবং কন্যার বড়ই মর্ম্ম-পীড়া উপস্থিত হইবে। নবাব চক্রপাণির ছলনা বুঝিতে না পারিয়া আপনাকে স্থিরপ্রতিজ্ঞ বলিয়া প্রতিভূস্বরূপ তাঁহাকে সিরোপা প্রদান করিয়া সম্মানের সহিত বিদায় করেন। কিন্তু সঙ্গে প্রহরী দিয়াছিলেন। চক্রপাণি গৌড়নগর হইতে সপরিবারে বাহির হইলেন বটে, কিন্তু কি উপায়ে জাতিকুল, মান বাঁচাইবেন তাহা স্থির করিতে পারেন নাই। বিধাতা রক্ষাকর্ত্তা বিশ্বাস করিয়া আপনাদিগের পূর্ব্ব-বাস মহানাদের নিকট আসিয়া নৌকা রাখিলেন। এবং "সুবিখ্যাত জটেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করিয়া আসি, তোমরা আমার দ্রব্যাদি রক্ষা কর" বলিয়া সপরিবারে অবতরণ করেন এবং অন্যপথে গঙ্গাতীরে আসিয়া নৌকারোহণ করিয়া স্রোতমুখে নৌকা ভাসাইয়া দেন। চিৎপুরে নামিতে আর সাহস হইল না, পাছে নবাবের লোকে ধরিয়া ফেলে। গঙ্গাজলে ভাসিতে ভাসিতে মুড়াগাছায় গভীর জঙ্গলতীরে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, সে প্রদেশে জনমানবের কোন চিহ্নই নাই। নির্ভয়ে অবতরণ করিয়া বনমধ্যে কুটীর বাঁধিয়া বাস করিতে লাগিলেন।

এদিকে চিৎপুরে নবাবের লোকজন আসিয়া তাঁহাকে না পাইয়া তাঁহার ভ্রাতার উপর এমন বিষম উপদ্রব করিয়াছিল যে, তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিতে বাধ্য হন। চক্রপাণি নিশাকালে বনমধ্যে দেবারতির শঙ্খ-ঘণ্টার শব্দ পাইয়া একি ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন না। পরদিন বনমধ্যে অনুসন্ধান

করিয়া দেখিতে পাইলেন, এই নির্জ্জন বনে একটী পরম সুন্দর ইষ্টক নির্ম্মিত দেবালয় রহিয়াছে। এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তন্মধ্যে ভক্তিভাবে কৃষ্ণমূর্ত্তির সেবা করিতেছেন। বিগ্রহের নাম হরিমাধব। নির্ব্বাসিত চক্রপাণি বিজন বনে সাধু বৈষ্ণবের সঙ্গলাভে সানন্দে দেবতা ও ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া আপনার বিপদবার্ত্তা নিবেদন করিলেন, ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অভয় দিয়া বনমধ্যে যাহাতে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারেন তদুপযোগী সমস্ত সুবিধা করিয়া দেন। ক্রমে ইঁহাদের আদর্শে অনেক কায়স্থ ব্রাহ্মণাদি জাতি আসিয়া হরিমাধবের মন্দির বেষ্টন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। গ্রামের কেন্দ্রস্থলে হরিমাধবের মন্দির থাকায় গ্রামের নাম হরিনাভি রাখা হয়।

চক্রপাণির পুত্র শূলপাণিও পিতার সহিত আসিয়াছিলেন। তৎপুত্র বিষ্ণুদাসের সময় ১৫৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ভীষণ জলপ্লাবন ঝটিকা ও ভূমিকম্পে যখন নিম্নবঙ্গ ঘোর বিপদগ্রস্ত হইয়াছিল, সেই দৈব উপদ্রবে হরিমাধবের মন্দির মৃত্তিকাতলে বসিয়া যায়। আজিও লোকে সেই ভূমিখণ্ডকে হরিমাধবের পোতা বলিয়া উল্লেখ করেন। বিষ্ণুদাস দের দুই পুত্র, পার্ব্বতীচরণ ও দেবীদাস। পার্ব্বতীচরণ বিশেষ প্রতাপশালী ছিলেন এবং বিস্তর কায়স্থ সহ ব্রাহ্মণদিগকে আনাইয়া গ্রাম ও চতুষ্পার্শ্বে স্থাপন করিয়া কতক স্থানের পার্ব্বতীপুর নাম প্রদান করেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র জয়কৃষ্ণের ঔরসে রামজীবন ও রামানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। রামজীবনের চারিপুত্র, শ্রীরাম, রামরাম, রামদেব ও লক্ষ্মীকান্ত, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠের পৌত্র পর্য্যন্ত হইয়া বংশলোপ হইয়াছে। দ্বিতীয় ও চতুর্থ নিঃসন্তান, কেবল রামদেবের বংশ বর্ত্তমান; তাহার পুত্র আনন্দিরাম, তৎপুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও মদনমোহন। কৃষ্ণচন্দ্রের পুত্র ভৈরবচন্দ্র ও তারিণীচরণ, ভৈরবের পুত্র কেদারনাথ ও মহেন্দ্রনাথ। এই কেদারনাথ দে ব্রাহ্মধর্ম্মাশ্রয় করেন এবং নববিধানের প্রেরিতত্ব লাভ করিয়াছিলেন, তাহার পাঁচ পুত্র বর্ত্তমান।

উপরোক্ত পার্ব্বতীচরণের কনিষ্ঠ দেবীদাসের পুত্র রামকান্ত, তৎপুত্র রামেশ্বর, তৎপুত্র রামকিশোর, তৎপুত্র রামকানাই, তৎপুত্র রাধামোহন। ইনি বংশমধ্যে প্রথমে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা করিয়া বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাহার পুত্র গুরুদাস, তৎপুত্র শ্রীযুক্তবাবু উমেশচন্দ্র দে কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্বে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া উপবীত আদি গ্রহণ করিয়াছেন। এই চক্রপাণিদের বংশ অতি বিস্তৃত। যদিও আমরা সমস্ত পাইয়াছি, কিন্তু এ প্রস্তাবে তৎসমস্ত প্রকাশ করিলে নেক স্থান যায় এবং পাঠকদিগেরও বিরক্তিজনক হইতে পারে।

কয়েকটি প্রাচীন পরিবার

২

পুরাতন ভদ্রবংশীয়দিগের মধ্যে নিজ কলিকাতা পরগণার অধিবাসী আমরা এ পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়া পাই নাই। যাঁহাদিগকে পুরাতন অধিবাসী ভাবিয়া অনুসন্ধান করিলাম, তাঁহাদিগের অনেকেই বলেন, তাঁহারা গড়গোবিন্দপুর হইতে ইংরাজের দ্বারা স্থানান্তরিত হইয়া আসিয়াছেন। বাগুয়া পরগণার মধ্যে স্থতানুটী ডিহিতেই মাত্র কয়েক ঘর পুরাতন বাসিন্দা পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে ঘোষ বংশকে অতি প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়। ইঁহাদের মধ্যে অনেক মহাত্মা পুরুষ আপনাপন কৃতিত্ব রাখিয়া গিয়াছেন, যথা হরি ঘোষ, তুলসীরাম ঘোষ, শান্তিরাম ঘোষ, বারাণসী ঘোষ, রামধন ঘোষ, শঙ্কর ঘোষ, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি। পাথুরিয়াঘাটার ঘোষ বংশ ও স্থবা বাজারের কালীশঙ্কর ঘোষেরা এই পুরাতন ঘোষ বংশীয় নহেন; ইঁহারা ইংরাজাগমনের বহু পরে আসিয়াছিলেন।

বিডন ষ্ট্রীটের কিয়দ্দূরে নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে গ্রে ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত উত্তর দক্ষিণ লম্বমান রাস্তার নাম হরি ঘোষের ষ্ট্রীট। ইহার কোন স্থানে তাঁহার বাস-বাটী ছিল কিনা, তাহা বলা যায় না। অর্ম্মি সাহেবের ১৭৫৭ সালের কলিকাতার মানচিত্রে অনেকগুলি পুরাতন রাস্তা ও তাহার উপর সে সময় যে সকল অট্টালিকা ছিল তাহার চিহ্ন আছে। এক্ষণে যেখানে হরি ঘোষের ষ্ট্রীট, পূর্ব্বে সেখানে কোন বাড়ী বা রাস্তার চিহ্নও দেখা যায় না, কিন্তু যেখানে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীট হরি ঘোষের ষ্ট্রীটের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে, সেই চৌরাস্তার উত্তর-পশ্চিম কোণে আমরা বাল্যকালে একখানি পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিয়াছি। অর্ম্মির ম্যাপেও উহার চিত্র আছে কিন্তু পরিসরে অনুমান এক বিঘা হইতে পারে। ইহাই হরি ঘোষের বাটী কিনা, তাহারও কোন স্থিরতা নাই, কারণ নিকটস্থ এখনকার কোন বৃদ্ধের নিকট কিছু শুনিলাম না। কেবল শুনা গেল, এ হরি ঘোষ কায়স্থ ছিলেন না, সদ্গোপ। অর্ম্মি সাহেবের উপরোক্ত মানচিত্রের মধ্যে গোবিন্দরাম মিত্রের নন্দনবাগানের পশ্চিমে মহারাষ্ট্র খালের পাড়েরও পশ্চিমে পূর্ব্বমুখী একটী সুপ্রশস্ত অট্টালিকার যে চিহ্ন আছে, অত বড় বাড়ী ঐ মানচিত্রে আর নাই। যে "বনমালী সরকারের বাড়ী" প্রবাদবাকে বৃহত্বের জন্য বিখ্যাত, সে বাড়ী তখনও নির্ম্মিত হয় নাই। ইংরাজেরা কলিকাতায়

টাঁকশাল স্থাপন করিলে বনমালী সরকার তাহার দেওয়ানী করিয়া বড়লোক হন এবং বৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। উপরোক্ত মহারাষ্ট্র খালের ধারের বাড়ীখানি উত্তর দক্ষিণে লম্বমান, বাটীর চারিদিকেই সাধারণ রাস্তা; পশ্চিম দিকের রাস্তাটী দক্ষিণে আসিয়া হাতীবাগানের রাস্তায় (যাহা এক্ষণে গ্রে ষ্ট্রীট হইয়াছে) মিশিয়াছিল। এই পথের পশ্চিম দিকে এবং হাতীবাগান রাস্তার উত্তরে নবাব বহুদূরব্যাপী পিলখানা করিয়াছিলেন, ঐ পিলখানা হইতেই স্থানের নাম হাতী-বাগান হইয়াছে। যে বাড়ীখানির কথা বলিতেছি, তাহা এতবড় যে, ক্ষুদ্র মানচিত্রে তাহার ফাটক, চারিদিকের প্রাচীর এবং মধ্যস্থ বড় বড় দালানের চিহ্ন উত্তমরূপে বুঝা যায়। অনেকে বলে, ইহা রামহরি ঘোষের বাটী। আমরা ঐ স্থানে একখানি বৃহৎ পুরাতন বাটী দেখিয়াছি, কিন্তু তাহার ইষ্টক ও গঠন দেখিয়া খুব পুরাতন বলিয়া বিশ্বাস হয় নাই, এমন কি শত বৎসরের অধিক পুরাতন হইবে না। বোধহয় রামহরি ঘোষের পুত্র আনন্দমোহন ঘোষ কাবুল যুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। বোধহয়, দশ পনের বৎসর হইবে, ঐ বাটী ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে, তাহার জমী এখন হাট-খোলার কোন মহাজনের সম্পত্তি। এই বাটীর কিছু উত্তরে বলরাম ঘোষের ষ্ট্রীট নামক রাস্তাটী অতি প্রাচীন। ১৭৮২ সালেও ঐ নাম ছিল। বোধহয় রামহরি ঘোষের পিতার নামেই নামকরণ হইয়াছিল।

"হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া একটী প্রবাদবাক্য অনেকেই জ্ঞাত আছেন, বাস্তবিক তাহা গরুর গোয়াল নহে, হরি ঘোষের গৃহে একটী সুপ্রশস্ত দালান ছিল, শত শত নিষ্কর্ম্মা লোক দিবারাত্রি সেইখান বসিয়া খোসগল্প, তামাক ও গঞ্জিকা সেবন করিয়া জীবনযাপন করিত। অন্নের কোন চিন্তা ছিল না, হরি ঘোষের ভোজনাগারের অবারিত দ্বার, যে যখন আসিত, তখনই অন্ন প্রাপ্ত হইত। সেইজন্য সে সময়ের লোকে উহাকে "হরি ঘোষের গোয়াল" বলিয়া উপহাস করিত। ইঁহার পূর্ণ নাম শ্রীহরি ঘোষ। ইঁহারা বালি সমাজভুক্ত, আদি পঞ্চ কায়স্থ মধ্যে মকরন্দ ঘোষের ১৯শ অধস্তন পুরুষ মহাদেব বা মনোহর ঘোষ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বালি হইতে চন্দনপুকুরে[১] আসিয়া বাস করেন। তথা হইতে তিনি রাজা টোডরমলের অধীনে গোমস্তার কার্য্য পাইয়া খাজনা বন্দোবস্ত উপলক্ষে সুবর্ণরেখার তীরে গমন করেন এবং তথায় একজন সমৃদ্ধিশালী রূপে বাস করেন। মোগলমারির যুদ্ধে উড়িষ্যার আফগানেরা তাঁহার যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলে তিনি কোনরূপে কিছু কিছু মূল্যবান সম্পত্তি লইয়া সপরিবার

বাঙ্গালায় পলাইয়া আসেন এবং চিত্রপুরে বসবাস করিতে থাকেন। এখানে তিনি জয়মঙ্গলার এবং চিত্রেশ্বরীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া নরসিংহ নামক জনৈক মোহান্তের হস্তে সমর্পন করেন।[২] অনুমান ১৬৩৭ খ্রীঃ মনোহর ঘোষ পরলোক গমন করেন। কথিত আছে, এই সময় দস্যুরা সর্ব্বদাই চিত্রেশ্বরীর নিকট নরবলি প্রদান করিত, মনোহরের পুত্র রামসন্তোষ ঘোষ এই নিষ্ঠুর দৃশ্য অসহ্য বোধ করায় চিত্রপুরের বাস উঠাইয়া বর্দ্ধমানে বাস করেন। তিনি বিদ্বান লোক ছিলেন, অতি সহজে পর্টু'গীজ ভাষা শিক্ষা করিয়া ইউরোপীয় বণিকদিগের কুঠীতে চাকুরী করিতেন। প্রথমে তাঁহার গৃহের নিকটবর্ত্তী ডাচদিগের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়, পরে ফরাসী ও ইংরাজ কুঠীতেও কার্য্য করিয়াছিলেন।

বিপুল ধনবান বলিয়া বর্দ্ধমানে একদিন তাঁহার গৃহে দস্যুতা হয়, তাহাতেই তিনি ৭০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেন। তাঁহার পুত্র বলরাম ঘোষ জননী সহ পলায়ন করিয়া চন্দননগরে আগমন করেন এবং তথায় ব্যবসা বাণিজ্য দ্বারা বিস্তর ধন সঞ্চয় করিয়াছিলেন। তথাকার শাসনকর্ত্তা মুসে ডুপ্লেক্স বলরামের বুদ্ধি-বিদ্যার পরিচয় পাইয়া অনেক কার্য্যে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া পিতার যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহা স্মরণ থাকায় বলরাম ধনবান হইয়াও আপনি সামান্যবিত্ত গৃহস্থের ন্যায় কালযাপন করিতেন। ১৭৫৬ খ্রীঃ ৯৫ বৎসর বয়সে তিনি রামহরি ও শ্রীহরি নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক যাত্রা করেন। ইংরাজেরা চন্দননগর জয় করিলে তাঁহার পুত্রদ্বয় কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন। এই বংশের ২৫শ পুরুষ বাবু লোকনাথ ঘোষ নিজ বংশাবলী মধ্যে লিখিয়াছেন, কাঁটাপুকুরে আসিয়া শ্রীহরি ঘোষ সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করেন। রামহরি ঘোষ রাজা গোপীমোহন দেবের সহোদরাকে পঞ্চম বারে ও বাহির সিমলা শিবনারায়ণ দাসের লেনের বিনোদরাম দাসের কন্যাকে ষষ্ঠবারে বিবাহ করেন। ইঁহারই গর্ভে আনন্দমোহনের জন্ম হয়, ইনি প্রথম কাবুল যুদ্ধে কমিসরিয়েট গোমস্তা হইয়া যান ও বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইঁহার কোন সন্তান নাই।

ইংরাজেরা মীরকাশিমের নিকট মুঙ্গের জয় করিলে শ্রীহরি ঘোষ উক্ত সহর ও দুর্গরক্ষকের দেওয়ান হইয়াছিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে দেওয়ান হরি ঘোষও বলিত।

উপরে তাঁহার যে অন্ন বিতরণের কথা লেখা হইয়াছে, তাহা কাঙ্গালীভোজনের মত নহে। আপনি ভাল রকম খাইয়া আশ্রিতদিগকে সামান্যভাবে

খাওয়াইলে, পূর্ব্বকালের লোকদিগের পক্ষে অত্যন্ত নিন্দার কথা হইত, সুতরাং হরি ঘোষ নিজের মত তাঁহার "গোয়ালের সমস্ত গরু"-গুলিকেও খাইতে দিতেন। আমাদের সময় ইহা বিশেষ গৌরবের কথা! এই সকল গরুগুলি যে কেবল হরি ঘোষের জাব খাইয়াই আশীর্ব্বাদ করিতেন, তাহা নহে, ইঁহাদের পিতৃদায়, মাতৃদায়, কন্যা পুত্রদায় সমস্তই তাঁহার মস্তকের উপর দিয়া যাইত। তিনি এমন অদ্ভুত দয়ালু প্রকৃতির লোক ছিলেন যে, অকাতরে এই সকল ভারবহন করিতেন। পরিশেষে এই দয়াই তাঁহার সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছিল। তিনি জনৈক আত্মীয়ের জামীন হন, উক্ত আত্মীয় গা ঢাকা দেওয়ায় দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের যথাসর্ব্বস্ব কোম্পানিতে বাজেয়াপ্ত হয়, তিনি মনোদুঃখে কাশীধামে যাত্রা করেন, তথায় ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে কাশীপ্রাপ্ত হন। চোরবাগানের সুদক্ষ হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক বাবু যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ দেওয়ান শ্রীহরি ঘোষের বৃদ্ধ প্রপৌত্র। ভারতের প্রধান প্রধান অনেক প্রাচীন বংশের বিবরণ-লেখক বাবু লোকনাথ ঘোষও ইঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের পৌত্র।

পূর্ব্বে যে বারাণসী ঘোষের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তিনিও ইঁহাদেরই জ্ঞাতি। মনোহর ঘোষের নিজ কনিষ্ঠ সহোদর গণেশচন্দ্র ঘোষের পুত্র রাধাকান্ত ঘোষ। বারাণসী ঘোষ তাঁহারই জ্যেষ্ঠ পুত্র, তিনি ইংরাজীতে দক্ষ থাকায় ২৪ পরগণার কালেক্টর আইন আকবরি প্রভৃতির অনুবাদক গ্লাড্‌ইন সাহেবের দেওয়ান থাকিয়া অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। ইনি কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের পূর্ব্ব-পুরুষ শান্তিরাম সিংহের কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সিংহ মহাশয়ের বাটীর নিকট বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারই নামানুসারে তাঁহার বাটীর সম্মুখে রাস্তাটী বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হয়। বেলী সাহেবের কৃত ১৭৮৪ সালের ম্যাপে এই রাস্তাটী প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত খোলা ছিল না, দেখিলে অনুমান হয়, শান্তিরাম সিংহের বাটী হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত খোলা ছিল। সে সময় উহা প্রাণকৃষ্ণ বাবুর রাস্তা বলিয়া নাম ছিল। বোধ হয়, বারাণসী বাবু কাঁসারীপাড়ার দিকে খরিদ করিয়া দিয়া রাস্তাটী খুলিয়া দেওয়ায় তাঁহারই নামে রাস্তার নাম হইয়াছে।

সে সময় কলিকাতায় দস্যুদল নির্ভয়ে সদলে মশাল জ্বালিয়া দস্যুবৃত্তি করিয়া বেড়াইত। রঘুনাথ, বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, এই তিনজন প্রসিদ্ধ দস্যুদলপতি ছিল। বিশ্বনাথের নিবাস ডুমুরদহ, তাহাকে লোকে বিশ্বনাথ বাবু বলিত। সে পাল্কী চড়িয়া ডাকাতী করিতে যাইত এবং গৃহস্থকে পূর্ব্বে পত্র লিখিয়া কখন সে

উপস্থিত হইবে, তাহা পূর্ব্বে জানাইয়া রাখিত। বারাণসী ঘোষকেও ঐরূপ জানান হইয়াছিল, বারাণসী ঘোষ দস্যুপতির পত্র পাইয়া বিষম চিন্তায় ও ভয়ে ব্যাকুল হইলে তাঁহার খানসামা বলিল, আপনার কোন ভয় নাই, আপনি বাটীর সমস্ত লোকজন লইয়া অন্যত্র গমন করুন, আমি একাকী সমস্ত দস্যু তাড়াইবার ভার লইলাম। ঘোষ মহাশয় অগত্যা তাহারই পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ভৃত্য সুশিক্ষিত তীরন্দাজ ছিল, সে কতকগুলি তীর এবং একটী ধনু লইয়া সদর দ্বার খুলিয়া দস্যুদিগের অপেক্ষায় রহিল। যথাকালে বিশ্বনাথ বাবুর পাল্কী আসিয়া নামিল, অসংখ্য দলবল মশাল জ্বালিয়া মালসাট মারিতে লাগিল, সদর দ্বার খোলা দেখিয়া বিশ্বনাথের কিছু ভয় হইয়াছিল। সে একটু চিন্তিত হইয়া কি করা উচিত, তাহা ভাবিয়া ঠিক করিবার জন্য নিজ ভৃত্যকে তামাক সাজিতে আজ্ঞা করে। পাল্কীর মধ্যে আলবোলার উপর কলিকাটী বসিবামাত্র একটী তীর আসিয়া কলিকাটী কাটিয়া ফেলিয়া দিল। বিশ্বনাথ হাসিয়া বলিল, ও বুঝিয়াছি, আচ্ছা আর একটী কল্কে দে। সেটা আসিলে বলিল, বাবা আরবারে বুঝিতে পারি নাই, তুমি লক্ষ্য করিয়া কল্কে কাটিলে, কি হঠাৎ লাগিল, এবার কল্কে কাটিতে পারিলে বুঝিতে পারিব। তৎক্ষণাৎ আর একটী তীর আসিয়া কলিকাটীর সেই স্থানটী কাটিয়া দিল। তখন বিশু বাবু তাহার তীরশিক্ষাকে ধন্যবাদ দিয়া বলিল, যেখানে এমন সুশিক্ষিত লোক আছে, সেখানে আমি ডাকাতী করি না। তুমি বাহিরে এস, তোমার সাহত আলাপ করিব। কিন্তু ভৃত্যের বাহিরে যাইতে সাহস হইল না, তখন বিশ্বনাথ তাঁহাকে অভয় দিয়া আপনার চিৎপুরের বাগানের আড্ডায় যাইতে নিমন্ত্রণ করিয়া যায়। কথিত আছে, তাহার পর হইতে বারাণসী ঘোষের সহিত বিশ্বনাথ বাবুর খুব সদ্ভাব হইয়াছিল।[৩]

১. জব চার্ণক হুগলীতে থাকিবার সময় এখানে একটী হাট বসান উদ্যান প্রস্তুত করেন, তাহা হইতে দেশীয়রা প্রথমে ঐ স্থানকে চার্ণক বলিত, পরে ১৭৭২ কে সালে চার্ণকে সৈন্যাবাস স্থাপিত হইবার পর উহা বারাকপুর নামে অভিহিত হইয়াছে। বারাকপুরের উত্তর-পুর্ব্ব পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র স্থানকে চন্দন-পুকুর বলে।

২. বাবু লোকনাথ ঘোষ তাঁহার Indian Chiefs নামক গ্রন্থে সর্ব্বমঙ্গলা

লিখিয়াছেন, কিন্তু সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় যে কয়খানি কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে সকলগুলিতেই জয়মঙ্গলা বলিয়া উল্লেখ আছে এবং তাহার উচ্চ মন্দির বহুদূর হইতে দেখা যাইত। বোধহয়, মনোহর ঘোষ ঐ মন্দির সংস্কার করিয়া দিয়া থাকিবেন।

৩. সেকালের ডাকাতীর অনেক গল্প আছে সময়ান্তরে তাহা প্রকাশিত হইবে।

কয়েকটি প্রাচীন পরিবার

৩

আর একজন পুরাতন অধিবাসী রামধন ঘোষের নিবাস ছিল শ্যামবাজারে। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নাম জানি না, কিন্তু বহু পুরুষ ঐখানে বাস করিতেন। এক্ষণে যে রাস্তাকে বাগবাজার ষ্ট্রীট বলে, প্রথমে তাহা গন্ পাউডার ফ্যাক্টরী রোড অর্থাৎ বারুদখানার রাস্তা বলিয়া পরিচিত ছিল। এখন বাগবাজার ষ্ট্রীট চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছে, পূর্ব্বে তাহা ছিল না। পেরিং সাহেবের বাগানের পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত সাধারণ রাস্তা ছিল, উহা বর্ত্তমান হরলাল মিত্রের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত,তাহার পর বাগানের দক্ষিণ দিয়া একটি সুঁড়িপথ মাত্র চিৎপুর রোডে গিয়া মিশিয়াছিল। ১৭৫২ সালের ১১ই ডিসেম্বর কোম্পানি উহা প্রকাশ্য নীলামে বিক্রয় করেন, হলওয়েল সাহেব দুই হাজার পাঁচ শত টাকায় উহা ক্রয় করিয়াছিলেন। তাহার পর ঐ স্থানে বারুদখানা নির্ম্মিত হয়। বৃদ্ধেরা বলেন, ৬০।৬৫ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহারা বারুদখানার ভগ্নাবশেষ এবং কলের বড় বড় লৌহ-খণ্ড দেখিয়াছেন। উহার মধ্যে একটি সুবিস্তীর্ণ দীঘি ছিল, রামধন ঘোষের চড়কগাছ তন্মধ্যে সমস্ত বৎসর নিমগ্ন থাকিত। বাবু নন্দলাল বসুর বাটীর পূর্ব্বাংশে রাস্তার ধারে এই চড়ক হইত, আমরা বাল্যকালে ইহাতে উপর উপর চারিটী মাচা বাঁধিয়া ১৬ জন লোককে পিঠ ফুঁড়িয়া ঘুরিতে দেখিয়াছি, ইহাকে ১৬ চড়কী বলিত, আর কোথাও ১৬ চড়কী হইত না। সেই পেরিংস গার্ডেন বা বারুদখানার ভূমিতে আমরা বাল্যকালে বাহাদুরী শালকাঠের গোলাসমস্ত দেখিয়াছি। এখন সেই স্থানে মিউনিসিপালিটীর মেটাল ইয়ার্ড অর্থাৎ খোয়া রাখিবার মাঠ হইয়াছে। শ্যামবাজারের কাছে, বাগবাজার ষ্ট্রীটের উত্তর দিকে ৫৫ নম্বর একটী প্রান্তর দেখা যায়, তাহাই রামধন ঘোষের বাস্তুভিটা। রাস্তার উপর এখনও ফটকের ভগ্নাংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এই রাস্তার উভয় পার্শ্বে প্রায় সমস্ত জমি তাঁহারই ছিল। ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, আত্মীয়স্বজনদিগকে অনেক ভূমি দান করিয়া বাস করাইয়াছিলেন, গঙ্গার ধারেও তাঁহার অনেক জমি ছিল। পূর্ব্বোক্ত বলরাম ঘোষের পুত্রদিগকে ইনিই কলকাতায় আনিয়া বাস করাইয়াছিলেন, শান্তিরাম ঘোষ ইঁহারই জ্ঞাতি। ইঁহার আর এক জ্ঞাতি ছিলেন

বাবু মতিলাল ঘোষ। উক্ত রাস্তায় ২৫ নম্বর তাঁহার বাটী, এখনও তাহার কতক অংশে সেকালের ক্ষুদ্র ইটের গাঁথনি দেখিতে পাওয়া যায়। সেকালের লোক কিরূপ রহস্যপ্রিয় ছিলেন, তাহার দু-একটী দৃষ্টান্ত দিবার জন্য আমরা মতি বাবুর উল্লেখ করিতেছি। তাঁহাকে আমরা বাল্যকালে অশীতিপর বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছি। মতি ঠাকুরদাদা বলিয়া ডাকিতাম, আমাদের প্রতি তাঁহার সাদর আমোদের উপদ্রবে অনেক সময় না কাঁদিয়া থাকিতে পারিতাম না। একদিন পথে ধরিয়া বলিলেন, ওরে তুই কোন্ স্কুলে পড়িস্? কম্বুলিয়াটোলার বাঙ্গালা পাঠশালে পড়ি, শুনিয়া বলিলেন, আচ্ছা দেখ্, যখন হিন্দু কলেজে পড়িবি, তখন তার মেঝে শুঁকিয়া দেখিস্, তোর মতি ঠাকুরদাদার প্রস্রাবের গন্ধ পাবি। আমরা বলিলাম, ঠাকুরদাদা সে কি রকম? উত্তরে বলিলেন, "একদিন রাত্রে ঐ পথ দিয়া আসিতেছিলাম, তখন হিন্দু কলেজের বনিয়াদ খোঁড়া হইতেছে, সেইখানে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়া ভাবিলাম, বেশ করিলাম, এরপর যখন ছেলেরা এখানে পড়িয়া বিদ্বান হইবে, বড় লোক হইবে, তখন তাহাদের এই কথা বলিব। এখন কবে মরিব তাহার ত ঠিকানা নাই, তাই তোকে বলিয়া রাখিতেছি।" একদিন মতি বাবু কুঠী যাইতেছেন (পূর্ব্বে অফিসে যাওয়াকে কুঠীযাওয়া বলিত), মুসলমানদের মহরম উপলক্ষে চিৎপুর রোড লোকে লোকারণ্য। বর্ষাকাল, বৃষ্টি হইতেছে, চিৎপুর রোডের কাদা, একশত বৎসরের উপরের কথা বলিতেছি, তখন এর দশা দশগুণ বা তদধিক ছিল বলিলেও বলা যায়। কারণ সে সময় রাস্তাটা পাকা হয় নাই, কাঁচা ছিল। মতি বাবু দেখিলেন, এ বৃষ্টি কাদায় লোকের ভীড় ঠেলিয়া যাওয়া বড় কঠিন, মহরমের তামাসাটাও ভাল করিয়া দেখা চাই। একটী ঝাঁকামুটে ডাকিলেন, সে মাথায় করিয়া লইয়া যাইবে বন্দোবস্ত হইল। তিনি খর্ব্বাকৃতি, ক্ষীণাঙ্গ ও গৌরবর্ণ পুরুষ ছিলেন, মুখাকৃতি অতি সুন্দর ছিল, মুটে তাঁহাকে মাথায় লইতে কিছুমাত্র দ্বিধা করিল না। মতি বাবু গোলপাতার ছাতাটী হাতে লইয়া ঝাঁকায় বসিলেন, পথের লোক এই নূতন সং দেখিয়া নানা-জনে নানাপ্রকার বিদ্রূপ ও আমোদ করিতে লাগিল, কত পরিচিত লোক নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল, তাঁহার ভ্রূক্ষেপ নাই, বরং মধ্যে মধ্যে স্থান বিশেষে অঙ্গভঙ্গী করিতেও ছাড়িলেন না। এই অবস্থায় কুঠী গিয়া উপস্থিত হইলেন। সাহেবেরাও একটু আমোদ সম্ভোগ করিয়া লইলেন। মতি বাবুর পুত্র ক্ষেত্রমোহন ঘোষ। তাঁহার বাটীর পাশ দিয়া ড্রেন পাইপ বসিবে। দরজীপাড়ার কুমুদ মিত্রের নিকট সুশিক্ষা পাইয়া মিউনিসিপালিটীর চেতনা লাভ হইয়াছে। তাই যে যে

রাস্তায় ড্রেন পাইপ বসান, তাহার দুই পাশের বাটীর বনিয়াদ অগ্রে পরীক্ষা করেন। মতিবাবুর বাটীর বনিয়াদ খুলিয়া চক্ষুস্থির! মাটীর নীচে এক হাত বা দেড়হাত মাত্র বনিয়াদ, মিউনিসিপাল ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ক্ষেত্র বাবুর উপর তম্বি করিয়া বলিতেছেন, তোমার বাড়ীর বনিয়াদ এত কম কেন? ক্ষেত্রবাবু উত্তর করিলেন, সাহেব, আমার উপর রাগ কর কেন, নির্ব্বোধ প্রপিতামহ এই বোকামী করিয়া গিয়াছেন। যদি পার তো তাঁহাকে সেখান থেকে ধরে এনে ফাঁসী দাও, আর সাহেব একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি ত একজন মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, বল দেখি, কখনও কাহারো বাড়ী গাছের মতন শিকড়শুদ্ধ উপ্‌ড়ে পড়েছে দেখেছ বা শুনেছ? আজ তোমরা তাঁহাদের বনিয়াদ ঘেঁসিয়া খাল কাটিবে, এ যদি তাঁরা জানিতেন, তাহলে সেই রকম বুঝিয়া কাজ করিতেন।

রামধন ঘোষের পুত্র, গোবিন্দরাম মিত্রের সহকারী ছিলেন। কোম্পানি যখন কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানের জমীদারদিগের নিকট নানা কৌশলে ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করেন বা হস্তগত করেন, তখন গোবিন্দরাম মিত্র হুগলীর দেওয়ান মহারাজা নন্দকুমারের নিকট, "কালীঘাট কেন কোম্পানির দখলে আসিবে না" বলিয়া যে পত্র লেখেন, তাহা রামধন ঘোষের ছেলের মারফতে পাঠান হইয়াছিল। রামধন ঘোষের দুই পুত্র ছিলেন, দুঃখের বিষয়, আমরা তাঁহাদের কাহারও নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই। উঁহাদের একজনেরও পুত্র জন্মে নাই, একজনের একটী অপরের দুইটীমাত্র কন্যা জন্মিয়াছিল। সুবিখ্যাত বাবু রামদুলাল সরকার জ্যেষ্ঠের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করায় রামধনের অর্দ্ধেক সম্পত্তি সাতু লাটু বাবু লাভ করিয়াছিলেন। জলেই জল বাধে! ঘোষ মহাশয়েরা এত বাবু ছিলেন, যে ঘৃত ভিন্ন সর্ষপ তৈল কখন ব্যঞ্জনাদিতে দেওয়া দূরে থাকুক, কেহ সর্ষপ তৈল খাইতেছে, ইহা কানে শুনিতে পারিতেন না। শুনা যায়, সাতু লাটু বাবুর এক মাসী একদিন যেমন শুনিলেন, সাতু সর্ষপ তৈল মাখিয়া আলুভাতে খায়, তিনি অমনি সেইস্থানে বমন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

যে শঙ্কর ঘোষের লেন, তাঁহাকে আড়পুলীর শঙ্কর ঘোষ বলিত, সে সময় এ স্থানকে আড়পুলী বলিত, আড়কুলী নামে আর একটী স্থান পটলডাঙ্গার দক্ষিণে ছিল। এই শঙ্কর ঘোষের পিতামহ ১৭৫৮ সালে গোবিন্দপুর হইতে উঠিয়া আসিতে বাধ্য হন।

কাঁটাপুকুরের বসু বংশও অতি প্রাচীন। যে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট শ্যামবাজার ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোডে মিশিয়াছে, তাহার উত্তর দিকে ইঁহাদিগের বৃহৎ বাটী,

উদ্যান এবং বাটীর সম্মুখে পূর্ব্বদিকে চারিদিক সানবাঁধা গজগীরি পুষ্করিণী ছিল। অর্ম্মির ম্যাপে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষের নির্ম্মিত অট্টালিকার চিহ্ন অঙ্কিত আছে। বাগবাজার ষ্ট্রীট বাবু নন্দলাল বসুর বাটীর দক্ষিণ হইতে রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যে কাঁটাপুকুর লেন হইয়াছে, তাহার দক্ষিণ অংশ উঁহাদের বাগানের উপর দিয়া গিয়াছে। কাঁটাপুকুর লেনের দক্ষিণ-পশ্চিম পার্শ্বে উক্ত বসু মহাশয়দের পুষ্করিণী প্রায় ১০।১২বৎসর ভরাট হইয়া এখন খালি আছে। কলুটোলার শোভারাম বসাকের লেনের বাবু দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক উক্ত পুষ্করিণী খরিদ করিয়া ভরাট করিয়াছেন, পুষ্করিণীর চারি পাড়ে সুন্দর ছোট ছোট ইমারত নির্ম্মিত হইয়াছে। কাঁটাপুকুর লেনের পূর্ব্ব-দক্ষিণে যে পুষ্করিণী ও পুরাতন অট্টালিকা দেখা যায়, যাহার দ্বার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের উপর, তাহাও বসু মহাশয়দের বাটী, এক্ষণে ইঁহারাই আপনাদিগকে কাঁটাপুকুরের বসু বলিয়া পরিচয় দেন, কারণ বাবু রামকান্ত বসুর সহিত পুরাতন কাঁটাপুকুরের বসু বংশের পুংবংশ লোপ হইয়াছে। রামকান্ত বসু অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে জীবিত ছিলেন। বর্ত্তমান কাঁটাপুকুর ও বসুপাড়ার বসু বংশ ইংরাজ আগমনের অনতিপরে দেউলপুর হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ২১ পর্য্যায় কৃপারাম বসু ও বিনোদরাম বসু, দুই সহোদর বসুপাড়ায় এবং তাঁহাদের খুল্লতাত দয়ারাম বসুর পুত্র রামানন্দ বসু কাঁটাপুকুরে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে ইঁহাদের ছয় সাত পুরুষ চলিতেছে। শ্যামবাজারের কৃষ্ণরাম বসুর লেন, যাহা শ্যামবাজার ট্রাম ডিপোর পার্শ্বে রহিয়াছে, এই কৃষ্ণরাম বসুও অতি পুরাতন অধিবাসী। উক্ত ট্রাম আস্তাবলের পশ্চিমে তাঁহার বাটীর সুবিস্তীর্ণ ভিটা পড়িয়া আছে। অনুমান ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার বাটীর ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যাইত।

ইংরাজদিগের অনতিকাল পূর্ব্বে ভদ্রকালী গ্রাম হইতে আর একজন বসু মহাশয় সপরিবারে কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন, তাঁহারও নাম কৃষ্ণরাম বসু। তিনি শেঠ বসাকদিগের সুতানুটীর ইজারাদার ছিলেন। বর্ত্তমান সুবাবাজার ষ্ট্রীটের নাম পূর্ব্বে কেটোঘাটার রাস্তা ছিল, এই রাস্তার পূর্ব্ব-দক্ষিণ কোণে এখন যে স্থানকে দরমাহাটা বলে, তাহার সম্মুখে বেণেটোলার উত্তর বহুদুর দীর্ঘ-প্রস্থ তাঁহার বাটীর সীমানা ছিল। রাস্তা হইতে কিয়দ্দূর দক্ষিণে তাঁহার চারিখানি গৃহ এবং একটী বৃহৎপুষ্করিণী ছিল। উহার একখানি ঠাকুরবাটী, একখানি কাছারী, একখানি বৈঠকখানা, আর একখানি পারিবারিক বাস-বাটী।

অম্মির ম্যাপে উক্ত পুষ্করিণী এবং চারিখানি বাটীরই চিহ্ন অঙ্কিত আছে। এখন সে পুষ্করিণী নাই বটে, কিন্তু সেই স্থানকে আজিও বৃদ্ধেরা বোসপুকুর ও ভিটাকে বোসের পোড়ো বলিয়া থাকেন। উক্ত ভিটার উত্তরে সোভাবাজার ষ্ট্রীটে ৩৭ নম্বরে যে একখানি প্রকাণ্ড বাটী দেখা যায় যাহাতে এক্ষণে "এরিয়ান ইনস্টিটিউসন" নামক বিদ্যালয় রহিয়াছে, উক্ত বাটী কৃষ্ণরাম বসুর সর্ব্বকনিষ্ঠ প্রপৌত্র নয়নচাঁদ বসু নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ বলেন, হলওয়েলের ডেপুটী সুবিখ্যাত গোবিন্দরাম মিত্র এই কৃষ্ণরাম বসুরই একজন কর্ম্মচারী ছিলেন। গোবিন্দরামের অদৃষ্ট ফিরিবার গল্প এইরূপ শুনা যায়ঃ—একদিন প্রাতঃকালে কৃষ্ণরাম গঙ্গাস্নান করিয়া পুষ্পাদি হস্তে ঠাকুরবাড়ী পূজা করিতে যাইতেছেন, এমন সময় দুই মুসলমান স্ত্রী পুরুষ বিবাদ করিতে করিতে জমীদারের নিকট মোকদ্দমা করিবার জন্য উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া আসিতেছিল, পুরুষের উপদ্রবে স্ত্রীলোকটি লজ্জাসম্ভ্রমহীন হইয়া আসিতেছিল, কৃষ্ণরাম কোথায় দেবদর্শন করিবেন, না প্রাতঃকালে এই বীভৎস দৃশ্য দেখিতে হইল, ইহাতে তিনি নিতান্ত মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া জমীদারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দরামকে উহা প্রদান করেন। পরে চার্ণক আসিলে তিনি গোবিন্দরামকে বিশেষ উপযুক্তবোধে আপন কার্য্যে নিয়োগ করেন। গোবিন্দরাম মিত্রের জীবনী-লেখকের সহিত এ কথার কিছুই মিল হয় না। কৃষ্ণরাম বসুর পুত্র লালবিহারী, তাঁহার পুত্র জগন্নাথ, তাঁহার তিন পুত্র ভবানীচরণ, হলধর, ও নয়ানচাঁদ, ভবানীর পুত্র মধুসূদন, হলধরের পুত্র বেণীমাধব ও গোপাল। নয়ানচাঁদের তিন পুত্র, রামনারায়ণ, শ্রীনারায়ণ ও শিবনারায়ণ। রামনারায়ণের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ও নবীন, শ্রীনারায়ণের পুত্র গোপালদাস বসু। ইনি বহুকাল ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি বিদ্যালয়ের একজন উপযুক্ত শিক্ষক ছিলেন। শিবনারায়ণের তিন পুত্র ব্রজজীবন, বিহারীলাল ও শ্যামলাল বসু, ইঁহারা জীবিত আছেন।

বাগবাজারের দে সরকারেরাও অতি প্রাচীন পরিবার, ঐ স্থানে বাস করিতেছেন। যদিও আমরা বহুদূর পর্য্যন্ত ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের নাম সংগ্রহ করিতে পারি নাই, ইঁহারা স্মরণাতীত কাল হইতে ঐ স্থানে থাকিয়া গঙ্গাতীরে গুড়ের ব্যবসায় করিতেন। আমরা রাজারাম দে পর্য্যন্ত নাম পাইয়াছি, ইঁহার পুত্র গুপীচরণ, তিনি যখন অতি বৃদ্ধ, তখন রাজা নবকৃষ্ণ সুতানুটীর জায়গীর প্রাপ্ত হন, গুপীচরণের নামেই খাজনার দাখিলা ছিল। তাঁহার পুত্র গোরাচাঁদ দে সরকার; এখনও লোকে ঐ বাটীকে গোরাচাঁদ সরকারের বাটী বলিয়া থাকে।

গোরাচাঁদ বাংসালের অর্থাৎ প্রথম জাহাজ নির্ম্মাণের ডকের দেওয়ান হইয়াছিলেন। ঐ কারখানা ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত এবং ১৮০৮ খ্রীঃ বন্ধ হয়। অপ্মির ম্যাপে গোরাচাঁদ দের বাটীর চিত্র অঙ্কিত আছে। তাঁহার চারি পুত্র, রাধানাথ, পঞ্চানন, রামগোপাল ও রসিকলাল। রামগোপালের পুত্র বাবু ক্ষেত্রমোহন দে সরকার মহাশয় এখনও জীবিত আছেন, তাঁহার বয়ঃক্রম এক্ষণে ৮৫ বৎসর। রাধানাথের পুত্র বৃন্দাবন, তৎপুত্র শম্ভুনাথ, তৎপুত্র বাবু কালাচাঁদ দে কলিকাতার একজন পুরাতন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার, এখন বাগবাজার ষ্ট্রীটের পূর্ব্ব সীমায় বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন।

ইংরাজ আগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আর এক জন বসু মহাশয় মাইনগর হইতে বাগুয়াবাজারে আসিয়া বাস করিতেছিলেন। শুনা যায়, ইঁহার দ্বারায়ই বসুপাড়ার সৃষ্টি। ইঁহার নাম নিধুরাম বসু, ইঁহাকে দেওয়ান বলিয়া সম্বোধন করিত। কোথায় কাহার দেওয়ান ছিলেন, তাহা আমরা শুনি নাই। তিনি যেমন ধনবান, তেমনি ক্ষমতাবান লোকও ছিলেন। জ্ঞাতিদিগকে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় বাস করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। হাফ আখড়াই নামক উচ্চ সঙ্গীত সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক মোহনচাঁদ বসু এই নিধিরাম বসুরই প্রপৌত্র ছিলেন। আমরা শৈশবকালে মোহনচাঁদ বসু মহাশয়কে দেখিয়াছি, তখন তাঁহার বয়স ৬০।৭০ বৎসরের কম হইবে না। তিনি প্রফুল্ল-চিত্ত লোক ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘাকৃতি, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, দৃঢ় গঠন, ঘোরাল মুখ, মস্তকে বাবরী কাটা চুল ছিল। আমরা যখন দেখিয়াছি, তখন পিনেসে তাঁহার নাক বসিয়া গিয়াছিল, সঙ্গীত করিবার ক্ষমতা নাই, কিন্তু তখনও ছাত্রদিগকে সুর বুঝাইয়া দিতেন। তিনি গাহনার স্থলে উপস্থিত থাকিলে তাঁহার ছাত্রেরা অপর পক্ষকে কিছুমাত্র গ্রাহ্য করিত না, তিনি প্রথমে দলের কর্ত্তাকে গানটী একবার গাইতে বলিতেন, সমস্তটী শুনিয়া যেখানে যে খোঁচখাঁচ থাকে, নিজে নাকিসুরেই সেগুলি এমন বুঝাইয়া দিতেন যে, লোকে শুনিয়া যেন আপ্যায়িত হইত। আমাদের বাড়ীতে রথ হইত, তদুপলক্ষে হাফ আখড়াইওয়ালা গায়কেরা মোহনচাঁদী সুরে সংকীর্ত্তন করিতেন, জ্যেষ্ঠতাত বাদক-শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় অভয়চরণ দত্ত মহাশয় এবং স্বয়ং মোহনচাঁদ বসু উপস্থিত থাকিবেন জানিয়া কলিকাতার ও নিকটবর্ত্তী স্থানের সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতপ্রিয় ভদ্রলোকেরা আদ্যোপান্ত পথে গায়কদিগের সহিত বর্ত্তমান থাকিতেন।

বলরাম মজুমদার।—ইংরাজ আগমনের পূর্ব্বে আকনার রামচন্দ্র ঘোষ বাগুয়া

মৌজার তহশীলদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আসেন, সভাবাজারের সম্মুখে বর্ত্তমান কুমারটুলির দক্ষিণে তিনি বাস করিয়াছিলেন। কার্য্যসূত্রে তিনি নবাব সরকার হইতে মজুমদার উপাধি প্রাপ্ত হন। রামচন্দ্র নিজে নিঃসন্তান ছিলেন, তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদরের পৌত্র বলরাম মজুমদার ইংরাজদিগের নিকট কার্য্য করিয়া বিশেষ খ্যাতাপন্ন হন। কেটোঘাটার রাস্তা অর্থাৎ বর্ত্তমান সভাবাজার ষ্ট্রীট হইতে বনমালি সরকারের ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত একটী অতি প্রাচীন পথ, যাহা ১৭৫৭ সালের ম্যাপেও দেখা যায়, বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত। তাঁহার বংশীয়েরা এক্ষণে নন্দরাম সেনের ষ্ট্রীটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহে বাস করিতেছেন।

শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায়।—বাবু গৌরদাস বসাক কলিকাতার প্রায় যাবতীয় পুরাতন বাজার, বাগান ও দীঘি সেঠ বসাকদিগের কীর্ত্তি বলিয়া দাওয়া করিয়াছেন। শ্যামবাজার, শ্যামপুকুর, সুবাবাজার তাঁহাদের বলিয়া থাকেন, শ্যামবাজারটী শ্যামসুন্দর ঠাকুরের, শ্যামপুকুরটিও তাই, সুবাবাজারের নাম শোভাবাজার, তাহা শোভারাম বসাকের স্থাপিত বলিয়াছেন। কিন্তু অর্ম্মির ম্যাপে শ্যামবাজারের স্থান এবং শ্যামপুকুরটী অতি পরিষ্কার দেখা যায়। বেলী সাহেবের ম্যাপে শ্যামবাজার স্থানটী হাতিবাগানের মোড়ে, সভাবাজার রাজবাটীর স্থানে সভাবাজার এবং যেখানে এখন সভাবাজার সেই স্থানে নবকৃষ্ণের বাজার বলিয়া লিখিত আছে। আপজন সাহেবের ১৭৯২ খ্রীঃ ম্যাপে কম্বুলিয়াটোলার রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীটের দক্ষিণে শ্যামবাজার এবং বর্ত্তমানে চিৎপুর রোডে গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ের দক্ষিণে সুবাবাজারের স্থান দেখা যায়। এই স্থানে অতি পূর্ব্বে একটা বাজার ছিল, তাহা আমরা বৃদ্ধদিগের মুখে শুনিয়াছি, আমরা বাল্যকালে এখানে কাপড়ের হাট, সেকেলে বেতের ছাতি নির্ম্মাণের দোকান প্রভৃতি দেখিয়াছি। দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট হইতে মসজিদ-বাড়ী ষ্ট্রীট পর্য্যন্ত যে রাস্তাটী জগন্নাথ শুড়ীর লেন বলিয়া পরিচিত, তিনি শুড়ী নন, সুরুই, জাতিতে তাঁতী, উপরোক্ত বাজারে তাঁহার বৃহৎ দোকান ছিল। পূর্ব্বে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় নামক একজন ক্ষমতাবান ব্রাহ্মণ বাস করিতেন, তাঁহার বাটীর নিকটস্থ তাঁহার খোদিত দীঘিই শ্যামপুকুর, শ্যামবাজারও তাঁহারই। তাঁহার পুত্র মনোহর মুখোপাধ্যায় একটী সুদীর্ঘ বালাখানা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বালাখানার অপর নাম বৈঠকখানা। অর্ম্মির ম্যাপে উক্ত বালাখানার চিত্র অঙ্কিত আছে। গরাণহাটার রাজেন্দ্র মল্লিকের নূতন বাজারের উত্তরে পুরাতন একহারা সুদীর্ঘ একটী দ্বিতল গৃহ, তাহা আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। মনোহর

মুখুর্য্যের বালাখানাও তদ্রূপ ছিল। এখন যে রাস্তাটী রাজা হরেন্দ্রকৃষ্ণের লেন নাম হইয়াছে, ঐ রাস্তাটী অতি প্রাচীন, উহার পশ্চিমদিকে উত্তর-দক্ষিণে লম্বমান মনোহর মুখোপাধ্যায়ের বালাখানাবাটী, ঐ বালাখানা হইতে উক্ত স্থানের নামও বালাখানা হইয়াছে। রাজা নবকৃষ্ণের বাটীর পূর্ব্বদিকে যে বাটী তাঁহার পিতা রামচন্দ্র ব্যবহর্ত্তা ১৭৩৭ সালের বন্যায় গোবিন্দপুরের বাটী গঙ্গায় পড়িবার পর নির্ম্মাণ করেন, সে স্থানটীকে পবনের বাগান বলিত। নবকৃষ্ণের ষ্ট্রীটের দক্ষিণে যে রাজবাটী নির্ম্মিত হইয়াছে, সেখানে একজন মা-গোঁসাই ছিলেন, রাজা তাঁহার বাটী ক্রয় করিলে তিনি ঐ স্থানের আর একটু দক্ষিণে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটের উপর বাটী নির্ম্মাণ করেন। গোস্বামীদিগের সেই বাটী আজিও আছে বটে, কিন্তু ক্রমাগত দৌহিত্রবংশের অধিকার হওয়ায় বর্ত্তমান অধিবাসীরা পূর্ব্ব-কথা কিছুই জানেন না।

স্থলভাগে কলিকাতায় আসিবার চারিটী প্রধান পথ ছিল, একটী উত্তরে চিৎপুর পাইকপাড়ার ভিতর দিয়া বরাহনগর, আড়িয়াদহ, আগরপাড়া, পানিহাটি, খড়দহ চন্দনপুকুর (বারাকপুর), মণিরামপুর, নবাবগঞ্জ হইয়া গঙ্গা পার হইয়া গিয়াছিল। আর একটী নবদ্বীপ হইতে কৃষ্ণনগরের ভিতর দিয়া নারায়ণপুর, জাগুলি, বারাশত, ও দমদমা হইয়া দক্ষিণ পাইকপাড়ার ভিতর দিয়া শ্যাম-বাজারে মিলিয়াছে। তৃতীয়টী পূর্ব্বাঞ্চল হইতে বাদার উপর দিয়া সুড়া, (সায়পল্লী), বালিয়াঘাটা ও সিয়ালদহ হইয়া কলিকাতায় আসিয়া বৈঠকখানায় মিলিত হইয়াছে। চতুর্থটী সাগরদ্বীপ হইতে কুল্পী, হাজিপুর, বজবজীয়া, বরিষা, সুরসুনা, সীতারামপুর, মুরদপুর, বেহালা, কালীঘাট, ভবানীপুর, চৌরঙ্গী, কসাইটোলা হইয়া লালবাজারে চিৎপুরের রাস্তায় মিশিয়াছিল।

এই চারিটী পথের প্রবেশদ্বারে চারিটী বিশিষ্ট বাজার ছিল দেখা যাইতেছে। ১ম বাগুয়াবাজার বা বাগবাজার, উত্তর সীমা ওল্ড পাউডার ফ্যাক্টরী রোড (বর্ত্তমান বাগবাজার ষ্ট্রীট)। পূর্ব্ব সীমা বসুপাড়া লেন, দক্ষিণ সীমা রামকান্ত বসুর ষ্ট্রীট, পশ্চিম সীমা চিৎপুর রোড। ৪০।৪৫ বৎসর পূর্ব্বে অন্নপূর্ণার বাটীর বাহিরে ২।৪ খান ফল তরকারির দোকান সেই পুরাতন বাজারের কঙ্কালস্বরূপ দেখা গিয়াছে, এখন উক্ত স্থানের মধ্যে আর একটী বাজার হইয়াছে।

২য়। শ্যামবাজার, বর্ত্তমান শ্যামবাজারের দক্ষিণস্থ রাস্তার দক্ষিণ দিকে ছিল। সার্কিউলার রোড প্রস্তুতের সময় ১৮০০ খ্রীঃ বর্ত্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দের রিপোর্টে পুরাতন বাজারগুলির

তালিকামধ্যে ঐ শ্যামবাজারকেও নূতন শ্যামবাজার বলা হইয়াছে, ইহাতে অনুমান হয়, ১৭৫০ খ্রীঃ পূর্ব্বে কম্বুলিয়াটোলাতেই পুরাতন শ্যামবাজার ছিল।

৩য়। বৈঠকখানা বাজার। এই বাজারটীই কলিকাতা ভারতবর্ষের রাজধানী হইবার প্রধান আকর্ষণ। যে ফটক দিয়া ট্রাম গাড়ী সিয়ালদহ ষ্টেসনে যাতায়াত করে, সেই দক্ষিণ ফটকের সম্মুখে সার্কিউলার রোডের চৌমাথার মধ্যস্থলে একটী বহুবিস্তীর্ণ বটবৃক্ষ ছিল। তাহার একটী শাখার নিম্নে থানা ছিল, আর একটী শাখার নিম্নে একখানি ৭০ফুট উচ্চ বৃহৎ রথ থাকিত। এ রথখানি অবশ্য সে সময়ের কোন ধনাঢ্য অধিবাসীর হইবে, তাহার সন্দেহ নাই, আমরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সন্ধান পাই নাই। সিয়ালদহ, সুঁড়া ও বালিয়াঘাটা তিনটীই যখন অতি প্রাচীন জনপদ, তখন বোধহয় উহারই কোন স্থানে রথাধিকারীর নিবাস ছিল। বাদা পূর্ব্বে সুগভীর থাকায়, পূর্ব্বাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল হইতে বড় বড় নৌকায় নানাবিধ দ্রব্য আসিয়া বালিয়াঘাটায় পৌঁছিত, তথা হইতে বলদযোগে গোবিন্দপুর, চেতলা, সুতানুটী ও বাটোরের ঘাটে চলিয়া যাইত। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র নৌকা ও তালডোঙ্গায় নিম্নশ্রেণীর বিক্রেতারা আসিয়া বালিয়াঘাটায় নামিত। এই সমস্ত বিক্রেতাদিগের সম্মিলন স্থান ছিল উপরোক্ত বৃহৎ বটবৃক্ষ। ইহার নিম্নে তাহারা দ্রব্যাদি নামাইয়া বিশ্রাম করিত, রন্ধনাদি করিত এবং সঙ্গীদিগের অপেক্ষা করিত। এত লোকের যেখানে সমাগম, সেখানে একটী সুন্দর বাজার হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? জব চার্ণক যখন হুগলীতে ছিলেন, তখনও মধ্যে মধ্যে এই বটমূলে আসিয়া দ্রব্যাদির আমদানী রপ্তানী দেখিতেন এবং পাইপ খাইতেন। বেলী এবং আপজন উভয়ের মানচিত্রেই উক্ত বটবৃক্ষের চিত্র ও বৈঠকখানা বাজারের স্থান উল্লিখিত আছে। বটবৃক্ষের অনুরোধে মহারাষ্ট্র খালকেও সরলরেখা ছাড়িয়া ঐখানে একটু বক্র হইতে হইয়াছিল। ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কুইস ওয়েলেসলি সার্কিউলার রোড নির্ম্মাণার্থ ঐ বৃহৎ বটবৃক্ষ কাটিতে আদেশ দেন।

৪র্থ। লালবাজার। ইহা পূর্ব্বে তেমন বড় বাজার ছিল না, কারণ প্রাচীনকালে এদিকে ভদ্রলোকের বাসস্থান ছিল বলিয়া কোন প্রমাণ নাই। কেবল পথিকদিগের সুবিধার জন্য একটী সামান্য রকম বাজার ছিল মাত্র। ইংরাজদিগের আগমনের সহিত ইহার শ্রীবৃদ্ধি যথেষ্ট হইয়াছিল। টিরেটা সাহেব সুন্দর ও সুবিধামত বৃহৎ বাজার ইহার উত্তরে নির্ম্মাণ করিয়া লালবাজার উঠাইয়া দেন। এই বাজার হইতে টিরেটা প্রতি মাসে দুই হাজার টাকার উপর উপস্বত্ব

প্রাপ্ত হইতেন, প্রথমে যখন বাজারটী নির্ম্মিত হয়, তখন ১০ বিঘা জমী প্রাচীর বেষ্টিত করিয়া কতকগুলি খড়ের চালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। দক্ষিণে চাউল প্রভৃতি শস্যের বড় বড় গোলা, উত্তরে কয়েকটী চুরটের কারখানা ও মাখনের দোকান, পূর্ব্বদিকে মাংসের বাজার, মধ্যস্থলে মাছ, তরকারি, ফলমূল, মসলা, তামাকু প্রভৃতি এবং হাঁস মুর্গী ইত্যাদি বিক্রয় হইত। ১৭৮৮ খ্রীঃ টিরেটা সাহেব বিলাত যাত্রাকালে আপনার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করেন, বাজারটী লটারি দ্বারা বেচিয়া এক লক্ষ ৯৬ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। পরে উহা ওয়েষ্টন সাহেবের সম্পত্তি হয়। সেইজন্য আমরা বেলী সাহেবের ১৭৮৪ সালের ম্যাপে বাজারটীর নাম টিরেটা বাজার এবং আপজন সাহেবের ১৭৯২ সালের ম্যাপে ওয়েষ্টন সাহেবের বাজার নাম দেখিতে পাই। উক্ত বাজারের বর্ত্তমান গৃহগুলি ১৮২৭ খ্রীঃ নির্ম্মিত হইয়াছে। সিমলা বাজারটীও অতি প্রাচীন, কিন্তু এখন মাণিকতলা ষ্ট্রীটে যেটীকে সিমলা বাজার বলে সেটী নয়, ঝামাপুকুর লেনের মাথায় মেছুয়া-বাজার ষ্ট্রীটের উপর রাজা দিগম্বর মিত্রের বাটীর সম্মুখে যে বাজারটীকে টিকটিকির বাজার বা পোড়া বাজার বলে, সেইটী পুরাতন সিমলা বাজার। অর্ম্মির ম্যাপে ঠিক এই স্থানে একটী বড় জায়গা পাকা ইমারত ও প্রাঙ্গণের চিহ্নে বাজার বলিয়া বুঝা যায়। বেলীর ম্যাপেও ঐ স্থানে পুরাতন সিমলা বাজার এবং বর্ত্তমান সিমলা বাজারের স্থানে নূতন সিমলা বাজার বলিয়া লিখিত আছে। হলওয়েল সাহেবের ১৭৫২ খ্রীঃ রিপোর্টে কলিকাতায় নিম্নলিখিত বাজারগুলির উল্লেখ আছে:—"সুবাবাজার, ধোবাপাড়া বাজার, হাটখোলা বাজার, বাগুয়া বাজার, চার্লস্ বাজার, নূতন শ্যামবাজার, বেগম বাজার, গাছতলার বাজার, জাননগর বাজার।" ইহাতে বুঝা যাইতেছে, বর্ত্তমান সভাবাজার, যাহা রাজা নবকৃষ্ণের মাতৃশ্রাদ্ধের সভাস্থলে স্থাপিত অথবা গৌরদাসের কল্পিত "শোভারাম বসাকের বাজার" ছাড়া একটী পুরাতন বাজার ছিল, তাহারই নাম সুবাবাজার।

জোড়াসাঁকোর পূর্ব্বে চাষাধোবাপাড়া. এখানে কোন বাজার কখন ছিল কি না, তাহার সন্ধান পাওয়া যায় নাই। চার্লস বাজার এবং বেগম বাজার কোথায় ছিল, এখনও জানা যায় নাই। উপরোক্ত বৈঠকখানার বাজারের নাম গাছতলার বাজার এবং তাহার কিয়দ্দূর দক্ষিণে জাননগর সেখানেও একটী বাজার ছিল।

কয়েকটি প্রাচীন পরিবার

৪

পাথুরিয়াঘাটা, জোড়াসাঁকো, চোরবাগান প্রভৃতি স্থানের ধনাঢ্য মল্লিকবংশ ও দক্ষিণ-বাগুয়ার প্রাচীন অধিবাসী। আমরা সুবর্ণবণিকদিগের মধ্যে দুই ঘর মল্লিক দেখিতে পাই, এক ঘর শীল মল্লিক, আর এক ঘর দে মল্লিক। মল্লিক কথাটী মুসলমান রাজদরবার হইতে প্রদত্ত উপাধি, ইহার অর্থ আমীর বা ধনাঢ্য। উক্ত দুই ঘরের মধ্যে শীল মল্লিকেরা সপ্তগ্রামবাসী প্রধান ব্যবসায়ী ছিলেন। শেঠ বসাকদিগের মত সরস্বতীর দুরবস্থা, বর্গীর ভয় প্রভৃতি কারণে অন্যূন দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জয়রাম মল্লিক আসিয়া পাথুরিয়াঘাটায় বাস করিয়াছিলেন। দে মল্লিকেরাও সপ্তগ্রাম হইতে ১৭০৩ সালে আসিয়া, বাগুয়ার না বসিয়া কলিকাতায় যে স্থানে বসিয়াছিলেন, তাহাই পরে বড়বাজারে পরিণত হইয়াছিল। ইঁহাদের কথা পরে বলা যাইবে। ইহা সত্য যে, এই দুই মল্লিক-পরিবার এবং মুলুকচাঁদ বাবু এই তিনজনের দ্বারাই বড়বাজার সৃজিত হইয়াছিল।

জয়রাম মল্লিকের চতুর্থ পুত্র পদ্মলোচন মল্লিক বাণিজ্যে বিশিষ্ট ধনশালী হইয়াছিলেন এবং তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্যামসুন্দর মল্লিক এতদূর বাণিজ্য বৃদ্ধি করিয়াছিলেন যে, কেবল ভারতবর্ষেই তাঁহার কারবার আবদ্ধ না থাকিয়া চীন, ব্রহ্মদেশ, আরব, পারস্য পর্য্যন্ত তাঁহার হুড়ি নামক জাহাজসকল যাতায়াত করিত। এবং এইরূপে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্য এবং রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু নামক দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকযাত্রা করেন। কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা বলেন, সুবর্ণবণিকেরা অত্যন্ত কৃপণ, কিন্তু সে অপবাদ বুদ্ধিমান লোকের কথা নহে। কায়স্থ ব্রাহ্মণেরা যাহা উপার্জ্জন করেন, আপনাদিগকে তদপেক্ষা উচ্চ দেখাইতে এবং বেহিসাবী বাবুয়ানা করিতে, মামলা মোকদ্দমা, বিবাদ বিসম্বাদ করিতে গিয়া সর্ব্বস্বান্ত হন। সেই জন্য ইঁহাদিগকে দুই তিন পুরুষের অধিক ধনাঢ্য অবস্থায় প্রায় দেখা যায় না। সাধারণত সুবর্ণবণিকদিগের প্রকৃতি সে প্রকার নহে। ইঁহারা হিসাবী, তাই বলিয়া ধর্ম্মকার্য্যে এবং লোক-লৌকিকতায় পরাঙ্মুখ নহেন, বরং অন্যান্য জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা যাইতে পারে। ইঁহারা যেমন অর্থ উপার্জ্জন করিতে পটু, তদনুরূপ সৎকার্য্যে

ব্যয় করিতেও সক্ষম, অথচ ফকির হন না। শ্যামসুন্দর মল্লিকের উপযুক্ত পুত্র রামকৃষ্ণ মল্লিক ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক পিতার প্রচুর ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া অলস ও ভোগবিলাসে জীবন কাটান নাই, তাঁহারাও পিতৃপদাঙ্কানুসরণপূর্ব্বক যথেষ্ট ধনবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এবং উপার্জ্জনের সহিত ধর্ম্মকার্য্যে অনেক অর্থব্যয় করিতেন। তাঁহাদের ধর্ম্মশালা ছিল, সেখানে আগন্তুক মাত্রেই প্রচুর ভোজ্য প্রাপ্ত হইত। আত্মীয়বন্ধুদিগকে অর্থসাহায্য এবং সুপরামর্শ দিয়া ব্যবসায় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া আপনারা সর্ব্বদা তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন, অনেক ভদ্রলোককে সুপারিশ করিয়া, প্রতিভূ হইয়া ভাল ভাল চাকুরী করিয়া দিতেন। বিস্তর ভদ্রলোক এই ভ্রাতৃদ্বয়ের কৃপায় ধনবান হইয়াছিলেন। কেবল অভুক্তকে ভোজ্য দিয়াই তাঁহারা নিশ্চিন্ত হন নাই, সুবিজ্ঞ কবিরাজদিগকে রাখিয়া আপনাদের ব্যয়ে নানাপ্রকার আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধ প্রস্তুত করাইয়া রোগার্ত্ত-দিগকে প্রাণদান করিতেন। যাহাকে বাঙ্গালার ছিয়াত্তরে মন্বন্তর বলে, ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের সেই দেশব্যাপী ভীষণ দুর্ভিক্ষে যখন সহস্র সহস্র সজীব নরকঙ্কাল কলিকাতার পথে ঘাটে ‘হা অন্ন হা অন্ন’ শব্দে ভ্রমণ করিয়া প্রাণত্যাগ করিত, সেই দুঃসময়ে রামকৃষ্ণ ও গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক সহরের আট স্থানে আটটী অন্নছত্র স্থাপন করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে অন্ন, বস্ত্র, শয্যা ও ঔষধ দিয়া অসংখ্য লোকের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন বৃন্দাবনে একটী চিরস্থায়ী অন্নছত্র স্থাপন করিয়া তথাকার দীনদুঃখীদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। সুবর্ণবণিক সমাজের নানাপ্রকার উপকার সাধন করায় তাঁহারা ইঁহাদিগকে আপনাদের দলপতি করিয়াছিলেন, এবং সামাজিক কোন ক্রিয়াকর্ম্ম তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ মত সম্পন্ন করিতে সকলে বাধ্য হইয়াছিলেন।

Selection from Unpublished Records গ্রন্থের ২০৫ এবং ৪৩২ পৃষ্ঠায় আমরা একজন রাধাকৃষ্ণ মল্লিকের নাম দেখিতেছি, অথচ সে সময় কি পাথুরিয়াঘাটা কি বড়বাজার উভয় মল্লিক পরিবারে সে নামে কোন ব্যক্তি ছিল না। অন্য কোন পরিবারে কেহ রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামক বড়লোক থাকিলে কোন না কোন সূত্রে তাঁহার নামও জানা যাইতে পারিত, কিন্তু তাহাও পাওয়া যায় নাই। ১৭৬০ সালের ৩১ জুলাই গবর্ণর সভায় কতকগুলি জমীদারী তিন বৎসরের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত হয়, তাহাতে মাগুরা পরগণার জমীদারী, যাহার বার্ষিক কর এক লক্ষ দুই হাজার টাকা, রাধাকৃষ্ণ মল্লিক এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার এক শত টাকায় ক্রয় করেন। ১৭৬৬ সালে যখন গোবিন্দরাম মিত্রের

পৌত্র রাধাচরণ মিত্রের জাল করা অপরাধে ফাঁসীর হুকুম হয়, তখন কলিকাতার অধিকাংশ বড়লোকে এই বিচারের বিরুদ্ধে আবেদন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যেও রাধাকৃষ্ণ মল্লিকের নাম দেখা যায়, কিন্তু রামকৃষ্ণ মল্লিকের নাম নাই। এই রামকৃষ্ণ মল্লিকই রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামে প্রচলিত ছিলেন কি না, বুঝা যায় না।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের কনিষ্ঠ গঙ্গাবিষ্ণু মল্লিক ১৭৮৮ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি, একমাত্র পুত্র নীলমণি মল্লিককে রাখিয়া পরলোকগমন করেন। রামকৃষ্ণ মল্লিক ১৮০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে বৈষ্ণবদাস মল্লিক ও সনাতন মল্লিক নামক দুই পুত্র রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। নীলমণি মল্লিক ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই সেপ্টেম্বর এবং বৈষ্ণবদাস মল্লিক ঐ বৎসর ৮ই অক্টোবর জন্মগ্রহণ করেন। রামকৃষ্ণ মল্লিক ভ্রাতুষ্পুত্রকে অল্প বয়সে পিতৃহীন দেখিয়া বিশেষ যত্নে প্রতিপালন ও শিক্ষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বৈষ্ণবদাসও কয়েক দিনের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাতপুত্রকে জ্যেষ্ঠ সহোদরের ন্যায় সম্মান করিতেন এবং কেবল যে ভালোবাসিতেন, তাহা নহে, সম্পূর্ণ তাঁহার উপর নির্ভর করিতেন। সনাতন মল্লিক ১৭৮১ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতার মৃত্যুর দুই বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮০৫ সালে অপুত্রকাবস্থায় পরলোকস্থ হন। রামকৃষ্ণ মল্লিকের মৃত্যুর পর নীলমণি এবং বৈষ্ণবদাস এমন সদ্ভাবে সংসার পালন করিয়াছিলেন যে হঠাৎ কাহারও বুঝিবার সাধ্য ছিল না যে, তাঁহারা সহোদর নহেন। এমন কি, সহোদরদিগেরও অনেক স্থানে তেমন সম্প্রীতি থাকে না। নীলমণিই পরিবারের কর্ত্তা, বৈষ্ণবদাস যেন তাহার আশ্রিত বালক মাত্র। নীলমণি মল্লিকও তেমনি গুণবান সদাশয় পুরুষ ছিলেন। তিনি দেশে বিদেশে বিপুল কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পুরুষোত্তম তীর্থে গমন করিয়া অনেক দুঃখী দরিদ্র, যাহারা সেই সময় জলপ্লাবনে গৃহশূন্য হইয়াছিল, তাহাদের গৃহনির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন, এবং নিজে যতদিন পুরীধামে ছিলেন, ততদিন আঠারনালায় যাত্রীদিগকে মাশুল দিতে হয় নাই, সে সমস্ত তিনি নিজে প্রদান করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের দক্ষিণ দাঁতন নামক স্থানে এক জগন্নাথ আছেন, নীলমণি মল্লিক ফিরিয়া আসিবার সময় উক্ত জগন্নাথের সুবৃহৎ নাটমন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তিনি মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন, মাতুলের একটী জগন্নাথ মূর্ত্তি ছিল, তিনি চোরবাগানে উক্ত জগন্নাথের মন্দির এবং তৎসহ অতিথিশালা নির্ম্মাণ করিয়া অসংখ্য অভুক্তকে অন্নদান করিতেন, তাঁহারই কৃত ব্যবস্থা আজিও চলিতেছে, যদিও এখন লোকে তাঁহার উপযুক্ত পুত্র রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের

অতিথিশালা বলিয়া জানে।

সেকালে দেনার দায়ে যাহারা কারাবদ্ধ হইত, তাহাদের মুক্তির কোন নির্দ্দিষ্ট সময় ছিল না, যতদিন না ঋণ পরিশোধ হইবে, ততদিন আবদ্ধ থাকিতে হইত, অনেককেই জেলে জীবন শেষ করিতে হইত। সেই স্মৃতি অনুসারে আজিও অনেক উত্তমর্ণ "তোকে জেলে পচাইব" বলিয়া অধমর্ণকে ভয় দেখাইয়া থাকে। বহরমপুরের গৌরী সেন (গৌরীকান্ত), কলিকাতায় নীলমণি মল্লিক এই সকল হতভাগ্যদিগের ভরসা ছিলেন। গৌরীসেনের নিকট গিয়া প্রার্থনা করিলেই ঋণপরিশোধ হইত, নীলমণি মল্লিক ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে কারাগারের সমস্ত কয়েদীকে ঋণমুক্ত করিয়া নিজ নিজ গৃহে পাঠাইয়া দিতেন।

এখন অপেক্ষা পূর্ব্বে সন্ন্যাসীদিগের দল অত্যন্ত অধিক ছিল, তাহাদের উপদ্রবে হিন্দুরা অস্থির হইতেন। তাহার দৃষ্টান্তস্থলে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে, যে সময় সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে মুরসিদাবাদের শেঠদিগের গৃহে মহা-চক্রান্ত সভা হয়, সেই সভায় রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় রাজ্যের অরাজকতা বর্ণনায় দৃষ্টান্তগুলির মধ্যে বলিয়াছিলেন, "নবাব সন্ন্যাসীদিগের উপদ্রব হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করেন না।" বাস্তবিক উহারা যখন দল বাঁধিয়া যে গ্রামে পড়িত, সে গ্রামের হিন্দুদিগের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইত বলিলে অত্যুক্তি হয় না, এমন কি, বড় বড় চণ্ডীমণ্ডপ ও আটচালা পর্য্যন্ত ভাঙ্গিয়া ধূনি জ্বালিবার কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া লইয়া যাইত। কেবল যে অধিবাসীদিগকেই ইহাদের জন্য জ্বালাতন হইতে হইত, তাহা নহে; অনেক সময় গবর্ণমেণ্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হইয়াছে। Unpublished Records গ্রন্থে দেখা যায়, একবার বর্দ্ধমানরাজ ইংরাজদিগকে দশ হাজার টাকা পাঠাইয়াছিলেন, নগরের বাহিরে সন্ন্যাসীরা তাহা কাড়িয়া লইয়াছিল। সারণের নিকট পাঁচ হাজার সন্ন্যাসীর সহিত গবর্ণমেণ্টকে রীতিমত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল, উক্ত সন্ন্যাসীরা গুলি, বারুদ, বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। ঢাকায় একবার বহু সংখ্যক সন্ন্যাসী কোম্পানির কুঠী লুণ্ঠন এবং ভগ্নপ্রায় করিয়া দেয়, পরে তাহাদিগকে ধরিয়া কুলিরূপে উক্ত কুঠী মেরামত করা হয়। কাশীতে সন্ন্যাসীরা হেষ্টিংসকে কি প্রকার বিপদগ্রস্ত করিয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন, হেষ্টিংস সে যাত্রা কোনরূপে পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। কলিকাতাতেও একবার সন্ন্যাসীদিগের সহিত কোম্পানির বিলক্ষণ দাঙ্গা হয়, তাহাতে বর্দ্ধমান রাজার এবং কলিকাতা-বাসী বড় মানুষদের দ্বারবানেরা এবং অনেক বেহারী ও উত্তর-পশ্চিমবাসী লোক

সন্ন্যাসীদের পক্ষ হওয়ায় কোম্পানিকে ইংরাজ সৈন্য দ্বারা শান্তিরক্ষা করিতে হইয়াছিল। সন্ন্যাসীদিগের দৃষ্টান্তে কলিকাতাবাসী ভিক্ষাজীবী বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণেরা পর্য্যন্ত ভাবিত যে, ভিক্ষার দাবী খাজনার দাবীর ন্যায় অবশ্য দেয়। ১৭৭৯ সালের ২০ আগষ্টের গবর্ণর সভায় কলিকাতার দুইশত ভিক্ষুক এই বলিয়া আবেদন করিয়াছিল যে, "এ পর্য্যন্ত তাহারা প্রত্যেক দোকান হইতে প্রতিদিন পাঁচ কড়া কড়ি হিসাবে ভিক্ষা পাইত, এখন দোকানদারেরা দিতে অস্বীকার করিতেছে, অতএব কোম্পানি হইতে তাহাদিগকে উহা আদায় করিয়া লইবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয়।"

কলিকাতার অনেক ধনবান লোক সন্ন্যাসীদিগকে রীতিমত আহার এবং কম্বল ও পয়সা প্রভৃতি প্রদান করিতেন। নীলমণি মল্লিক গঙ্গার ধারে একটী প্রশস্ত ঘাট বাঁধাইয়া তাহার সঙ্গে সন্ন্যাসীদিগের বাসের জন্য প্রশস্ত দালান নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। যাহারা সেই স্থানে বাস করিত, তাহাদের খাদ্য ও কম্বল প্রভৃতি নীলমণি বাবু নিজে জোগাইতেন। তদ্ভিন্ন নিজ বাটীর সম্মুখে সদাব্রতের জন্য প্রশস্ত প্রাঙ্গণযুক্ত একটী চক ছিল, সেখানে যাহারা আসিত, তাহারও রন্ধনোপযোগী সমস্ত দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। এইরূপে নিজ কলিকাতায় তিন স্থানে প্রত্যহ তাঁহার সদাব্রতে অসংখ্য লোক অন্নবস্ত্রের অভাব হইতে নিস্তার পাইয়াছিল। ১৮২৩ সালে যখন ষ্ট্রাণ্ড রোড নির্ম্মিত হয়, তাহাতে অনেক ঘাট মারা গিয়াছিল, নীলমণি মল্লিকের ঘাটও মারা যাওয়ায় তাহার চাঁদনী ও সন্ন্যাসী ভবন প্রভৃতি পরিবর্ত্তিত করিয়া নাবালক উত্তরাধিকারীর অভিভাবক বাজার বসাইয়াছিলেন, এক্ষণে উহা পানপোস্তা নামে পরিচিত হইয়াছে।

অন্নদানের সহিত জ্ঞানদান সম্বন্ধেও তাঁহার মন কৃপণ ছিল না, তিনি বাঙ্গালা পাঠশালা ও ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া বিনা বেতনে তথায় বালকদিগের শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। পূর্ব্বপুরুষদিগের স্থাপিত দাতব্য কবিরাজী চিকিৎসা যাহাতে সুচারুরূপে চলে তাহার জন্য বিশেষ তত্ত্বাবধান ও অর্থব্যয় করিতেন। গীতবাদ্যের প্রতিও উদাসীন ছিলেন না, প্রতি বৎসর সরস্বতী পূজার দিন তাঁহার গৃহে গীতবাদ্যের "মাইফেল" অর্থাৎ ওস্তাদদিগের গুণপনা প্রদর্শন হইত, তাহাতে দিক্ বিদিক্ হইতে গীতবাদ্যের পণ্ডিতেরা আগমন করিতেন। নীলমণি বাবু অতি সমাদর ও যত্নের সহিত তাঁহাদের আতিথ্য করিতেন এবং প্রত্যেকের পাথেয় ও মর্য্যাদানুরূপ বিদায় দান করিতেন। বাবু রামনিধি গুপ্ত অর্থাৎ নিধু বাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ প্রণয় ছিল। নিধু বাবুর

সাহায্যে নিজ ব্যয়ে তিনি ফুল আখড়াই স্থাপন করেন। সকল প্রকারের বাদ্যযন্ত্রের সমতানে উচ্চরাগিণীতে ফুল আখড়াইয়ের সঙ্গীত হইত। নিধু বাবু ও নীলমণি বাবুর সহিত ফুল আখড়াইও অন্তর্ধান হইয়াছে, পরে নিধু বাবুর উপযুক্ত ছাত্র বাবু মোহনচাঁদ বসু রাজা রাজকৃষ্ণের সাহায্যে হাফ আখড়াই সঙ্গীত-সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২রা সেপ্টেম্বর, ৪৬ বৎসর মাত্র বয়সে বাবু নীলমণি মল্লিক প্রাণত্যাগ করেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্ব্বে ভৃত্যদিগের সাহায্যে একখানি চৌকীতে বসিয়া পারিবারিক দেবালয়ে গিয়া প্রণামাদি করিয়া, আত্মীয় বন্ধুদিগকে আহ্বানপূর্ব্বক বিনীতভাবে নিজকৃত দোষ-ত্রুটীর জন্য ক্ষমাপ্রার্থনার পর আপনাকে গঙ্গাতীরস্থ করিতে অনুরোধ করেন এবং সঙ্কীর্ত্তনে স্বরচিত একটী গীত গাহিতে বলেন। রোরুদ্যমান বান্ধবেরা তাঁহাকে তাঁহার নিজকৃত ঘাটে লইয়া নামাইবার পর কিছুক্ষণ ভগবানের নাম জপ করিয়া ইহধাম পরিত্যাগ করেন।

নীলমণি বাবু পত্নী এবং তিন বৎসর বয়স্ক একটী দত্তক পুত্র রাখিয়া চলিয়া যান। দুঃখের বিষয় পরবৎসরই বিষয় বিভাগ করিবার আবশ্যক হয়। বিধবা আপন নাবালক দত্তক পুত্রসহ স্বামীর প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ ঠাকুরের বাটীতে প্রস্থান করিলেন। ইনিও অত্যন্ত দয়াবতী মহিলা ছিলেন। মোকর্দ্দমা উপলক্ষে বহুকাল ইঁহাদিগের ব্যয় সাহায্যার্থ একটী কপর্দ্দক স্বামীর সম্পত্তি হইতে না পাইলেও নিজ স্ত্রীধন হইতে এবং ঋণ করিয়া জগন্নাথের নিত্যসেবা, অতিথিসেবা প্রভৃতি চালাইয়াছিলেন। অতিথিসেবা সম্পন্ন না হইলে নিজে আহার করিতেন না। যখন সম্পত্তি বিভক্ত হইয়া আসিল, এবং নিজের ব্যয় হিসাবে অনেক টাকা লাভ করিলেন, তখন নানাপ্রকার সৎকার্য্যে সে ধনের সার্থকতা সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজেন্দ্র মল্লিক ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে জুন জন্মগ্রহণ করেন, ১৮৩৫ সালে সাবালক হইয়া বিষয় সম্পত্তি স্বহস্তে গ্রহণ করেন, এতদিন সুপ্রিম কোর্টের আদেশে সার জেম্‌স্ হগ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। রাজেন্দ্র মল্লিকের গুণগ্রামের কথা কলিকাতাবাসী সর্ব্বসাধারণের অবিদিত নাই, তিনি নিজ বদান্যতা গুণে ১৮৬৭ সালের জানুয়ারি মাসে প্রথমে রায়বাহাদুর হন। দুঃখীর প্রতি তাঁহার সহানুভূতি এমন আশ্চর্য্য যে, যে অতিথিশালা তাঁহার পিতা স্থাপন করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার হস্তে এমন যত্নে রক্ষিত হইয়াছিল যে, লোকে উহা তাঁহারই স্থাপিত বলিয়া মনে করিত।

উড়িষ্যা ও বঙ্গদেশের গত ৬৬।৬৭ সালের দুর্ভিক্ষে তিনি অকাতরে সহস্র সহস্র দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট নরনারী, বালক-বালিকার প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়া যখন সম্রাজ্ঞী হন, সেই সময়ে রায় রাজেন্দ্র মল্লিক বাহাদুর রাজা-বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। কেবল যে মনুষ্য জাতিকেই তিনি ভাল-বাসিতেন, তাহা নহে, পশুপক্ষীর প্রতি তাঁহার যথেষ্ট আদর ছিল। কলিকাতায় তিনি সর্ব্বপ্রথম পশুপক্ষীর আদর দেখাইবার জন্য চিড়িয়াখানা স্থাপন করেন, আমরা বাল্যকালে সেখানে অনেক প্রকার আশ্চর্য্য পশুপক্ষী দেখিয়া আনন্দ লাভ করিতাম। রাজাবাহাদুর জীববিদ্যা সম্বন্ধে একজন পণ্ডিত ছিলেন, বিলাতের অনেক জীবতত্ত্বালোচনা সভায় ঐ বিষয়ে এমন পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ-সকল লিখিয়া পাঠাইতেন যে, সেই সেই সভা হইতে তাঁহাকে সনন্দ ও পুরস্কার পদক প্রদত্ত হইয়াছিল।

সে সময় চিত্র বিষয়ে তিনি বাঙ্গালীদিগের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, চিত্র অঙ্কন প্রতিমূর্ত্তি গঠন তাঁহার প্রধান আমোদের কার্য্য ছিল। তিনি আপনার শিল্প-নৈপুণ্যবলে আশ্চর্য্য কারুকার্য্যযুক্ত মর্ম্মর প্রস্তরে রাজবাটী মণ্ডিত করিয়াছিলেন। আমরা বাল্যকাল হইতে রাজাবাহাদুরের মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার গৃহনির্ম্মাণের বাঁশের ভারা কখন খোলা দেখি নাই। কোন কোন ভদ্রলোক তাঁহাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসাও করিয়াছিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিতেন, "আমাদের দেশে পূর্ব্বে কত আশ্চর্য্য ভাস্করী কারিকর ছিল, তাহার প্রমাণ পুরাতন তীর্থস্থানের দেবমন্দিরসকল দেখিলেই বুঝা যায়, এক্ষণে উৎসাহাভাবে সেই সুন্দর বিদ্যা লোপ পাইতে বসিয়াছে, এখন রাজারা বিলাতী জিনিষ ভালবাসেন, সুতরাং ইহারা অন্নাভাবে ভাস্করী ব্যবসায় ছাড়িয়া দিতেছে, আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায় যতদূর পারি, জনকতক ভাস্করকে রাখিয়া দিয়াছি এবং তাঁহাদের কার্য্য চালাইবার জন্য সর্ব্বদা নূতন চিত্র দ্বারা বাটীর সাজসজ্জা পরিবর্ত্তন করি।" রাজাবাহাদুর ইংরাজী, বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা জানিতেন। প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, চিত্র-বিদ্যা, সঙ্গীতবিদ্যায় পণ্ডিত ছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা মহৎ গুণ এই ছিল যে, তাঁহার মত অমায়িক ধনী লোক আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার দেবেন্দ্র মল্লিকও অনেক বিষয়ে পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন।

বাবু রামকৃষ্ণ মল্লিকের পুত্র বাবু বৈষ্ণবদাস মল্লিক সংস্কৃতচর্চ্চায় দিবারাত্র নিযুক্ত থাকিতেন। নানাপ্রকার দুর্লভ প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া

আপনার পুস্তকালয় পূর্ণ করিয়াছিলেন। ইহার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং যত টাকায় হউক, এক একখানি দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ সংগ্রহ করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ মনে করিতেন। দেশ বিদেশের পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার কাছে আসিয়া যথোপযুক্ত সমাদর লাভ করিয়া তাঁহার বিদ্যা ও উদারতার জন্য ধন্যবাদ দিয়া যাইতেন। তিনিও সর্ব্বদা পণ্ডিতমণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া শাস্ত্রালাপে দিন কাটাইতেন। আগন্তুক সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রকৃত জ্ঞানবান, তাঁহাদিগকে তিনি বিশেষ সমাদর করিতেন। ১৮৪১ খ্রীঃ ১০ই মার্চ্চ, তিনি পাঁচটী পুত্র রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করেন। বীরনরসিংহ মল্লিক, স্বরূপচন্দ্র মল্লিক, দীনবন্ধু মল্লিক, ব্রজবন্ধু মল্লিক ও গোষ্ঠবিহারী মল্লিক পাঁচ ভ্রাতায় যথোপযুক্তরূপে পিতৃকার্য্য সমাধা করিয়া পৈতৃক বাটীতেই একান্ন-ভুক্ত পরিবার হইয়া বাস করিয়াছিলেন। বাবু বীরনরসিংহ মল্লিক তুলসীদাস ও সুবলদাস নামক দুই পুত্র রাখিয়া ১৮৪৯ খ্রীঃ জুলাই মাসে এবং স্বরূপচন্দ্র অপুত্রকাবস্থায় প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। গোষ্ঠবিহারী মল্লিক ১৮৫১ খ্রীঃ একমাত্র পুত্র বাবু কুঞ্জলাল মল্লিককে রাখিয়া পরলোকযাত্রা করিলে বাবু দীনবন্ধু মল্লিক পরিবারের কর্ত্তা হইয়া পূর্ব্ব গৌরব রীতিমত রক্ষা করিয়াছিলেন। সে সময় দর্পনারায়ণ ঠাকুরের ষ্ট্রীট পূর্ব্বদিকে বন্ধ ছিল, দীনবন্ধু বাবু অর্থব্যয় করিয়া উহা খুলিয়া রতন সরকারের গার্ডেন ষ্ট্রীটের সহিত মিলাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যু হইলে চতুর্থ ভ্রাতা ব্রজবন্ধুর হস্তে পারিবারিক কর্ত্তৃত্ব আসিয়া পড়ে, তিনি এমন সুন্দরভাবে পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন যে, ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সকলেই তাঁহার বিশেষ বাধ্য ছিলেন। ক্লাইব রো নামক রাস্তাটী বাবু ব্রজবন্ধু মল্লিকেরই কীর্ত্তি। তিনি ইহা খুলিয়া দিতে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খ্রীঃ ৫০ বৎসর বয়সে তিনি মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার আশুতোষ, গোবিন্দলাল, গোপাললাল, বনমালী, এবং মতিলাল নামক পাঁচটী পুত্র ছিলেন।

বীরনরসিংহ বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র বাবু তুলসীদাস মল্লিক বিশেষ উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অতি সুন্দর ইংরাজী জানিতেন, পারিবারিক সমস্ত ব্যাপারে খুল্লতাতদিগের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। গবর্ণমেণ্ট যখন অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ সৃষ্টি করেন, তখন তুলসীবাবুই উহা প্রথম লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৬১ খ্রীঃ তিনি বলাইদাস ও হরপ্রসাদ নামক দুই পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। ব্রজ বাবুর মৃত্যুর পর তুলসী বাবুর কনিষ্ঠ সহোদর সুবলদাস বাবু পারিবারিক

কর্ত্তারূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করেন। তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ প্রিয় ছিলেন, প্রজাদিগের স্বাস্থ্য উন্নতির জন্য তিনিই প্রথমে বস্তি উন্নতির কার্য্য আরম্ভ করেন, তিনিই তৎকালে জষ্টিশ অব্ দি পিস অর্থাৎ সাবেক মিউনিসিপ্যালিটীর একজন সদস্য ও অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে একমাত্র পুত্র বাবু গোপীমোহন মল্লিককে রাখিয়া পরলোকস্থ হন।

কয়েকটি প্রাচীন পরিবার

৫

যে প্রকার বিশৃঙ্খলভাবে প্রাচীন অধিবাসীদিগের কথা লেখা হইতেছে, তাহাতে অনেক সময় পাঠক মহাশয়দিগের বিরক্তিকর হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এ ত্রুটী তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে, কারণ আমরা যখন যাঁহাদের সন্ধান পাইতেছি, তখনই তাঁহাদের কথা প্রকাশ করিয়া সংগ্রহরূপে রাখিতেছি; ভবিষ্যতে পুস্তকাকারে প্রকাশের সময় শ্রেণীবদ্ধ করিব, এখন আমাদের সাধ্যাতীত।

বাগুয়াবাজারে বাগবাজার ষ্ট্রীট হইতে চিৎপুর রোড পর্য্যন্ত কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর লেন নামক একটী সংকীর্ণ রাস্তা অনেকে দেখিয়াছেন। এই কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী পরলোকস্থ প্রসিদ্ধ গায়ক বাবু গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর (নুলো গোপাল) পিতা। কালীপ্রসাদ, বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দৌহিত্র-সন্তান। দুঃখের বিষয়, তাঁহার মাতামহবংশীয় কেহ আছেন কি না, আমরা তাহার সন্ধান পাই নাই। তাঁহারা বাগুয়ার অতি প্রাচীন অধিবাসী ছিলেন। নিজ বাগুয়াবাজারের পূর্ব্বদিকে, এখন যেখানে নিয়োগী বাবুদিগের সুবৃহৎ অট্টালিকা বর্ত্তমান, সেই স্থানে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের বাস ছিল।

কি কলিকাতা, কি সুতানুটী উভয় পরগণাতেই অনেক মুসলমানের বাস ছিল, কিন্তু তাঁহাদের সন্ধান পাওয়া সুকঠিন। যে কয়জনের যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহাই প্রকাশ করিতেছি।

সোণাগাজী একটী সুবিখ্যাত স্থান, অনেকে সোণাগাছী বলেন, কিন্তু প্রকৃত নাম সোণাগাজী। ঐ স্থানে সোণাউল্লা নামক একজন দুর্দ্দান্ত মুসলমান বাস করিত। লাঠালাঠী, মারামারি, দাঙ্গা-হাঙ্গামই তাহার উপজীবিকা ছিল। সংসারে এক বৃদ্ধা জননী ভিন্ন তাহার আর কেহ ছিল না। বাল্যকালে আমরা বৃদ্ধাদিগের মুখে সোণাউল্লার কত অদ্ভুত গল্প শুনিতাম এবং ভয়ে শিহরিয়া উঠিতাম। যতটুকু মনে আছে তাহা এইরূপ :—সোণাউল্লা মরিয়া যাইবার পর তাহার জননী কাঁদিতেছিল, পর্ণকুটীরের ভিতর হইতে সোণাউল্লার কণ্ঠধ্বনি শুনিয়া বৃদ্ধা রোদনে ক্ষান্ত হইয়া শুনিল, "মা তুই কাঁদিস না, আমি মরিয়া গাজী হইয়াছি;

যতদিন বাঁচিয়াছিলাম, ততদিন অনেক লোককে মারিয়াছি, অনেকের মালপত্র লুঠ করিয়াছি, অনেক ক্ষতি করিয়াছি। এখন আমি ঔষধ দিয়া লোকের প্রাণ দান দিব, আর যে আমার সিন্নি দিবে, তার খুব ভাল করিব, ইহাতেই তোর খোরাক চলিবে।" এই কথা প্রকাশের পর হাজার হাজার নরনারী সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখে আসিয়া জমায়েত হইতে লাগিল। জীর্ণ শীর্ণ চিররুগ্ন, অন্ধ, খঞ্জ ও কুষ্ঠরোগী প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত আবাল বৃদ্ধ বনিতা এবং বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, ইতর ভদ্র নরনারী, মোকর্দ্দমা প্রভৃতি বিপদগ্রস্ত সম্ভ্রান্ত, ধনবান, নির্ধন, সকল শ্রেণীর লোকের ভীড়ে রাস্তা ঘাট, মাঠ বাগান পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। টাকা পয়সা ও বাতাসার পর্ব্বত হইল। সকলেই ব্যাকুল অন্তরে সোণাগাজী সাহেবের দোহাই দিতেছে। এক একজন সম্মুখে আসিয়া ক্ষমতানুসারে সিন্নি দিয়া নিজের রোগের বা দুঃখের কথা বলিলে, বৃদ্ধা "বাবা সোণাউল্লা" বলিয়া ডাকিত, অমনি ঘরের ভিতর হইতে নাকিস্বরে "কি মা" বলিয়া মৃত সোণাউল্লো গাজী উত্তর দিত। মা আগন্তুকের কথা বলিবামাত্র আবার নাকিস্বরে উত্তর আসিত, "পুকুরে কলাপাত মোড়া ঔষধ ভাসিতেছে, প্রত্যহ সকালে উঠে একটু জলে ধুয়ে খেতে বল, আরাম হইবে।" রোগী আহ্লাদে সম্মুখস্থ পুষ্করিণীতে গিয়া দেখে, কলাপাতা জড়ান কি ভাসিতেছে, তুলিয়া লইল, খুলিয়া দেখে, একটু শিকড়; আনন্দে তাহা লইয়া বাটী গেল, এবং প্রত্যহ ব্যবস্থামত সেবন করিয়া দেখিতে দেখিতে আরোগ্যলাভ করিল।

এইরূপে কাহারও ঔষধ পুকুরে, কাহারও ঔষধ কুটীর হইতে পড়িত, কাহারও ঔষধ অন্য নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে লইয়া যাইতে আদেশ হইত। বিপদগ্রস্ত লোকেরা মৌখিক আশ্বাস ও উপদেশ পাইত। আবার কোন কোন লোকের উপর গাজী সাহেব ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইতেন, তাঁহার দন্ত কিড়ি মিড়ি, তর্জ্জন গর্জ্জন, চালের মড়মড়ানী এবং আস্ফালনে উপস্থিত লোকেরা কম্পিত হইয়া পলায়ন করিত। বিকট নাকিস্বরে মহা আস্ফালনের সহিত গাজী সাহেব বলিতেন, "ও আমায় ঠাট্টা করিতে এসেছে, ওর সিন্নি রাস্তায় ছুঁড়ে ফেলে দে, আমি ওর স-পুরী একগাড় করিব, দেখি ও কেমন ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করে" ইত্যাদি ভয় দেখাইত।

কয়েক মাস পরেই বৃদ্ধা একটী মসজিদ নির্ম্মাণ করিল। মসজিদটী যেমন বৃহৎ তেমনি সুন্দর। বৃদ্ধার আর কেহ নাই, পয়সারও অভাব নাই, সুতরাং মসজিদ নির্ম্মাণে অকাতরে অর্থব্যয় করিয়াছিল। উহা সোণাগাজীর মসজিদ

বলিয়া বিখ্যাত হইল। ঐ মসজিদের নামানুসারে মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটের নাম হইয়াছে। অর্ম্মির ১৭৫৬ সালের ম্যাপে ঐ রাস্তার কতক কতক অংশ দেখা যায়, তাহাতে রাস্তার উত্তর পার্শ্বে খানিক খালি জমীর পর একটী বৃহৎ মসজিদের চিত্র অঙ্কিত আছে। ধর্ম্মপরায়ণ বিজ্ঞ মুসলমানেরা প্রেতাত্মা ও বুজরুকী উভয়েরই ঘোর বিরোধী, সেইজন্য কোন বিজ্ঞ মুসলমান সোণাউল্লার গাজীত্বে বিশ্বাস করেন নাই, এবং অসৎ উপায়ে সংগৃহীত অর্থে মসজিদ নির্ম্মিত হইতে পারে না, সুতরাং সোণাগাজীর মসজিদে তাহার মা এবং উহার অনুগত লোক ও আগন্তুক ঔষধপ্রার্থীরা ছাড়া আর কোন মুসলমান প্রবেশ করিত না। সোণাউল্লার মাতার মৃত্যুর পর বুজরুকী বন্ধ হইয়া গেল, মসজিদও জঙ্গলে আচ্ছাদিত হইতে লাগিল। সোণাউল্লার বাটীর সম্মুখস্থ পুষ্করিণী পাড়ে তাহার কবর হইয়াছিল। ঐ পুষ্করিণীটী চিৎপুর রোডে বটতলার সম্মুখে, দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীটের মোড়ে; ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের পর নব ভাবে গঠিত লটারি কমিটী সেই পুষ্করিণী সংস্কার করিয়া সাধারণ লোকের পানীয় জল রক্ষা করেন। পুকুরের দক্ষিণ পার্শ্বে সোণাগাজীর কবর ইষ্টক নির্ম্মিত প্রাচীরে বেষ্টিত করা হয়। একজন ফকির থাকিত, লোকের প্রদত্ত সিন্নির পয়সা সেই লইত। সম্প্রতি সেই কবরটী একটী ক্ষুদ্র সুন্দর ও সজ্জিত ঘরে আচ্ছাদিত হইয়াছে। পুকুরটী ভরাট করিয়া ঘোড়ার গাড়ীর আস্তাবল হইয়াছে। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁহার "আলালের ঘরের দুলাল" নামক গ্রন্থে এই পরিত্যক্ত সোণাগাজীর মসজিদের সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন। এই সোণাউল্লা গাজীর নাম হইতে সোণাগাজী নামের উৎপত্তি।

এখনকার নিমতলা ঘাট ষ্ট্রীট পূর্ব্বে জোড়াবাগান ষ্ট্রীট বলিয়া পরিচিত ছিল, কিন্তু বহুপূর্ব্বে এই রাস্তাটী সম্পূর্ণ খোলা ছিল না। মধ্যে মধ্যে কাঁচা রাস্তা, আবার খানিক মাঠ বা কৃষিক্ষেত্র, আবার খানিক পথ, খানিক বাগান, অর্ম্মির ম্যাপে এইরূপ দেখা যায়। বেলী সাহেবের ১৭৮২ সালের ম্যাপে রাস্তাটী গঙ্গাতীর হইতে চিৎপুর রাস্তা পর্য্যন্ত সরলরেখায় নির্ম্মিত এবং জোড়াবাগান ষ্ট্রীট নামে পরিচিত হইয়াছিল। তখন ইহার পশ্চিম সীমার ঘাটের নাম ছিল জোড়াবাগান ঘাট, নিমতলা ঘাট তাহার অনেকটা উত্তরে ছিল। জোড়াবাগান ঘাটেই শবদাহ হইত। ঐ স্থানে কোন ব্রাহ্মণ আনন্দময়ী কালী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গরাণহাটার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়েরা অনেক দিন হইতে ঐ কালী তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত বলিয়া আসিতেছেন। আসল কথা, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রাধামাধব বর্ত্তমান নিমতলা ঘাট ও কালীর ঘর

বেণ্টিঙ্কের সময় নির্ম্মাণ করেন। ঐ কালীর প্রতিমা ইতিপূর্ব্বে রাস্তা হইতে অনেক নিম্নে স্থাপিত ছিল, কয়েক বৎসর হইল উর্দ্ধে তুলিয়া বসান হইয়াছে। যখন এই কালীর সম্মুখে মিউনিসিপ্যাল ড্রেন বসান হয়, তখন নিম্ন স্থান হইতে রাশি রাশি অঙ্গার, অর্দ্ধদগ্ধ কাষ্ঠ এবং নরকঙ্কাল বাহির হইয়াছিল। আনন্দময়ীর পশ্চাতে একটী নিচু চাঁদনীওয়ালা অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানযুক্ত পাকা ঘাট ছিল, ঐ ঘাটের উত্তরে কতকগুলি বড় বড় নিম্ববৃক্ষ ছিল। ১৬৮৬ খ্রীঃ জব চার্ণক হুগলী হইতে তাড়িত হইয়া সর্ব্বপ্রথম ঐ নিম্ববৃক্ষের নিম্নে আটচালা বাঁধিয়া বাস করিয়াছিলেন।

নিমতলার মসজিদের পার্শ্বে মহম্মদ রামজানের লেন নামে একটী গলি আছে। এই মহম্মদ রামজানের পূর্ব্বপুরুষেরা এখানকার অতি প্রাচীন অধিবাসী। এমন কি, দত্তচৌধুরীরা আসিবার পূর্ব্বেও তাঁহারা এখানে বাস করিতেন। উপরোক্ত ঘাটটী রামজানের কোন পূর্ব্বপুরুষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান মসজিদটী রামজানের নির্ম্মিত। উঁহাকে লোকে রামজানি ওস্তাগর বলিত। তিনি অতি উদার প্রকৃতির মুসলমান ছিলেন। একদিন তাঁহার বাটীর ছেলেরা তাঁহাদের ঘাটে স্নান করিতেছিল, সে সময় যে ব্রাহ্মণেরা ঘাটে বসিয়া স্নানান্তে পূজা করিতেছিলেন, অসাবধানতাবশতঃ তাঁহাদের গায়ে জল লাগিল, ব্রাহ্মণেরা বলিলেন, মুসলমানের ঘাটে হিন্দুর স্নান পূজা করার এই ফল, চল আবার অন্য ঘাটে গিয়া স্নান করিয়া পূজা করা যাউক। কোন সূত্রে এই কথা রামজানের শ্রুতিগোচর হইবামাত্র ঘাটে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া আদেশ দেন যে, আর কোন মুসলমান এ ঘাটে নামিতে পারিবে না।

রসিদ মল্লিক ও নুরজ মল্লিক নামক দুই ভ্রাতা ছিলেন, ইঁহারাও মুসলমান। এখন ইঁহাদের বংশের কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ব্বে এ অঞ্চলের ইঁহারা প্রধান একঘর জমীদার ছিলেন। হোগলকুড়িয়া[১] সিমলা,[২] মৃজাপুর, বেনিয়াপুকুর, পাগলা ডাঙ্গা, ট্যাংরা ও দলন্দ ইঁহাদের জমীদারীভুক্ত ছিল।

১৭৫৪ খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট, হলওয়েল সাহেব সুকৌশলে উক্ত দুই ভ্রাতার নিকট নামমাত্র মূল্য দিয়া উহার পাট্টা লিখাইয়া লন। ঐ বৎসর ৮ই ডিসেম্বর কলিকাতার কাউন্সিল বিলাতে যে পত্র লেখেন, তাহা এই:—
"গত ৮ই আগষ্ট মিঃ হলওয়েল অতি কষ্টে ডিহি সিমলার স্বত্বাধিকারীর নিকট, ২,২৮১ টাকায় উহা ক্রয় করিয়াছেন, উহা কলিকাতার একটী প্রধান অংশ, উহা খরিদ করায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। আমরা যে মূল্য দিয়াছি, বর্ত্তমান

তহসিলেই জমীর খাজনায় তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক আয় হয়। হলওয়েল বলেন, যখন উহা আমাদের হস্তে বন্দোবস্ত হইবে, তখন আরও অনেক অধিক আয়ের সম্পত্তি হইবে তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বত্বাধিকারের মধ্যে এখনও অনেক গোল আছে, তাহা আমরা এখনও নিষ্পত্তি করিতে পারি নাই, যখন পারিব, তখন আপনাদিগকে জ্ঞাত করিব।"[৩] ইতিপূর্ব্বেই হলওয়েল বিনামূল্যে বেনিয়াপুকুর, পাগলাডাঙ্গা, ট্যাংরা, এবং দলন্দ অধিকার করিয়াছিলেন। ১৭৫২ খ্রীঃ ১৫ই ডিসেম্বর, তিনি কলিকাতার যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহা ৬৪ সালে মুদ্রিত হয়, উহার ১৪০ পৃষ্ঠায় স্পষ্টই লিখিয়াছেন:—"বেনিয়াপুকুর, পাগলাডাঙ্গা, ট্যাংরা এবং দলন্দে কোম্পানির কোন অধিকার ছিল না, ক্রমে আপনা আপনি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে।" এ কথার অর্থে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, কোম্পানি জমীদারদিগকে কিরূপ "মূল্য দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া" ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। এখন ঐ মুসলমান জমীদারবংশের যদি কোন উত্তরাধিকারী জীবিত থাকে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি হয় দরজী অথবা খানসামা প্রভৃতি নীচ বৃত্তি দ্বারা দীনভাবে জীবন কাটাইতেছে। উহাদের ট্যাংরার জমীদারী দখলের সময় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আপত্তি করিয়াছিলেন যে, তিনি সুরজী মল্লিকের নিকট তাহা ক্রয় করিয়াছেন, ও তাহার পাট্টা প্রদর্শন করেন। কোম্পানি উক্ত পাট্টা জাল বলিয়া উপেক্ষা করেন এবং বলেন, সুরজী মল্লিক ১৫ বৎসর পূর্ব্বে মরিয়া গিয়াছে, তোমার পাট্টার তারিখ ৯ মাস পূর্ব্বে মাত্র, সুতরাং ইহা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে না[৪] অথচ কোম্পানি নিজের বেলা ১৭৫৪ খ্রীঃ ৮ই আগষ্ট, সেই সুরজী ও রসিদ মল্লিকের নিকট সিমলার পাট্টা কিরূপে লিখাইয়া লইলেন, বুঝিতে গেলে হাস্য সম্বরণ করা যায় না। সিমলা এবং পাগলাডাঙ্গা[৫] একত্রে ২২৪৫ বিঘা, তন্মধ্যে ১১৬ বিঘা দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর বাদে কোম্পানি প্রতি বৎসর ৪৯৬১ টাকা খাজনা বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

কলিকাতা ও বাগুয়া পরগণার ১৭শ শতাব্দীর অধিবাসীর আর কোন সন্ধান আমরা পাই নাই। তাই বলিয়া ইহা সম্ভবপর নহে যে, ঐ কয়েক ঘর মাত্র ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও মুসলমান এখানে বাস করিতেন। ১৭৫৫ সালের ৩১ জানুয়ারি বিলাতের বোর্ড কলিকাতার কাউন্সিলে একখানি অনুযোগপত্র লেখেন। তাহাতে তাঁহারা বলিয়াছিলেন, "কলিকাতার ন্যায় জনপূর্ণ স্থান বিশেষতঃ অসংখ্য তাঁতীর বাস সত্বেও যে আমরা কিছুমাত্র লাভবান হইতেছি না, ইহাতে আমরা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইতেছি।"[১] লং সাহেব লিখিয়াছেন, "অসংখ্য তাঁতীর বাস বলিয়াই

এই স্থলাভূমিতে কুঠী স্থাপন করা জবচার্ণকের প্রধান উদ্দেশ্য।”[৬] বাগুয়া এবং কলিকাতার মধ্যে অনেক ধানজলা ছিল, তাহার মধ্যে মধ্যে গ্রামগুলি ইতর ও ভদ্রলোকে পূর্ণ ছিল তাহার সন্দেহ নাই। ইংরাজদিগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা আরও বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু বার বার নানাপ্রকার উপদ্রবে জনসংখ্যা হ্রাস হইয়াছিল। প্রথম উপদ্রব ১৬৯৮ সালে, যখন কোম্পানি সুতানুটী কলিকাতা ও গোবিন্দপুর ইজারা লইয়া প্রজাদিগের সহিত আপনাদের বন্দোবস্ত করেন। প্রথমে সেই বন্দোবস্তের উপদ্রবে অনেক পুরাতন বাসিন্দা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। দ্বিতীয় ১৭১৭ খ্রীঃ পর, যখন ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অধিকার পান, তখন হইতে অনেক লোক পলায়নপর হইয়াছিল। তাহার পর ১৭৩৭ সালের প্রবল দৈব উপদ্রব, অর্থাৎ ঝড়, জলপ্লাবন এবং ভূমিকম্প যাহাতে দক্ষিণ বাঙ্গালার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল, তাহাতে এক কলিকাতার ন্যায় নূতন প্রতিষ্ঠিত সহরের দুই শত পাকা অট্টালিকা ভূমিসাৎ হইয়াছিল এবং গঙ্গার উপর প্রায় ৪০ হাত জল উঠিয়াছিল। মনুষ্য যে কত মরিয়াছে, সে সময় কে তাহার সংখ্যা করিয়াছে? অনুমানে তিনলক্ষ লোকের বিনাশ লিখিত হইয়াছিল। ইহাতে পর্ণকুটীরবাসী লোকেরা অধিকাংশই ভাসিয়া গিয়াছিল তাহার সন্দেহ নাই। তৃতীয় উপদ্রব ১৭৫২ সালের দুর্ভিক্ষ। কোম্পানি খাদ্যদ্রব্যের উপর টাকায় অৰ্দ্ধ আনা হিসাবে মাশুল লইতেন। ঐ বৎসর মাশুল অত্যন্ত অধিক আদায় হওয়ায় কোম্পানি কাল জমীদার গোবিন্দরাম মিত্রের নিকট আয় বৃদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসা করায় ২০ নবেম্বর তিনি যে কৈফিয়ত দেন, তাহাতে লিখিয়াছিলেন যে, “এ বৎসর যে প্রকার খাদ্যবস্তু দুর্মূল্য হইয়াছে, গত ৬০ বৎসরের মধ্যে সে প্রকার হয় নাই, তজ্জন্য কোম্পানির দুঃখী প্রজারা ক্ষুধায় এই সহরের মধ্যে কত মরিয়া যাইতেছে, তাহা সকলেই দেখিতেছেন, সকল দ্রব্যই দ্বিগুণের উপর মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় প্রতি টাকায় মাশুলের হারে অনেক অধিক আয় হইয়াছে।” ১৭৫১ ও ৫২ সালের খাদ্যদ্রব্যের মূল্যের একটী তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

	১৭৫১				১৭৫২			
	মণ	সের	টাকা	আনা	মণ	সের	টাকা	আনা
চাউল	১	৩২	১	৪	১	১৬	২	৮
গম	১	৩২	১	৪	১	৬	৪	৭
আটা	১	৩	৩	×	১	×	৮	×
তৈল	১	×	৫	×	১	×	১১	×

এইরূপে খাদ্যদ্রব্য এককালে দ্বিগুণের উপর মূল্যবান হওয়ায় কত দরিদ্র লোক মারা গিয়াছে এবং কত অধিবাসী ঘর বাটী বিক্রয় করিয়া পথের ভিখারী হইয়াছিল, তাহার কি সীমা আছে? তাহার পর সহরের পূর্ব্বাংশ হোগলকুড়িয়া হইতে দলন্দ পর্য্যন্ত কোম্পানি অধিকার করিয়া নূতন বন্দোবস্ত করিলেন তখন কি প্রকার অত্যাচার ও প্রজাশোষণ হইয়াছে, তাহা উপরে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তাহাতেই নূতন সহরের প্রাচীন অধিবাসী তাঁতীকুল নির্ম্মূল হইল। তাহার পর যখন নবাব সিরাজউদ্দোলা আক্রমণ করিয়া লুঠ করিয়াছিলেন, সে সময় পূর্ব্ব হইতে সাধারণ বাঙ্গালী অধিবাসীরা সহর শূন্য করিয়া পলাইয়াছিল, তাহার অনেক প্রমাণ লং সাহেব দিয়া গিয়াছেন। এইরূপে বাগুয়া বা সুতানুটী এবং কলিকাতার প্রাচীন অধিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা কোন না কোন সূত্রে কোম্পানির কার্য্যে ব্যাপৃত ছিল না, তাহারাই লোপ পাইয়াছে, আর যাঁহারা 'কোম্পানির লোক' হইয়াছিলেন, তাঁহারা প্রাণ ভরিয়া দুহাতে দরিদ্র মারিয়া আপনারা বেশ দু পয়সা সংস্থান করিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারাই নিরাপদে আপন আপন পূর্ব্বপুরুষের বাটীতে সম্মানের সহিত বাস করিয়া আসিতেছেন।

গোবিন্দপুর সম্বন্ধে যদিও পূর্ব্বে কিছু বলা হইয়াছে, তত্রাচ পুনরায় আমরা তাহার পুনরালোচনা করিতে বাধ্য হইলাম। সেঠদিগের গোবিন্দজীর নাম হইতে গোবিন্দপুর বলিয়া বাবু গৌরদাস বসাক যে মত প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম, গোবিন্দপুর সম্বন্ধে ষোড়শ শতাব্দীর ভূগোলবেত্তা কবিরাম তাঁহার দিগ্বিজয়প্রকাশে লিখিয়াছেন—

"ইদানীং নৃপশার্দ্দূল চরভূমৌ কথা শৃণু।
কালীদেব্যাঃ সন্নিধৌ চ গঙ্গায়াং প্রাচ্যকে তটে॥
গোবিন্দদত্তো রাজা চ কলিবেদাব্দসহস্রগে।
সিন্ধুসঙ্গমতীর্থযাত্রাকরণার্থং সমাগতঃ॥
গোবিন্দদত্তভূপালং তীর্থাৎ প্রত্যাগতং শুভম্।
কালীদেবী স্বপ্নচ্ছলে নৌকায়াস্তমুবাচহ॥
অকর্ষণীপুরীং রাজন্ আগচ্ছ হি মমাজ্ঞতঃ।
বাদর-রসা-পৃথিব্যাঞ্চ ছেদয়িত্বা তৃণাদিকম্॥
পুরং..............মহতীং মৎসকাশতঃ।
প্রাপ্স্যাসি শৃণু ভূপাল তে কল্যাণং ন চেদপি॥

কালীদেব্যা বচো জ্ঞাত্বা গঙ্গায়াশ্চ তটান্তরে।
বসতিং ভূয়সীং তত্র চকারহি মুদান্বিতঃ ॥
পারীন্দ্রগ্রামাৎ সর্ব্বাণি দ্রবিণানি মহীপতিঃ।
আনয়িত্বা চ বসতিং কৃতবান্ সুরসরিত্তটে ॥
লাঙ্গুলী দ্বিস্কন্ধযুতঃ দেব্যাঃ পৃষ্ঠে চ বর্ত্ততে।
যদাদেশেন তন্মূলে
প্রাপ্তা তেনৈব ভূপেন মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিশি।
কাঞ্চনকর্ষপূরিতাশ্চালভ্যা দেবাসুরৈরপি ॥
ভূরীণি দ্রবিণান্যেব প্রাপ্য গোবিন্দভূপতিঃ।
চতুঃষষ্টিসংখ্যকৈশ্চ বালিভিঃ পুজনং কৃতম্ ॥
গোত্রবৃদ্ধ্যা বিত্তবৃদ্ধ্যা তেজোবৃদ্ধ্যা হি ভূমিপ।
বভূব গোবিন্দদত্তো বর্দ্ধিষ্ঠপ্রবরো মহান্ ॥
ভাগীরথীপূর্ব্বতটে পুরীবর্দ্ধনহেতবে।
বাস্তযাগং দ্বিজান্ নীত্বা চকার বাসহেতবে ॥"

অস্যার্থ—"হে নৃপতিশ্রেষ্ঠ! এক্ষণে চরভূমির কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। গঙ্গার পূর্ব্বপারে কালীদেবীর সান্নিকটে চারি সহস্র কল্যব্দে গোবিন্দ দত্ত নামক একজন রাজা গঙ্গাসাগর তীর্থযাত্রা উদ্দেশে আগমন করেন। যখন তিনি তীর্থকার্য্য সম্পন্ন করিয়া আইসেন, সেই সময়ে কালীদেবী নৌকামধ্যেই তাঁহাকে এইরূপ স্বপ্নাদেশ করেন, 'রাজন! তুমি আমার আজ্ঞায় অকর্ষণ পুরীতে আগমন কর। আমার নিকটবর্ত্তী বাদররসা চরের তৃণগুল্মাদি পরিষ্কার করিয়া একটি মহাগ্রাম সংস্থাপন কর। আমার আজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে তোমার অমঙ্গল হইবে।' রাজা দেবীর আদেশ অবগত হইয়া পারীন্দ্রগ্রাম হইতে নানাবিধ ধনরত্ন আনয়ন করিয়া সুরধুনীতটে বসতি করিলেন। গোবিন্দ-দত্ত স্বপ্নকালে দেবীর পৃষ্ঠদেশে যে একখানি স্কন্ধদ্বয় যুক্ত লাঙ্গল দেখিয়াছিলেন, পরে দেবীর আদেশে ঐ লাঙ্গল দ্বারা তথাকার ভূমি খনন করিয়া প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ অর্থপ্রাপ্ততে আনন্দিত হইয়া গোবিন্দ দত্ত চতুঃষষ্টি বলি দ্বারা দেবীর পূজা করেন। ধন, ধান্য, বংশ ও ধনের বৃদ্ধিপ্রযুক্ত তিনি কালক্রমে ঐ স্থানের বর্দ্ধিষ্ঠ লোক হইয়াছিলেন। এই অচিন্তিত ঐশ্বর্য্যলাভে পুরীর শ্রীবৃদ্ধি এবং ঐ স্থানে বাসের নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণ দ্বারা বাস্তযাগ করাইয়াছিলেন।"

(বিশ্বকোষ, ৩য় খণ্ড, ২৯৪-২৯৫ পৃষ্ঠা)

৩য় প্রস্তাবে এই গোবিন্দ দত্তের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে,এক্ষণে তাঁহার যে উচ্চবংশে জন্ম সংক্ষেপে সেই বংশের কতক পরিচয় প্রদান করিতেছি। খ্রীঃ একাদশ শতাব্দীতে মহারাজ আদিশূর পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে কান্যকুব্জ হইতে আনাইয়া বাঙ্গালায় স্থাপন করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে আঙ্গিরস প্রবর ভরদ্বাজ গোত্রের পুরুষোত্তম দত্ত কান্যকুব্জের অন্তর্গত কৌলঞ্চ প্রদেশ হইতে আসিয়া ভাগীরথী-তীরে বালি নামক গ্রামে বাস করেন। ইঁহারা মসিজীবী ক্ষত্রিয়। ইঁহার গোবর্দ্ধন নামে একটীমাত্র পুত্র ছিলেন, গোবর্দ্ধনের দুই পুত্র, কনক ও নীলাম্বর। কনক ত্রিংশ বৎসর বয়সে বিশ্বনাথ নামক পুত্রমুখ দেখিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কনখলে কনখলানন্দ নাম গ্রহণপূর্ব্বক হিমালয়ে তপস্যায় জীবন শেষ করিয়াছিলেন। নীলাম্বর গৃহে পিতৃসেবায় রত থাকিয়া গোবিন্দ নামক পুত্র উৎপাদন করেন। গোবিন্দ সৌর ছিলেন, সূর্য্যের উপাসনা করিয়া দিবাকর নামে একমাত্র পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। দিবাকর সর্ব্বপ্রথম রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ বিজয়সেন কর্তৃক গ্রামিক পদে বরিত হন। ইঁহার একমাত্র পুত্র মহীপতি রাজা বল্লালসেনের সহিত সমলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দিবাকর দত্ত পুত্রের জন্মের পরেই তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন, আর প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। মহীপতির একমাত্র পুত্র বিনায়ক, তিনি মহারাজ বল্লালের মন্ত্রী ছিলেন, কিন্তু অধিককাল রাজসেবায় থাকিতে পারেন নাই। ইহার কারণ এইরূপ কথিত আছে যে, রাজা বল্লালসেন কায়স্থ ছিলেন, প্রধান কায়স্থ কর্ম্মচারীদিগকে অনেক সময় রাজার সহিত একত্র আহারাদি করিতে হইত, রাজার কোন গুপ্ত দোষ হেতু অপবিত্র হওয়ায় প্রায় সমস্ত কায়স্থ নানা ছলে রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। বিনায়ক দত্ত চক্ষুরোগের ছল করিয়া চাকুরী পরিত্যাগপূর্ব্বক বালিগ্রামে নিজ বাটীতে আসিয়া বসিয়াছিলেন। কায়স্থদিগের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া রাজা আপনার সমস্ত প্রজার জাতিমেলের জন্য তাহাদের প্রতিনিধিদিগকে রাজসভায় উপস্থিত হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। বিনায়ক নিজে উপস্থিত না হইয়া তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র নারায়ণকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। নারায়ণ দত্ত পুরুষোত্তমের অষ্টম পুরুষ; তিনি বয়সে বালক হইলেও ক্ষত্রতেজ ও কুল-গরিমায় বৃদ্ধের ন্যায় তেজোবান ছিলেন। রাজাদেশে ঘোষ, বসু, মিত্র ও গুহ মহাশয় সভয়ে অবনতমস্তকে রাজদ্বারে কেবল যে উপস্থিত হইলেন তাহা নহে, রাজার আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রভাব গ্রহণ

করিলেন, কিন্তু বিনায়ক দত্ত কেবল যে অনুপস্থিত হইলেন তাহা নহে, তাঁহার অল্পবয়স্ক পুত্র কোনমতে রাজাদেশে আপনার বংশগৌরব খর্ব্ব করিতে স্বীকৃত হইলেন না। ইহাতে রাজা বলপূর্ব্বক তাঁহার যজ্ঞোপবীত কাড়িয়া লইয়া অপর চারি শ্রেণীর কায়স্থকে কুলীনত্ব দিয়া তাঁহাকে নিষ্কুলীন করেন। এইরূপ অপমানে নারায়ণ এ প্রকার মর্ম্মাহত হন যে, নিজ বাটীতে আর না প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

দত্ত বংশের ন্যায় ঘোষ বংশের আদি সমাজ বালি। দত্ত ও ঘোষ-গোষ্ঠী একত্র বাস করিতেন। দৈবযোগে দূরদেশে কোন ঘোষ মহাশয়ের সহিত নারায়ণ দত্তের সাক্ষাৎ হওয়ায় তিনি বিস্তর প্রবোধ দিয়া নারায়ণকে স্বদেশে আনয়ন করেন ও বিবাহ দেন। নারায়ণ দত্ত মহারাজ লক্ষ্মণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রণাবলে মহারাজ লক্ষ্মণসেন পশ্চিমে প্রয়াগ, দক্ষিণে পুরুষোত্তম, উত্তরে সমস্ত হিমালয়তল এবং পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত একচ্ছত্র রাজা হইয়া নানা স্থানে আপনার বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব" নামক স্মৃতি-রচয়িতা হলায়ুধ এবং বৈষ্ণব কবিশ্রেষ্ঠ জয়দেব তাঁহার সমকালীন এবং রাজসভাসদ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন হইতে মিথিলার 'লসং' অব্দ প্রচলিত হয়। বর্ত্তমান ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ৭৯৪ লসং চলিতেছে। ইহাতে নারায়ণ দত্তের সময়নিরূপণ অতি সহজে হইতেছে। নারায়ণের গদাধর, হারাধন ও রবি নামক তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। গদাধর বাঙ্গালার শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণসেনের দেওয়ান ছিলেন। আপনার উভয় কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গ্রামিক পদ প্রদান করিয়া হারাধনকে জেজুড়ে এবং তৎকনিষ্ঠ রবি দত্তকে সপ্তগ্রামের অন্তর্গত গঠুগ্রামে স্থাপন করিয়াছিলেন। রাজা যবনভয়ে উড়িষ্যায় পলায়ন করিলে গদাধর দত্ত বালি গ্রামেই বাস করিতে লাগিলেন।

গদাধরের তিন পুত্র, তন্মধ্যে কনিষ্ঠের নাম কানাই বা কানু। তিনি নূতন মুসলমান রাজার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন এবং বিশ্বাস উপাধি প্রাপ্ত হন। তাঁহার দশটী পুত্র, সর্ব্বকনিষ্ঠ মুরারি দত্তই পিতার উপযুক্ত সন্তান ছিলেন, এবং পিতৃ-বিয়োগান্তে তাঁহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মুরারি বিশ্বাস নামে পরিচিত হন। মুরারি দত্ত বিশ্বাসের দুই পুত্র, গণপতি ও তেকড়ি। পিতা উভয় পুত্রকে উভয় স্থানের চতুর্ধূরী পদে নিয়োগ করেন। তদনুসারে গণপতি কুমারহট্টে এবং তেকড়ি আন্দুলের চতুর্ধূরী হন। কিন্তু বালির বাটী, দেবালয় প্রভৃতি রক্ষা হেতু মুরারির সহধর্ম্মিণী তেকড়ির পুত্র রত্নাকরকে লইয়া বাস করিতেন। মুরারি

বিশ্বাস মহাশয়কে বার্ষিক কর প্রদান উদ্দেশ্যে দিল্লী গমন করিতে হইত,সম্রাট ও তাঁহাকে যথেষ্ট সম্মান দান করিতেন।

১. সুতানুটীর পূর্ব্ব সীমা হোগলকুড়িয়া।

২. পরগণা কলিকাতার উত্তরাংশ, সুতানুটীর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশ মৃজাপুর পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বে মাণিকতলার দক্ষিণ বর্ত্তমান গড়পার প্রভৃতি সমস্ত স্থান ডিহি সিমলার অন্তর্গত। মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীটে রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের বাটীর সম্মুখে যে বাজারটিকে টিকটিকি বা পোড়াবাজার বলে, বহু পূর্ব্বে উহা সিমলা বাজার বলিয়া পরিচিত ছিল, ১৭৮৪ খ্রীঃ ম্যাপে উহাকে পুরাতন সিমলা বাজার এবং বর্ত্তমান সিমলা বাজারকে নূতন সিমলা বাজার বলিয়া লিখিত আছে। এই সিমলায় বিস্তর তন্তুবায় অতি মূল্যবান ছিট বুনিত, তাহার জন্যই এ প্রদেশের সকল গ্রাম অপেক্ষা সিমলা গ্রামের আয় অনেক অধিক ছিল, এবং এই ছিটের জন্যই কোম্পানির এই গ্রামের প্রতি এত লোভ। তাঁহারা ইহা কৌশলে আয়ত্ত করিয়া তন্তুবায়দিগের প্রতি এমন অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছিলেনযে,তাহারাব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া চারিদিকে পলাইতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিলাতের অধ্যক্ষ সভা হইতে ১৭৫৫খ্রীঃ ৩১ জানুয়ারির পত্রে ঐ তন্তুবায়দিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়া তাঁহাদের ব্যবসায়ের উন্নতি করিবারজন্য কলিকাতায় কাউন্সিলেঅনুরোধ আসিয়াছিল। ক্রমে উহাদিগের প্রতি অত্যাচার এবং উহাদের পলায়ন হেতু কোম্পানির ক্ষতি যখন বোর্ডের নিকট বিবিধ সূত্রে পঁহুছিল, তখন ১৭৫৭ খ্রীঃ ২৫ মার্চ্চ বোর্ড কলিকাতার কাউন্সিলে লিখিলেন, "আমরা বারবার আগ্রহের সহিত তোমাদের অনুরোধ করিতেছি যে, তোমরা অধিবাসীদিগকে ব্যবসায়ের সুবিধা করিয়া দিবে এবং গরীবদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে। ইহার জন্য আমরা তোমাদের বিশেষতঃ মিঃ হলওয়েলের উপর নির্ভর করিয়া আশা করিতেছি যে, সাবধানে স্বীয় স্বীয় কার্য্য করিয়া আমাদের সদভিপ্রায় সাধনে সাহায্য করিবে। তাহার পর ২৫শে মার্চ্চ আবার লিখিয়াছেন, "আমরা শুনিতেছি, কলিকাতার লোক-সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে, আমরা জানিতে চাহি, ইহা সত্য কি না? অতএব তোমরা এ বিষয় অনুসন্ধান করিবে। যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ইহার প্রকৃত কারণ আমাদিগকে জানাইবে।" ১৭৫৮ সালের ৩রা মার্চ্চ তারিখে বোর্ড আবার কলিকাতার কাউন্সিলে পত্র লিখিয়া আদেশ করেন যে, "ঢাকা, কাশীজোড়া ও শান্তিপুর প্রভৃতি স্থান হইতে তাঁতীদিগকে আনাইয়া দুর্গের নিকট সহরে এবং

কোম্পানির আয়ত্তাধীন ৩৮ খানি গ্রামে বসাইয়া উপরোক্ত স্থানসকলের বস্ত্র বিশেষতঃ কলিকাতার নানা বর্ণের ছিট বুনিতে উৎসাহ প্রদান করিবে।" সিমলার তাঁতীরা অনেকে ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়াছিল, অনেকে ফরাসীদিগের আশ্রয়ে চন্দননগরে গিয়া বাস করে। কোম্পানির লোকেরা যাহাদিগকে আনিয়া আবার সিমলায় বসাইলেন, তাহারা ছিট-বোনা তাঁতী নহে, অনেকে সূক্ষ্ম বস্ত্র বুনিতে পারিত। সেই সময় হইতে সিমলা ছিটের পরিবর্ত্তে ধুতির জন্য বিখ্যাত হইল।

৩. Selection from Unpublished Records of Government, page 52.

৪. Do, Do, foot-note

৫. সিমলা এবং পাগলাডাঙ্গা যখন সংলগ্ন গ্রাম, তখন উহা নিশ্চয় পটলডাঙ্গার পূর্ব্ব-নাম হওয়া সম্ভব। আমরা সমস্ত পুরাতন ম্যাপ দেখিলাম, অথচ পাগলাডাঙ্গা নাম কোথাও দেখিতে পাই নাই।

৬. U. P. Records, footnote, page 121

৬

তেকড়ির প্রকৃত নাম দেবদাস দত্ত, তিনি আন্দুলে আসিয়া সরস্বতীতীরে বৃহৎ অট্টালিকা, দেবালয় প্রভৃতি রাজোপযুক্ত কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। কবিরাম তাঁহার দিগ্বিজয়প্রকাশ গ্রন্থে আন্দুলের প্রকৃত নাম এক স্থলে 'চান্দোল' অপর স্থানে 'পারীন্দ্র' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। দেবদাস দত্তের ভবন এক্ষণে ভগ্নস্তূপ ও জঙ্গলে পরিণত হইয়া রহিয়াছে এবং কতক অংশে মিশ্র মহাশয়েরা বাস করিতেছেন। দেবদাসের সময় হইতে ইঁহারা চৌধুরী উপাধিতে পরিচিত হইয়াছেন। আন্দুলের অনেক কায়স্থ ও ব্রাহ্মণাদি চৌধুরী-দিগের দ্বারা তাঁহাদের প্রদত্ত ভূমিতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এক্ষণে আন্দুলের যাঁহারা রাজা বলিয়া পরিচিত, তাঁহারা এবং আন্দুলের মল্লিক বংশ চৌধুরীদিগের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত বলিয়া শুনা যায়।

দত্তবংশে একটী অদ্ভুত কিম্বদন্তি প্রচলিত আছে। তেকড়ি দত্তের পুত্র রত্নাকর যিনি পিতামহীর সহিত বালির বাটীতে বাস করিতেন, তাঁহার সপ্তদশ বৎসর বয়ক্রমকালে একদিন স্নানান্তে গঙ্গাতীরে পূজাহ্নিক করিতেছেন, এমন সময় জোয়ার আসিয়া ক্রমে তাঁহার কোষা স্পর্শ করিল, সেই সঙ্গে একটি ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড আসিয়া তাম্রকোষায় পড়িবামাত্র কোষা সুবর্ণ হইয়া গেল। নির্লোভী রত্নাকর প্রস্তরখণ্ড লইয়া গঙ্গাজলে দূরে নিক্ষেপ করিলেন, দ্বিতীয়বারও ঐরূপ হইল, তৃতীয়বার প্রস্তরখণ্ড আসিয়া কোষায় পড়িলে বুঝিলেন, ইহাতে মা লক্ষ্মীর গূঢ় অভিপ্রায় আছে, তখন তাহাকে লইয়া পিতামহীকে প্রদান করিলেন। বৃদ্ধা প্রস্তরখণ্ড লৌহে স্পর্শ করিবামাত্র দেখিলেন, লৌহ স্বর্ণ হইল, তখন তাহাকে স্পর্শমণি নিশ্চিত জানিয়া গোপন করিয়া লক্ষ্মীর কৌটায় রক্ষা করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরে রত্নাকরের পিতার মৃত্যু হইলে তিনি আন্দুলে গিয়া মহা আড়ম্বরে শ্রাদ্ধক্রিয়া সম্পন্ন করেন। এই ব্যাপারে কাশী, কাঞ্চী, মিথিলা, দ্রাবিড় প্রভৃতি যে যে স্থানে পণ্ডিতমণ্ডলীর অধিষ্ঠান ছিল, সর্ব্বত্র হইতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও ভিক্ষাজীবীরা আহুত হইয়া প্রচুর ভোজ্য ও অপরিমিত সুবর্ণ লাভ করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। ইহাতেই রত্নাকরের স্পর্শমণি প্রাপ্তির কথা

সর্ব্বত্র প্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। ক্রমে এই কথা বাদসাহেরও কর্ণগোচর হয়, তিনি স্পর্শমণি সহ রত্নাকরকে রাজধানীতে আনিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করেন। রত্নাকর ভাবিলেন, স্পর্শমণির কথা অস্বীকার করিলে বাদসাহের সৈন্যরা সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিবে এবং জাতিধর্ম্ম সমস্ত নষ্ট হইবে, প্রাণ অপেক্ষা মান ও ধর্ম্ম বড়, সুতরাং মণিসহ বাদসাহের লোকদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া রাজধানী যাত্রা করিলেন। কাঞ্চননগরের সম্মুখে আসিয়া রত্নাকর ভাবিলেন, দেবদত্ত মণি আমি কেমন করিয়া মুসলমানের হস্তে প্রদান করিব, তাহা কখনই পারিব না, অথচ মণি আমার গৃহে আছে সন্দেহ করিলে গৃহ, পরিবার রক্ষা হইবে না, অতএব ইহাদিগকে মণি দেখান আবশ্যক। এই ভাবিয়া উহা বাহির করিয়া তাহাদিগকে দেখাইলেন, সত্যতা প্রমাণের জন্য লৌহখণ্ডকে স্বর্ণে পরিণত করিলেন, শেষে নিজে মণিসহ নদীতে ঝম্প প্রদান করিয়া প্রাণত্যাগ করেন।

এই কিম্বদন্তি হইতে অন্ততঃ ইহা বুঝা যায় যে, রত্নাকর অত্যন্ত ধনবান থাকায় পিতৃশ্রাদ্ধে এত ব্যয় করিয়াছিলেন যে, দৈব সাহায্য ভিন্ন সে প্রকার ব্যয় করা সম্ভব নহে। তাহাতেই উক্ত স্পর্শমণির কথা উঠিয়া থাকিবে।

রত্নাকরের পুত্র কামদেব দত্ত চৌধুরী পিতৃমৃত্যু শ্রবণান্তে যথাবিধি শ্রাদ্ধকার্য্য সমাধা করিয়া তীর্থভ্রমণে বহির্গত হন। আর্য্যাবর্ত্তের প্রধান প্রধান সমস্ত তীর্থই তিনি দর্শন করিয়াছিলেন। গয়া তীর্থে গমন করিয়া প্রেত-শৈলে আরোহণ করিতে অত্যন্ত কষ্টানুভব করেন, অপর যাত্রীদিগেরও কষ্ট দর্শন করিয়া তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছিলেন, ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে, "আমি অবশ্য এই পর্ব্বতে উঠিবার জন্য নিম্ন হইতে উপর পর্য্যন্ত সোপান প্রস্তুত করিয়া দিব, যদি আমার পরমায়ু শেষের পূর্ব্বে ইহা সম্পন্ন না হয়, তাহা হইলে আমার পরবংশে কেহ না কেহ যেন এই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আমায় প্রতিজ্ঞা-পাশ হইতে মুক্ত করে।" বহুকাল পরে তাঁহার সপ্তম নিম্ন-পুরুষ হাটখোলার পুণ্যশ্লোক মহাত্মা মদনমোহন দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা ১১৮২ সনে বহু ব্যয়ে ৩৯৫টী সোপান নির্ম্মাণ-পূর্ব্বক পূর্ব্বপুরুষের এই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন।

কামদেবের পুত্র কৃষ্ণানন্দ। ইঁহার সময়ে বঙ্গদেশ ও উড়িষ্যা শ্রীচৈতন্যদেবের হরিভক্তিস্রোতে প্লাবিত হয়। আন্দুলের চৌধুরী-গৃহেও তাহার তরঙ্গ পঁহুছিয়াছিল। নিত্যানন্দদেব একদিন উড়িষ্যা যাত্রাকালে আন্দুলে পদার্পণ করেন। কৃষ্ণানন্দ দত্ত চৌধুরী সাদরে তাঁহাকে কয়েকদিন নিজালয়ে রাখিয়া ভক্তিপূর্ব্বক সগোষ্ঠী বান্ধবে সেবা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবদিগের উদ্দাম কীর্ত্তনে আন্দুল

নগর টলমল করিয়াছিল। (অবশ্য ইহা ১৫১০ হইতে ৩৩ খ্রীঃ মধ্যে) তদবধি কৃষ্ণানন্দ চৌধুরী বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কিন্তু তাঁহার পুত্রেরা পূর্ব্বপুরুষের গুরুমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণব গুরুর মন্ত্র গ্রহণ করেন নাই। চৌধুরী কৃষ্ণানন্দের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ মাধবরাম পিতার বর্ত্তমানেই আন্দুল ছাড়িয়া চৌয়াগ্রামে গিয়া বাস করায়, তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র কন্দর্পরামকে বিষয়াদি বুঝাইয়া দিয়া আপনি বৈরাগ্য অবলম্বনপূর্ব্বক পুরুষোত্তমে প্রস্থান করিলেন। তথায় আন্দুল মঠ নামে একটী মঠ স্থাপন করিয়া দিবানিশি হরিনামসাধনায় জীবনপাত করিয়াছিলেন।

কন্দর্পরাম অতি যোগ্যতার সহিত রাজকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। আন্দুলের দুই ক্রোশ দক্ষিণে সুগভীর জলবেষ্টিত দ্বীপাকার সুবিস্তৃত ভূখণ্ড তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করায় তিনি তথায় একটী সুন্দর নগর স্থাপন করিয়া তাহার নাম কন্দর্পনগর রাখিয়াছিলেন। সেই সুগভীর জলরাশি ক্রমে ভরাট হইয়া এক্ষণে বিস্তৃত বিলরূপে পরিণত হইয়াছে। কন্দর্পনগর "কেঁদো" বা "কেন্দু" নাম প্রাপ্ত হইয়াছে; ইহার অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে বেঙ্গল নাগপুর রেল কোং "আবাদা" নামে ষ্টেশন খুলিয়াছেন। কন্দর্পরামের তিন পুত্র, রামশরণ, গোবিন্দশরণ ও হরিশরণ।

দুর্ভাগ্যক্রমে জ্ঞাতিবিরোধই ভারতের চিরদিন সর্ব্বনাশ করিয়া আসিতেছে। কুরুকুল হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেই আবহমানকাল জ্ঞাতিবিরোধাগ্নিতে জ্বলিয়া ছারখার হইয়াছে। এ পর্য্যন্ত আন্দুলের চৌধুরী বংশে জ্ঞাতিবিরোধ হইবার অবসর আইসে নাই, কারণ তেকড়ি হইতে কন্দর্প-রাম পর্য্যন্ত এক এক পুরুষই উত্তরাধিকারি হইয়া আসিয়াছেন, সুতরাং বিবাদাগ্নি জ্বলে নাই। কন্দর্পরামের তিন পুত্রে অতি ভয়ানক বিবাদ বাধিয়া উঠিল। রামশরণ জ্যেষ্ঠ বিধায় সমস্ত বিভবের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, অগত্যা মধ্যম ও কনিষ্ঠ গৃহত্যাগ করিতে বাধ্য হন। মধ্যম গোবিন্দশরণ কলিকাতার দক্ষিণ "বাদররসা" নামক চরে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিলেন এবং নিজ নামে তাহার গোবিন্দপুর নাম প্রদান করিলেন। কবিরাম তাঁহার দিগ্বিজয়প্রকাশ নামক ভূগোল-গ্রন্থে গোবিন্দপুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়াছি। কনিষ্ঠ হরিশরণ দত্ত চৌধুরী মুড়াগাছা পরগণার বরদা নামক গ্রামে গিয়া বাস করেন। হরিনাভির দক্ষিণাঞ্চলে তাঁহার বংশের অল্প পরিবার দেখিতে পাওয়া যায়। গোবিন্দশরণ নিজে চৌধুরী উপাধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, অপর দুই ভ্রাতার বংশ আজিও উক্ত উপাধিতে পরিচয় দান করিয়া থাকেন।[১]

১৫৮৪ খ্রীঃ রাজা টোডরমল্ল, বাদসাহ আকবরের নবজিত বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার খাজনা বন্দোবস্ত করিতে আসিলে গোবিন্দশরণ দত্ত তাঁহার অধীনে চাকুরী গ্রহণ করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার এইবার তিনি বিশেষ সুবিধা পাইলেন, রামশরণের খাজনার হার অসম্ভব বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলেন। এইরূপে অনেক ভূম্যধিকারীর খাজনা বৃদ্ধি দেখাইয়া তিনি টোডরমল্লের নিকট নিজ প্রতিষ্ঠিত গোবিন্দপুর জায়গীরস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। গোবিন্দশরণ কেবল জ্যেষ্ঠের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া ক্ষান্ত হন নাই, কবিরাম লিখিয়াছেন, 'রাজা গোবিন্দ দত্ত পারীন্দ্র গ্রাম হইতে বিবিধ সম্পত্তি আনিয়া স্বগ্রামের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।' আন্দুলের চৌধুরীবংশেও শুনা যায়, তিনি বাদসাহের সৈন্যদিগের সাহায্যে আন্দুল লুণ্ঠন করিয়া বিবিধ সম্পত্তি সহ কুলবিগ্রহকে লইয়া যান। পরে রামশরণ "রাজ রাজেশ্বর' নামক বিগ্রহ স্থাপন করেন, এখন তিনিই আন্দুলে আছেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, আন্দুলের অপর নাম "পারীন্দ্র গ্রাম"।

এক্ষণে আন্দুলের চৌধুরীবংশের অবস্থা বর্ণনা করিতে প্রবৃত্ত হইব। একে সর্ব্বস্ব লুণ্ঠিত হইল, অন্যদিকে অতিরিক্ত হারে খাজনা বৃদ্ধি, তদুপরি উড়িষ্যার পাঠানেরা ও আরাকানের মগেরা আসিয়া প্রায়ই উপদ্রব করায় রামশরণ বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তাঁহার ছয় পুত্র, মহেশচন্দ্র, শিবরাম, জগন্নাথ, পার্ব্বতী, পরমচাঁদ ও কাশীশ্বর। পিতার মৃত্যুকালে সর্ব্বকনিষ্ঠ কাশীশ্বর মাতৃগর্ভে ছিলেন। যাঁহারা সাবালক হইয়াছিলেন, তাঁহারা পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিয়া এমন নিঃস্ব হইয়া পড়িলেন যে, জমীদারী রক্ষা করা ভার হইয়া উঠিল। অগত্যা দেবোত্তর ভিন্ন অপর সমস্ত জমী হস্তান্তর হইয়া গেল। কাশীশ্বর চৌধুরীর বয়স যখন ১৭ বৎসর, সেই সময় সম্রাটপুত্র সাজিহান উড়িষ্যা হইতে ফিরিবার সময় সপ্তগ্রাম দেখিবার জন্য সরস্বতীর মধ্য দিয়া বজরাযোগে গমন করিয়াছিলেন। অতি সুন্দর পারস্যভাষাবিদ্ কাশীশ্বর একখানি দরখাস্ত লিখিয়া তাহাতে আপনার বংশমর্য্যাদা ও বর্ত্তমান অবস্থা বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়া নদীতীরে দণ্ডায়মান থাকেন। একটী সুন্দর বালককে একখানি দরখাস্ত হস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া বাদসাহ নিকটে আহ্বান করিলেন। সাহসী কাশীশ্বর অকুতোভয়ে তাঁহার সম্মুখীন হইয়া অভিবাদনপূর্ব্বক উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত আবেদনপত্র প্রদর্শন করিলে তিনি কতক জমীদারী প্রত্যর্পণ করেন। ইহার আয় হইতে কয় ভ্রাতা সচ্ছলরূপে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া পুরাতন বাটী পরিত্যাগ-

পুর্ব্বক নূতন অট্টালিকা ও সুউচ্চ বৃহৎ পাকা চণ্ডীমণ্ডপ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের নির্ম্মিত গৃহ ও চণ্ডীমণ্ডপ আজিও বর্ত্তমান আছে। কিন্তু মগ ও পর্টুগীজদিগের হস্তে তাঁহারাও বার বার লাঞ্ছিত হইতেন, শেষে উঁহাদের পুত্র-পৌত্রদের সময় ১৭৪১ খ্রীঃ বর্গীরা আসিয়া তাঁহাদের যথাসর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লওয়ায়, অনেকেই কলিকাতায় পলাইয়া আসেন। কাশীশ্বরের নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পরমচাঁদ চৌধুরীর পৌত্র বিনোদবিহারী কলিকাতায় আসিয়া হাটখোলায় গোবিন্দশরণের পৌত্র রামজীবন দত্তের বাটীতে বাস করেন। গোবিন্দশরণের পৌত্রেরা অনেকে কোম্পানির অধীনে চাকুরী পাইয়াছিলেন, রামজীবন দত্তও কোন এক বিভাগে উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন, তিনি অতি সহজে আশ্রিত জ্ঞাতি-ভ্রাতুষ্পুত্রকেও একটী কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া দেন। বর্গীর হাঙ্গামা থামিয়া গেলে অপর চৌধুরীরা আন্দুলে ফিরিয়া গেলেন বটে, কিন্তু বিনোদ চাকুরীর মায়া ছাড়িয়া আর গ্রামে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন না। তদবধি রামশরণের বংশের মধ্যে কেবল তাঁহার একজন প্রপৌত্র আসিয়া কলিকাতায় বাস করিলেন এবং তাঁহারই বংশীয়েরা পুরুষানুক্রমে তাঁহা হইতে সপ্তম পুরুষ কলিকাতার অধিবাসী হইয়াছেন, নতুবা আর সকল গোষ্ঠীই আন্দুলে বাস করিতেছেন।

গোবিন্দশরণ দত্ত প্রকৃত রাজার ন্যায় বাস করিতেন, তাঁহার আহ্বানে চারিদিক হইতে কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, নবশাখ প্রভৃতি আসিয়া গোবিন্দপুর পরিপূর্ণ করিয়া ফেলিল। কিন্তু এই গ্রামে সুবর্ণবণিক, মুসলমান ও উত্তর-পশ্চিমের কোন লোক বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গোবিন্দপুরকে গড় গোবিন্দপুর বলিত, কারণ ইহা চতুর্দ্দিকে জলবেষ্টিত ছিল। পশ্চিমে গঙ্গা, দক্ষিণে আদি গঙ্গা (যাহাকে গোবিন্দপুর খাল বলিত), পূর্ব্বদিকে চৌরঙ্গীর জলা ও জঙ্গল এবং উত্তরে গঙ্গা হইতে বাদা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ খাল অবস্থিত ছিল। বাস্তবিক এইরূপে জলবেষ্টিত থাকায় ইহা প্রকৃত স্বাভাবিক দুর্গরূপে নিরাপদ ছিল। মগ এবং অপরাপর দস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত হইবার ভয় ছিল না। কালীঘাটের সংলগ্ন হওয়াও এই গ্রাম হিন্দুদিগের আর একটী আকর্ষণের স্থান। তাহার উপর আবার সেই সময় সরস্বতী নদী মজিয়া যাইতেছিল, ত্রিবেণীর নিকট হইতে গঙ্গা একেবারে দক্ষিণদিকে ধাবিত হইয়া বাদররসা হইতে সাঁকরাইল পর্য্যন্ত যে নিমকির অপ্রশস্ত খাল ছিল,[২] তাহাকে বিস্তৃত করিয়া তন্মধ্য দিয়া প্রবাহিত

হওয়ায় লোকে বুঝিল, সামুদ্রিক পোতসকল নিশ্চয় এই পথে আসিতে বাধ্য হইবে, সুতরাং গোবিন্দপুরের ঘাটে খরিদ বিক্রী যথেষ্ট হইবে। এই আশায় সপ্তগ্রাম হইতে শেঠ বসাকেরা আসিয়া গোবিন্দপুরে বাস করিলেন। সুবর্ণবণিকেরা ও পাঞ্জাবের দু-একজন শিখ মহাজন প্রভৃতি আসিয়া কলিকাতায় বাস করিয়াছিলেন। বাস্তবিক তাঁহাদের অনুমান সত্য হইল, সমস্ত অর্ণবপোত আসিয়া গোবিন্দপুরের ঘাটে দাঁড়াইতে লাগিল। ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম পর্টুগীজদিগের জাহাজ আসিয়া গোবিন্দপুরের হাটে দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়াছিল। দেখিতে দেখিতে গোবিন্দপুরের হাট অতি বৃহৎ হইয়া উঠিল এবং জনসমাগমের বাহুল্যে ইহার উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমে লোকের বসবাস আরম্ভ হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, পোস্তার হাট যে কতকালের প্রাচীন, তাহার কোন স্থিরতা নাই; কিন্তু এখানে বিশিষ্ট লোকের বসবাস না থাকায় সে হাটে কোন মূল্যবান বস্তু বিক্রয় করিতে কেহ আসিত না, কেবল গণ্ডগ্রামের উপযোগী তরিতরকারি বিক্রয় হইত মাত্র। ঐ পোস্তার হাটও লোকসমাগমে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, কিন্তু সেই তরিতরকারি ভিন্ন আর কিছুতে নহে। গোবিন্দপুরের হাটের লভ্য গোবিন্দশরণের সম্পত্তি। শেঠ বসাকেরা বড় ব্যবসাদার, তাঁহাদিগকে জমীদারের তহবিলে অনেক মাসুল দিতে হয়। এই মাসুল দেওয়া অপেক্ষা অন্যত্র ব্যবসার স্থান খুলিলে মাসুল বাঁচিয়া যায় মনে করিয়া, তাঁহারা আহিরীটোলা গ্রামের ঘাটের নিকট নূতন হাট খুলিয়া ব্যবসায় করিতে লাগিলেন, তাহা হইতেই সুতানুটীর হাট স্থাপিত হয়। ১৬৫৬ খ্রীঃ ডেনমার্কবাসী ভলেণ্টাইনের ম্যাপে ইহাকে "চিটানুটী" বলিয়া লিখিত আছে। শেঠেরা নূতন হাট বসাইলেও গোবিন্দপুরের হাটের কোন ক্ষতি হয় নাই, বণিকেরা সকল হাটে ঘুরিয়া জিনিষ-পত্র ক্রয় করিত। জব চার্ণকের প্রেরিত পত্রে সে সময় কলিকাতার উল্লেখ থাকিত না, কোন পত্রে সুতানুটী কোন পত্রে গোবিন্দপুর ঠিকানা থাকিত।

বিভার্লি সাহেব ১৮৭৬ খ্রীঃ জনসংখ্যার পরিশিষ্টে অর্ম্মির ইতিহাস হইতে লিখিয়াছেন, ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানি নবাবের নিকট হইতে তিনখানি গ্রাম তৎকালের জমীদারদিগের নিকট ক্রয় করিবার অধিকার পান এবং তাহার জন্ম প্রতি বৎসর ১ হাজার ১৯৫, টাকা নবাব সরকারে খাজনা দিবার বন্দোবস্ত হয়। এই তিনখানি গ্রাম সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। আমরা পূর্ব্বে অনুমানে বলিয়াছি, উহা গোবিন্দপুর নহে, বাণ্ডয়া হওয়াই সম্ভব। আবার অর্ম্মির ২য় ভাগের ১৭ পৃষ্ঠায় দেখা যায়, উহা দীর্ঘে ৩ মাইল মাত্র। পূর্ব্বে যে

পুরাতন সীমাস্তম্ভের কথা উল্লেখ করা গিয়াছিল, অর্থাৎ উত্তরে বাগুয়া বাজারের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটী, আর আধুনিক পুলিস ঘাটে একটী, তাহা মাপিলে ঠিক তিন মাইল হয়, কিন্তু গোবিন্দপুরের খালের মুখ পর্য্যন্ত মাপিলে পাঁচ মাইলের কম হয় না। গবর্ণমেণ্টের পুরাতন রেকর্ড অতি অল্পই পাওয়া যায়, ১৭৪৮ সালের পূর্ব্বের কোন রেকর্ড এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই, ১৭৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ৩০ এপ্রেল গবর্ণর কাউন্সিলে হুগলির ফৌজদারের চারি মাসের খাজনা প্রদান মঞ্জুর হয়, উহাতে দেখা যায়ঃ—

সুতানুটি, কলিকাতা	৩২৫ৎ
গোবিন্দপুর পাইকার[৩]	৭০ৎ
গোবিন্দপুর কলিকাতা	৩৩ৎ
বক্‌সিস	১৷৷০[৪]

উপরে বলা হইয়াছে, ১৬৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনখানি গ্রাম জমীদারদিগের নিকট খরিদ করিয়া নবাবকে বার্ষিক ১১৯৫ৎ টাকা কর দিবার বন্দোবস্ত হয়। রেকর্ডে পাওয়া যাইতেছে, সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পাইকানের চারি মাসের কর ৩৯৫ৎ, ইহাকে তিন গুণ করিলে ১১৮৫ হয়, ৯৫ হয় না।

সুতরাং অর্ম্মি ৮কে ভ্রমক্রমে ৯ করিয়াছেন, অনেক ইতিহাসই অর্ম্মির ভ্রমটী তুলিয়া আসিতেছেন, আমরা অবশ্য রেকর্ডকে সমধিক প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিব। যাহা হউক, এক্ষণে আমরা উক্ত ভ্রম লইয়া বিতর্ক করা আবশ্যক মনে করি না, কিন্তু উক্ত হিসাবে ইহারই প্রমাণ হইতেছে যে, ১৬৯৮ খ্রীঃ কোম্পানি সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর পাইকান প্রথম ক্রয় করেন, পরে কোন সময় গোবিন্দপুর কলিকাতা ক্রয় করিয়াছিলেন। অন্য একখানি ইতিহাসে দেখা গিয়াছে, ১৭১০ খ্রীঃ উহা ক্রীত হইয়াছিল, যাহার জন্য নবাব সরকারে আরও ৯৯ৎ টাকা বার্ষিক খাজনা দিতে কোম্পানি বাধ্য হইয়াছিলেন। গোবিন্দ-পুর পাইকান ও গোবিন্দপুর কলিকাতা এই দুইটা স্বতন্ত্র নাম হওয়ার ভাবেও বুঝা যায়, দুইটা দুইবার ক্রীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এক প্রস্তাবে বলা হইয়াছে, চৌরঙ্গীর কতক অংশ কলিকাতার মধ্যে অপর কতক অংশ পাইকান পরগণার ভিতর ছিল। অনেক ইতিহাসেই দেখা যায়, পূর্ব্বে চৌরঙ্গীর জলা জঙ্গলের মধ্যে মধ্যে ইতর লোকদিগের সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ণকুটীর দেখা যাইত। বলা যাইতে পারে, ইহা উক্ত গোবিন্দপুরেরই প্রান্তভাগ। সমস্ত প্রাচীন গ্রামেরই নিয়ম যে, অস্পৃশ্য জাতিরা গ্রামের প্রান্ত-

ভাগে বাস করে, সেইজন্য নিকৃষ্ট জাতিদিগের সাধারণ নামই প্রান্তবাসী। ঐ প্রান্তভাগ পাইকান পরগণার মধ্যে, আর গঙ্গার ধারের প্রকৃত গ্রামটী যাহাকে আমরা একসময় বার্ব্বাকপুর পরগণার মধ্যে বলিয়াছিলাম, তাহা কলিকাতা পরগণার মধ্যে হওয়া সম্ভব। কিন্তু প্রথমে কোম্পানি দত্ত মহাশয়দিগের নিকট হইতে প্রকৃত গ্রামটী ক্রয় করিতে সক্ষম হন নাই, তবে প্রান্তভাগের জলা জঙ্গলটী প্রদান করিতে তাঁহাদের আপত্তি না হইতে পারে। ইংরাজ চিরন্তন কৌশলে প্রথমতঃ উক্ত জলা জঙ্গলটী বার্ষিক ২১০৲ টাকা খাজনা দিয়া গ্রহণ করিয়া আপনাদের কৌশলজাল ক্রমে বিস্তার করিতে লাগিলেন। দত্ত বাবুদিগের যে যুবা বুদ্ধিমান, কোম্পানি তাঁহাদিগকে আপনাদিগের অধীনে চাকুরী দিয়া বশীভূত করিতে লাগিলেন, গোবিন্দ দত্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাণেশ্বরের তৃতীয় পুত্র রামচন্দ্র দত্ত কোম্পানির মাল আমদানী-রপ্তানির দেওয়ান পদে নিযুক্ত হন, আর গোবিন্দ দত্তের চতুর্থ পুত্র রামনারায়ণের একমাত্র পুত্র রামজীবনকে আর একটী উচ্চকর্ম্মে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। কয়েক বৎসর পরেই কোম্পানি তাঁহাদিগের নিকট তাঁহাদের বাসভূমি ক্রয়ের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, এবং সেই সঙ্গে সুতানুটী গ্রামের মধ্যে তাঁহাদের আবশ্যকমত নিষ্কর জমী প্রদানেরও প্রলোভন দেওয়া হয়। কোম্পানির প্রথম আমলের চাকুরী এক অদ্ভুত ব্যাপার, দত্তজেরা কি সেই চাকুরীর লোভ ছাড়িয়া কোম্পানির সহিত গ্রাম লইয়া বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে পারেন? কখনই নহে। গ্রামখানি কোম্পানিকে বেচিয়া রামচন্দ্র দত্ত জোড়াসাঁকো[৫] হইতে রামবাগান পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ জমী দখল করিয়া লইয়া বাড়ী ও বাগান প্রস্তুত করিলেন, রামজীবন দত্ত আহিরীটোলা হইতে যোড়াবাগান পর্য্যন্ত ভূমি লইয়া গঙ্গার ধারে সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।[৬] রামচন্দ্র ও রামজীবনের অপর ভ্রাতারা গোবিন্দপুরেই রহিলেন। নূতন বাটীতে রামচন্দ্র দত্ত একটী শিব-প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, সেটী বাণলিঙ্গ, নর্ম্মদা নদীর মূল স্রোত বাণগঙ্গা হইতে তাঁহাকে আনিয়া প্রতিষ্ঠা করা হয়, উহার নাম "রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু।" পাঠকগণ চিৎপুর রোড জোড়াসাঁকোর স্বর্গীয় বাবু শ্রীকৃষ্ণ মল্লিকের বাটীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে গুপ্তস্ লেনের মোড়ে রাস্তার ধারে যে শিবের ক্ষুদ্র ঘর ও বাণলিঙ্গ মহাদেব দেখিয়া থাকেন, ইনিই সেই "রামচন্দ্রেশ্বর শম্ভু", আজিও হাটখোলার দত্তবাটী হইতে ইঁহার পূজা আসিয়া থাকে। শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটী হইতে জোড়াসাঁকোর মোড় পর্য্যন্ত রামদত্তের বাটীর পশ্চিম সীমা, এবং পূর্ব্বে রামবাগান পর্য্যন্ত সমস্তই রামচন্দ্র দত্তের বসতবাটী ও বাগান ছিল।

সিরাজউদ্দৌলার আক্রমণকালে রাস্তা দিয়া সৈন্তের গতিবিধি হওয়ায় ইঁহারা বিশেষ বিপদগ্রস্ত হন। রামজীবন দত্তের পুত্রেরা গঙ্গার ধারে বাটী থাকায় অনায়াসে নৌকাযোগে পলায়ন করিতে পারিয়াছিলেন, কিন্তু রামচন্দ্রের পুত্রেরা তাহা পারেন নাই। প্রাণ হাতে করিয়া সপরিবার লুক্কায়িতভাবে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেক সম্পত্তি লুটও হইয়াছিল। রামচন্দ্র দত্তের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অনন্তরামের পুত্র দুর্গারাম ও গঙ্গারাম। সহরবাসীরা যুদ্ধকালে যে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা কোম্পানি পরিশোধ করিতে চাহিলে যে সকল কমিশনার নিযুক্ত হয়, ইঁহারা দুইজনে তন্মধ্যে ছিলেন। গঙ্গারাম দত্তপতি নিজ হিসাবে ২৫১ টাকা দু-আনা প্রার্থনা করিয়া ৫১৩৲ টাকা, আর দুর্গারাম ৬৪৭৲ টাকার স্থানে ১০০৲ টাকা পাইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে সেইজন্য তাঁহারা আপনাদের সমস্ত বাটী পাথুরিয়া-ঘাটার মল্লিকদিগকে বিক্রয় করিয়া আপনারা রামজীবনের কতক জমী লইয়া বাটী নির্ম্মাণ করেন। কেবল রামবাগান নামে উদ্যানটী একজন জ্ঞাতিকে বাস করিবার জন্য দিয়া যান।[৭] যে সময় গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণের প্রস্তাব হয়, সেই সময় অপরাপর দত্ত মহাশয়েরাও আসিয়া রামজীবনের বংশধরদিগের সহিত এক পল্লীতে বাটী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিয়াছিলেন। এইরূপে গোবিন্দশরণ দত্তের বংশ হাটখোলার দত্ত বংশে পরিণত হয়।

প্রাইস নামক জনৈক ভারতহিতৈষী পালামেণ্ট সভায় ভারতবাসীর প্রকৃতি, রাজভক্তি, আতিথ্য প্রভৃতি বিবিধ গুণের বিস্তর প্রশংসা করিয়া তাহাদের প্রতি যাহাতে অত্যাচারের পরিবর্ত্তে ন্যায়বিচার হয়, তাহার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন। তাঁহার গ্রন্থে লিখিত আছে, "গোবিন্দপুরে দুর্গ নির্ম্মাণকালে অনেক সহস্র কুটীর ভাঙ্গিয়া তাহাদের বাটীস্থ যে সকল গর্ত্ত (পুষ্করিণী) হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া উহা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা ভরাট করিয়া রাস্তা এবং গড়ের মাঠ নির্ম্মিত হইয়াছে। যে সকল লোকের ঘর ভাঙ্গা হইয়াছিল, তাহাদের সকলকেই নূতন ঘর নির্ম্মাণার্থ অন্যত্র পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তৃত জমী এবং ঘরের মূল্য-স্বরূপ অনেক টাকা প্রদত্ত হইয়াছে।"

১৭৫৮ খ্রীঃ ১০ই জানুয়ারি, কলিকাতার কাউন্সিল বিলাতের বোর্ডে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে আছে,—"গোবিন্দপুরের সমস্ত অধিবাসীদিগকে আমরা স্থানান্তর করিতে বাধ্য হইয়াছি, সেই স্থানে নূতন দুর্গ নির্ম্মিত হইবে। তাহাদিগকে তাহাদের ইচ্ছামত সহরে বা সহরতলিতে গৃহনির্ম্মাণ জন্য যথেষ্ট ভূমি দেওয়া হইয়াছে, সমস্ত পাকা বাটীর জন্য তাহাদের সন্তোষজনক মূল্য

দেওয়া হইয়াছে, কাঁচা গৃহেরও ঐরূপ মূল্য প্রদত্ত হইল, তদ্ভিন্ন তাহাদের দ্রব্যাদি স্থানান্তর করা ও অন্যান্য অসুবিধার ক্ষতিপূরণ করা হইয়াছে। বোর্ডে হিসাব প্রেরণ করিয়া তাহাদের সমস্ত টাকা দেওয়া হইবে।[৮]

নবাব মিরজাফরের সহিত ইংরাজের যে বন্দোবস্ত হয়, তাহার মধ্যেও গোবিন্দপুরের হাট ও গঞ্জ যে বিলক্ষণ লাভবান সম্পত্তি,তাহার উল্লেখ দেখা যায়। দুর্গ নির্ম্মাণারম্ভ হইলে ঐ হাট ভাঙ্গিয়া কতক হাটখোলায়, পোস্তায়, খিদিরপুরে এবং বেলিয়াঘাটায় চলিয়া যায়, এবং হাটটী উঠিয়া চেতলায় গিয়া বসিয়াছে।

১. গোবিন্দশরণের পর পুরুষেরা কেহ কেহ চৌধুরী উপাধি পুনর্গ্রহণ করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্টের প্রাচীন রেকর্ডের ১৪৯ পৃষ্ঠায় গঙ্গারাম দত্তপতির নাম রহিয়াছে, ইহাতে বোধ হয় উঁহাদের কেহ কেহ উক্ত উপাধি লইয়াছিলেন। বিশেষত ইনি বংশমধ্যে সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, গোবিন্দ দত্তের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ প্রপৌত্র ছিলেন। রামশরণের এক পুত্রের বংশ কলিকাতায় আসিয়া এখানকার জ্ঞাতিদিগের দৃষ্টান্তে চৌধুরী উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

২. শাল্‌তি করিয়া হিজলী হইতে অতি সহজে লবণ আনিবার জন্য বাদর-রসা চরের সম্মুখস্থ গঙ্গা হইতে সাঁকরাইলের নিকট সরস্বতী নদী সহ একটী নালা কাটা হইয়াছিল, কে কোন্ কালে এই কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না, কিন্তু এই পথ দিয়া অতি অল্পদিনে উড়িষ্যায় যাওয়া যাইত। ১৫০৯ খ্রীঃ চৈতন্যদেব এই পথ দিয়া যাত্রা করিয়াছিলেন, নিত্যানন্দ প্রভুও এই পথ দিয়া সাঁকরাইল হইতে সরস্বতী বাহিয়া আন্দুলে কৃষ্ণানন্দ চৌধুরীর অতিথি হইয়াছিলেন। ১৫৪৪ খ্রীঃ লিখিত মুকুন্দরামের চণ্ডীগ্রন্থে লিখিত আছে, শ্রীমন্তের নৌকা কলিকাতা ও বেতড় পার হইয়া কালীঘাট যাইবার সময় "ডাহিনে ছাড়িয়া যায় হিজলির পথ।" গঙ্গা এই পথে প্রবাহিত হইলে লোকে ইহাকে কাটি গঙ্গা এবং কালীঘাটের নিকটস্থ স্ফুতিকে আদিগঙ্গা বলিতে লাগিল। নর্দ্দমা দিয়া গঙ্গাজল প্রবাহিত হওয়ার ন্যায় কাটি গঙ্গার কোন মাহাত্ম্য নাই। অনেকের বিশ্বাস, ইংরাজেরা এই অংশটী কাটিয়া গঙ্গাকে সরল পথে চলাইয়া দিয়াছেন, ইহা নিতান্ত ভ্রম। ১৫২০ হইতে ৩০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে গঙ্গা এই গতি লইয়াছে।

৩. "পাইকার" শব্দটী "পাইকান" হওয়া সম্ভব। পুরাতন রেকর্ডে ব্যক্তি

ও স্থানের নামে এইরূপ বিস্তর ভুল আছে, ইহা লং সাহেব উক্ত গ্রন্থের সূচনার পঞ্চম পৃষ্ঠায় লিখিয়া গিয়াছেন।

৪. Unpublished Goverment Records, Page 43

৫, বৃদ্ধ পাঠকদিগের অনেকেরই স্মরণ আছে, জোড়াসাঁকোর মৃত বাবু শ্যামাচরণ মল্লিকের বাটীর উত্তরে কিরূপ ভয়ানক একটী বিস্তৃত এবং গভীর নর্দ্দমা ছিল। এই নর্দ্দমাটী পাথুরিয়াঘাটায় পোস্তার উত্তরে গঙ্গা হইতে বাহির হইয়া, পাথুরিয়াঘাটা, বৈদ্যপাড়া লেন, পাথুরিয়াঘাটা ষ্ট্রীট হইয়া চিৎপুরের রাস্তার মধ্য দিয়া প্রাচীন রামচন্দ্র দত্তের বাটীর উত্তরে পূর্ব্বমুখে প্রবেশ করিয়া রামবাগানের ভিতর দিয়া আশুতোষ দেবের লেন ভেদ করিয়া বলরামদের ষ্ট্রীটে গিয়া পড়ে, তথা হইতে যে অংশ পূর্ব্বমুখে সিমলা ষ্ট্রীটে গিয়া পড়িয়াছিল, এখন সেই অংশ গোঁসাইয়ের লেন নাম হইয়াছে, সিমলা ষ্ট্রীট হইতে পূর্ব্বদিকে গিয়া কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া পূর্ব্বমুখে আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ভেদ করিয়া নবাবদি ওস্তাগরের লেন হইয়া বরাবর বাদায় গিয়া পড়িয়াছিল। পূর্ব্বে এই নালা খুব প্রশস্ত ছিল, কলিকাতায় লোকের বসতি বৃদ্ধির সহিত ইহার অনেক অংশ পার্শ্ববর্ত্তী অধিবাসীরা সুবিধামত আপন আপন জমীর মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়াছিল। এখনও অনেক অংশ সুন্দর প্রশস্ত গলি রাস্তায় পরিণত হইয়াছে। সাহেবেরা পূর্ব্বে ইহাকে ইলিয়ট ক্রীক বলিত। চিৎপুর রাস্তায় যে স্থান ইহার দ্বারা ছেদিত হইয়াছিল, সেই স্থানে পাশাপাশি দুইটি কাঠের সাঁকো ছিল, তাহা হইতেই জোড়াসাঁকো নামের উৎপত্তি হয়।

৬. রামজীবন দত্তের বাটীর কোন কোন অংশ এখনও ভগ্নাবস্থায় দেখা যায়, ঐ অঞ্চলে উহা ভাঙ্গাবাড়ী বলিয়া পরিচিত, এখন গো-শকটের আড্ডা হইয়াছে।

৭. রামবাগান, ডোমপাড়ার দক্ষিণে এই দত্তের বাটী ছিল, অল্প দিন হইল তাঁহারা উহা বিক্রয় করিয়া অন্যত্র বাস করিতেছেন। এখন যাঁহারা রামবাগানের দত্ত-পরিবার বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা ঐ প্রাচীন বংশ বা বালির দত্ত নহেন। যে রসময় দত্ত এই বংশের তিলকরূপে কথিত হন, তাঁহার পিতামহ হুগলি জেলা হইতে এই স্থানে আসিয়া বাস করেন।

৮. Unpublished Government Records, page 117

প্রাচীন আচার ব্যবহার *

১

পরমায়ু। মনুষ্যের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়বস্তু পরমায়ু। ইহা পূর্ব্বের লোকেরা সুদীর্ঘকাল স্বাস্থ্যের সহিত সম্ভোগ করিতেন। "অশীতিপর বৃদ্ধ" কথাটী এখন যেন প্রবাদবাক্যে দাঁড়াইতেছে। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিতে হইলে যে সকল লোকের নাম আসিয়া পড়ে, তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকেই আশী বৎসরের নিম্নে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। ৯০।১০০ এবং তদপেক্ষা অধিকবয়স্ক লোকেরও অভাব ছিল না। বৃদ্ধেরা কেবল বাস করিতেন না, বিলক্ষণ কায়িক পরিশ্রম করিতেন। তাঁহারা ৬৫।৭০ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হইলে অনেকে পুনরায় দারপরিগ্রহ করিতেন। শুনা যায়, জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের পিতা ৬৪ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন এবং তাঁহার ৬৯ বৎসর বয়সে জগন্নাথের জন্ম হয়। বঙ্গের গৌরব পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ১১১ বৎসর জীবিত থাকিয়া নিয়মিত অধ্যাপনা করিয়াছিলেন, মৃত্যুর একমাস পূর্ব্বেও তিনি ৪।৫ ক্রোশ পথ চলিতে পারিতেন। তিনিও ৬২ বৎসর বয়সে বিপত্নীক হন। অনেক লোকে তাঁহাকেও পুনরায় বিবাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী ব্যক্তি, পুত্র পৌত্রাদি বর্ত্তমানে, কি জন্য বৃদ্ধ বয়সে দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিবেন, সুতরাং কাহারও পরামর্শ গ্রাহ্য করেন নাই। এখন ট্রাম ও ভাড়াটিয়া গাড়ীর কৃপায় অধিকাংশ লোকে হাঁটিতে ভুলিয়া গিয়া বহুমূত্র প্রভৃতি রোগের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন। তখন মহা ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন কেহ পাল্কী চড়িতে পারিতেন না, কারণ নবাবের অনুমতি ব্যতীত কাহারও পাল্কী রাখিবার সাধ্য ছিল না। ছক্কর নামক এক প্রকার দড়িতে ঝুলান গাড়ী কোন কোন বড়মানুষের থাকিত, কিন্তু এখনকার মত পথের সুবিধা না থাকায় গাড়ী বহুদূর যাইতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে পয়ঃপ্রণালী রাস্তাকে গভীররূপে দ্বিখণ্ড করিয়া রাখিত এবং একখানি সামান্য তক্তা বা সামান্য রকম বাঁশের পোলের সাহায্যে লোকে গতিবিধি করিত। সুতরাং কি ধনী কি নির্ধন, সকলকেই পদব্রজে গমনাগমন করিতে হইত। ১০।১২ ক্রোশ পথকে তাঁহারা দৃকপাত করিতেন না।

এখন যদি দুই চারিজন আশী বৎসরের অধিক-বয়স্ক লোক দেখা যায়, তাঁহাদের চক্ষু কর্ণ হস্ত পদ শক্তিহীন, আহার এককালে নাই বলিলেও হয়, কোন রকমে পরের সেবায় জীবিত আছেন। শতাধিক বর্ষ জীবনধারণ, কখন কখন সংবাদপত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। আর ২৫ বৎসর পরে শত বৎসর পরমায়ু উপন্যাসের কথা এবং আশী বৎসর পরমায়ু আশ্চর্য্যের ব্যাপার হইবে বলিয়াই অনুমান করা যায়। পূর্ব্বের জলবায়ু এখনকার অপেক্ষা ভাল ছিল, ইহাই পরমায়ু হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ বলিয়া অনেকে অনুমান করেন। এই জলবায়ুর দূষিতাবস্থার কারণ দেখিতে গেলে বুঝা যায়, পূর্ব্বে নদী নালা খাল বিল অনেক ছিল, কালে সেই সমস্ত মজিয়া ভরাট হইয়া উঠায়, জলপ্রণালী বন্ধ হইয়া জলবায়ুকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। ম্যালেরিয়া কমিশনে স্বর্গীয় রাজা দিগম্বর মিত্র মহাশয়ও এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন, সমস্ত চিকিৎসকেরাই তাঁহার এই মত পোষণ করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্টকেও উহা স্বীকার করিতে হইয়াছে। যখন নদী নালা প্রবাহিত ছিল, তখন প্রায় প্রতিবৎসর বান আসিয়া অনেক স্থানকে ধৌত করিয়া আবর্জ্জনারাশি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক গ্রাম বা নগরের আবর্জ্জনা নিকটস্থ আবদ্ধ খাল বিল বা পুষ্করিণীতে পচিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অনেকে, বিশেষতঃ ইংরাজেরা অনুমান করেন যে, কলিকাতা চিরকালই অস্বাস্থ্যকর স্থান। জব চার্ণক এই স্থানকে মনোনীত করায় তাঁহার নির্ব্বুদ্ধিতার প্রমাণই তাঁহারা দেখিয়া থাকেন। কিন্তু আমাদের অনুমান বিভিন্ন, চার্ণক হিজলী প্রভৃতি স্থানে বাস করিয়া যে প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে জলবায়ুর দোষ গুণ বুঝিবার তাঁহার কোন ক্ষমতা জন্মে নাই, ইহা কেমন করিয়া বলিব। কলিকাতার পূর্ব্বদিকস্থ বাদাকেই তাঁহারা সকল দোষের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। "সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমকালে বাদা কলিকাতার পূর্ব্ব সীমা পর্য্যন্ত আসিত, সেই জন্য বর্ষাকালে এত পীড়ার প্রাদুর্ভাব হইত।" এটা কিন্তু বিপরীত কথা হইল; বর্ষাকালে বাদা কলিকাতার পার্শ্বে আসিয়া উহার সমস্ত আবর্জ্জনা ধুইয়া লইয়া যাইত, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকারের সম্ভাবনা কি। বাদা পূর্ব্বে গভীর এবং প্রবাহযুক্ত ছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহা অনেক পরিমাণে উচ্চ হইয়া প্রবাহহীন হওয়াই যদি অস্বাস্থ্যের কারণ হইত, তাহা হইলে এখন আরও উচ্চ, শুষ্ক এবং প্রবাহশূন্য হইয়া অধিকতর দূষিত বায়ু দ্বারা সমগ্র নগরীকে কোন্ দিন ধ্বংস করিয়া ফেলিত। অন্তত বাদার পার্শ্ববর্ত্তী

গ্রামগুলি জনশূন্য হইত। ইংরাজদিগের প্রথম আমলে এ প্রদেশ যে প্রকার অস্বাস্থ্যকর হইয়াছিল, পূর্ব্বাবধি সে প্রকার থাকিলে ভবানীপুর, গোবিন্দপুর, সুতানুটী, বাগুয়া, চিৎপুর, শিয়ালদহ এবং সারপল্লী (সুড়া) প্রভৃতি গ্রামসকল বাদার ধারে স্থাপিত হইয়া বদ্ধিষ্ণু হইতে কখনই পারিত না।

জব চার্ণক এখানে শত শত বার আগমন করিয়াছিলেন, সমস্ত হাটবাজার তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিতেন, বৈঠকখানার বৃহৎ তরুতলে বিশ্রামকালে ব্যাপারীদিগের গতিবিধি সন্দর্শন করিতেন। স্থানকে অস্বাস্থ্যকর দেখিলে তিনি কিছুতেই এখানে কুঠী স্থাপন করিতেন না। সহর নির্ম্মাণে শৃঙ্খলা ও বন্দোবস্তে অমনোযোগী হওয়াই এই সর্ব্বনাশের কারণ। চার্ণক সাহেব ১৮৮৬ খ্রীঃ কলিকাতায় কুঠী প্রতিষ্ঠা করিলে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, মুসলমান, আর্ম্মানী প্রভৃতি সহযোগী ব্যবসায়ী, দাদনী, দালাল, গোমস্তা, পিয়াদা প্রভৃতি আসিয়া উপস্থিত হইল। ক্রমে এখানে কোম্পানির কারবার উন্নত হওয়ায় উঁহাদের সংখ্যা বাড়িয়া যাওয়ায়, তাহারা সপরিবারে বাস করিবার জন্য সাহেবের নিকট ভূমি প্রার্থনা করিতে লাগিল। ১৬৯০ খ্রীঃ জব চার্ণক বুঝিলেন যে, অনেক লোক এখানে আসিয়া বাস করিতে চায়, ইহাতে কোম্পানির সুবিধা ভিন্ন অসুবিধা নাই, সুতরাং তিনি তাহাদিগকে যাহার যেখানে ইচ্ছা, কোম্পানির এলাকামধ্যে পতিত জমী লইয়া গৃহনির্ম্মাণে অনুমতি দান করিলেন। উক্ত আদেশ প্রচারমাত্র দলে দলে লোক সহরমধ্যে আসিয়া যাহার যেখানে ইচ্ছা সুবিধামত পরিমাণে জমী লইয়া বসিল। চারিদিকে পগাড় বাঁধিয়া নিম্নভূমিকে উচ্চ করিল। খাল বিলের অংশ লইয়া তাহার উভয় পার্শ্ব বাঁধিয়া বড় বড় দীঘি প্রস্তুত করিল, উভয় দিকের মাটী তুলিয়া যাতায়াতের রাস্তা প্রস্তুত করিল। এই সকল কার্য্যে শীঘ্র শীঘ্র সুন্দর সহর নির্ম্মাণ হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সাহেবেরা আনন্দে পূর্ণ হইতে লাগিলেন। তাঁহারাও চারিদিকে খাল নালা বন্ধ করিয়া সরকারী রাস্তা নির্ম্মাণ করাইতে আরম্ভ করিলেন। এখন পথে জল দাঁড়াইলে আমাদের কতই না কষ্ট হয়, তখন প্রণালীসকল বদ্ধ হওয়ায় বর্ষাকালে কেবল রাস্তা নহে, লোকের বাগান, উঠান, এমন কি, অনেক নিচু ঘরগুলি পর্য্যন্ত কয়েক মাস জলাভূমির ন্যায় হইয়া যাইত।

এই ব্যাপারে কেবল যে জল নিকাশের পথগুলি আবদ্ধ হইয়া সহরে জল দাঁড়াইতে লাগিল, তাহা নহে, অসংখ্য অধিবাসীর পরিত্যক্ত জঞ্জাল, মনুষ্য ও গৃহপালিত পশুদিগের মলমূত্র, গৃহপালিত পশুদিগের ও অসহায় দরিদ্র লোকের

মৃতদেহ পর্য্যন্ত ঐ আবদ্ধ জলে এমন পচিতে লাগিল যে, বর্ষাকালেও সে সমস্ত আবর্জ্জনা কোম্পানির সীমার বাহিরে যাইতে পারিত না। ১০।১৫ বৎসর এইভাবে বাস করিতে করিতে সংক্রামক জ্বর, বসন্ত প্রভৃতির ভীষণ সংক্রমণ আরম্ভ হইল। মৃত্যুর আধিক্য দেখিয়া সাহেবদের চৈতন্য হইল। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, এই সকল বদ্ধ জলই যখন পীড়ার কারণ, তখন ঐরূপ জলাশয়গুলি বুজাইয়া দিলেই আপদ চুকিয়া যাইবে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভে কাউন্সিল হইতে আবর্জ্জনাপূর্ণ জলাশয়গুলি বুজাইবার আদেশ হওয়ায়, সহরবাসীদিগের পরিত্যক্ত জঞ্জাল দ্বারা ঐ কার্য্য আরম্ভ হইল। হিতে বিপরীত হইল, তাঁহাদের অবিবেচনার দোষে বহুসংখ্যক নরনারী, ইংরাজ-বাঙ্গালী, প্রতি বৎসর মরিতে আরম্ভ করিল। সেই সময় হইতে কলিকাতা পল্লীগ্রামের লোকের নিকট যমালয় সদৃশ বলিয়া কথিত হইতে লাগিল। এখানে আসিলে লোণা ধরিত, অধিকাংশ লোক শোণিতদোষের দৌর্ব্বল্যে প্রাণত্যাগ করিত। তদ্ভিন্ন জ্বর, রক্তআমাশয়, ওলাউঠা, পিত্তজ্বর, অম্লশূল, যকৃৎ-বৃদ্ধি প্রভৃতি সঙ্কট রোগে প্রতি বৎসর ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ মাসে শত শত লোক মারা যাইত; চলতি প্রবাদে বলে, "ভাদ্র মাসে যমের চারি দ্বার খোলা" কারণ ঐ সময় মৃতদেহ এত ভীড় হইত যে, চারি দ্বার না খুলিলে তাহাদের প্রবেশকালে অত্যন্ত ঠেলাঠেলি মারামারি হইত। ইংরাজেরা প্রতিবৎসর ১৫ই নবেম্বর "সে বৎসরের মতন বাঁচিয়া গেলেন" ভাবিয়া একটী উৎসব করিয়া পরস্পরের কুশল জিজ্ঞাসা ও আমোদ প্রমোদ করিতেন। প্রায় ৫০ বৎসর পরে সাহেবেরা বুঝিলেন, সহরের জল নিকাশ হওয়া উচিত, তখন অল্পে অল্পে রাস্তার পার্শ্বে নর্দ্দমা খনন এবং মধ্যে মধ্যে কতকগুলি সাঁকো নির্ম্মাণ করা হইল। ১৫০ বৎসর পরে রোগের কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া রীতিমত জল নিকাশ, জঞ্জাল পরিষ্কার, মিষ্টজল সরবরাহ, এবং দেশীয়দিগের জন্য দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপনের উপযোগিতা অনুভূত হইল। জঞ্জাল দিয়া জলাশয় ভরাট করাটা যে কি সর্ব্বনাশের ব্যাপার, তখনও সাহেবেরা তাহা বুঝেন নাই, অবাধে সমস্ত সহরের নিম্নভাগ জঞ্জাল দিয়া পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। কলিকাতা কর্পোরেশনের সৃষ্টির পর ঐ কার্য্য ক্রমে বন্ধ হইয়াছে।

কলিকাতার সীমার বাহিরে তত রোগের প্রাদুর্ভাব ছিল না, যত এই নব-নির্ম্মিত সহরে দেখা যাইত। কলিকাতার কয়েক ক্রোশ উত্তরের গ্রামগুলি এমন স্বাস্থ্যকর ছিল যে, পূর্ব্বের সাহেব ও সহরের বাবুরা তথায় বায়ু পরিবর্ত্তন করিতে

যাইতেন। সুখসাগর প্রভৃতি স্থানের পূর্ব্ব বর্ণনা ও তথায় গবর্ণর প্রভৃতির আমোদ প্রমোদের কথা পাঠ করিলে, এখনকার সিমলা ও দার্জ্জিলিং পর্ব্বতের ন্যায় আদরের স্থান ছিল বলিয়া বুঝা যায়। আর এখন চারিদিকে জলপ্রণালী বদ্ধ হওয়ায় গঙ্গার উভয় পার্শ্বের অবস্থা দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে হয়। এখন কলিকাতা মধ্যসময়ের সহিত তুলনায় স্বর্গ বলিলে বলা যায়, তত্রাচ পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন অকাল মৃত্যু এত দেখা যায় কেন? তাহার উত্তর দিতে হইলে, জলবায়ুর দোষ দিলে চলিবে কেন। পূর্ব্বের আচার ব্যবহারের গুণে তাঁহারা দীর্ঘজীবী হইতেন, ইহাই বলিতে হয়।

স্নান আহ্নিক।—পিতামহদিগের প্রত্যেক আচরণ ধর্ম্মসংশ্লিষ্ট ছিল। তাঁহাদের অনেকেই অতি প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিতেন। পঞ্চকন্যা স্মরণ, দেব-বন্দনা-পাঠ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া শয্যা হইতে অবতরণ করিতেন। কোন কোন মাতৃভক্তের কথা শুনা গিয়াছে, তাঁহারা শয্যা হইতে নামিবার পূর্ব্বে মা মা বলিয়া ডাকিতেন, মা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া চক্ষু মেলিয়া অগ্রে তাঁহার মুখ দেখিতেন। তাঁহারা শয্যা হইতে উঠিয়া অগ্রে গৃহদেবতার দ্বারে, পরে তুলসীতলায়, গোশালায় প্রণাম করিয়া মুখ প্রক্ষালন করিতেন। অনেকেই সর্ষপ তৈল মাখিয়া প্রত্যহ গঙ্গাস্নান করিতেন। যাঁহারা গঙ্গা হইতে কিছু দূরে বাস করিতেন, অথচ কার্য্যের ব্যস্ততায় সময় দিতে পারিতেন না, তাঁহারা নিকটস্থ বড় বড় পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতেন। বড় বড় পুষ্করিণী তখন প্রতি পল্লীতেই ছিল। ডুব দিয়া উঠিয়া সূর্য্যদেবকে প্রণাম করিতেন, 'মহিম্ন' স্তব ও গঙ্গার বন্দনা পড়িতেন। বালার্ক ও সন্ধ্যাদীপ সকলেরই অবশ্যপ্রণম্য ছিল। অবগাহন স্নান স্বাস্থ্যের একটী বিশেষ লক্ষণ, বিশেষতঃ প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানের উপকারিতা বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। ইহাতে যে কেবল দেহ হৃষ্টপুষ্ট হয়, তাহা নহে, সহজে রোগাক্রমণ করিতে দেয় না। কারণ ইহাতে প্রাতঃকালের নির্ম্মল বায়ু সেবন ও পদচালনা হইয়া থাকে, তদ্দ্বারা মন প্রফুল্ল হয় এবং শরীরের জড়তা দূর হয়, সমস্ত দিন অকাতরে পরিশ্রম করিতে পারা যায়। তাঁহারা স্নানান্তে অনেকে পুষ্পচয়ন করিতেন, কেহ বা অপরের আনীত ফুলে পূজা করিতে বসিতেন। প্রত্যেক বয়স্থ ব্যক্তিকে পূজা করিতেই হইত। বিবাহের পর দীক্ষা, দীক্ষিত ব্যক্তির ইষ্টদেবতার নিত্যপূজা না করিয়া জলগ্রহণ করা মহাপাপ। এই পাপীকে ভ্রষ্টাচারী বলিয়া সকলে ঘৃণা করিত। যাঁহারা বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক, তাঁহাদিগকে তুলসীর মালা, যাঁহারা শাক্ত

তাঁহাদিগকে রুদ্রাক্ষের মালা ফিরাইয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে হইত। প্রথমতঃ গঙ্গাস্নানে, তৎপরে বহুক্ষণ পুষ্প-চন্দন লইয়া পূজা ও ভগবানে আত্মসমর্পণ, তাঁহার নামগান প্রভৃতিতে দেহ ও মন উভয়ই সুস্থ হইত, সুতরাং বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের স্নান আহ্নিক দীর্ঘয়ুর একটী কারণ।

ব্যায়াম।—অধিকাংশ যুবক ব্যায়ামপ্রিয় ছিলেন, কোন না কোন প্রকার ব্যায়াম যেন করিতেই হইবে। কুস্তী বা মল্লযুদ্ধটী অনেকের প্রিয় ছিল, তদ্ভিন্ন লাঠী খেলা, তীর ধনুক বা গুলি ধনুক, তরবারী খেলা, অশ্বারোহণ, নৌকা চালন, সন্তরণ, ধাবন, কপাটী প্রভৃতি ক্রীড়া তাঁহাদের দেহের জড়তা দূর করিয়া সবল এবং দীর্ঘজীবী করিত। সেই "ভেতো বাঙ্গালী"-দিগের দেহে বলশক্তি কম ছিল না। আশানন্দ ঢেঁকীর গল্প অনেকেই জানেন। তিনি দুই হাতে দুইটী ঢেঁকী ঘুরাইয়া দস্যুদলে পতিত হইয়া তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতেন। তিনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, একদিন আপনার প্রভুর এক থলে টাকা লইয়া ডুমুরদহের মধ্য দিয়া আসিতেছিলেন, সেকালে পথে একাকী টাকা লইয়া কেহই চলিতে সাহস করিত না, বিশেষত ডুমুরদহ সুবিখ্যাত দস্যুদিগের স্থান ছিল, মহাবল আশানন্দের তাহাতে ভয় কি? মধ্যাহ্নকালে ক্ষুধাবোধ হওয়ায় কিছু চূড়া লইয়া এক পুষ্করিণীর ঘাটে ভিজাইয়া আহার করিতেছিলেন, নিকটে টাকার থলি পড়িয়া রহিয়াছে। এমন সময় দুইজন দস্যু লাঠী লইয়া উপস্থিত হইল, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কিজন্য আসিয়াছিস্?" উত্তর হইল, "এ কোন্ জায়গা জানিস্ না, এখান হইতে টাকা লইয়া ঘরে যাইতে চাস্।" তিনি বলিলেন, "আচ্ছা আমায় খাইতে দে এখন ছুইস্ না।" "ভাল শীঘ্র খাইয়া নে।" আহারান্তে আশানন্দ পুষ্করিণীতে আচমন ও জলপান করিতে নামিলেন, টাকা ও দস্যুরা ঘাটের উপরে রহিল, উঠিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কি শুধু টাকা চাস্, না আমাকে মারিয়া টাকা লইয়া যাইতে চাস্?" "তোর মরিতে যখন এত সাধ, তখন তাই ভাল" বলিয়া দস্যুরা তাঁহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে দুই দশ ঘা লাঠী প্রহার করিল, তিনি "তোদের মারা হয়েছে ত, এখন দেখ্" বলিয়া টাকার তোড়াটী কাঁধে তুলিয়া দুইজন দস্যুকে দুই হাতে ধরিলেন, দুই বগলে দুইজনকে চাপিয়া ধরিয়া তথা হইতে কয়েক ক্রোশ দূরে স্বস্থানে গিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিয়া দেখেন, উভয়েই মৃতপ্রায় মূৰ্চ্ছিত, মুখে জল দিয়া দস্যুবৃত্তি ত্যাগের প্রতিজ্ঞা করাইয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

আহিরীটোলার শঙ্কর হালদার অত্যন্ত বলবান ছিলেন, স্থূলাকার স্তম্ভ বাহুর

তাল ঠুকিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতেন, কখন লাঠী লইয়া পথে বাহির হইতেন না, যদি কেহ বলিত, "মহাশয় শুধু হাতে পথে বাহির হন, যদি কেহ দাঙ্গা করিতে আসে, কি দিয়া আত্মরক্ষা করিবেন", তদুত্তরে বলিতেন, "পথে অনেক গাড়ী যাতায়াত করে, তাহা না পাইলে দাঙ্গাকারীদিগের একজনকে ঘুরাইয়া লাঠীর কাজ সারিব।"

কৃষ্ণনগরের রাজবংশের ইতিহাসে দেখা যায়, রাজা রামকৃষ্ণ মহাবীর ছিলেন। একদিন নদীতে সন্তরণকালে একখানি ৩২ দাঁড়ের বজরা এমনি ধরিয়া রাখিয়াছিলেন যে, চালকেরা সহস্র চেষ্টা করিয়া বিন্দুমাত্র অগ্রসর হইতে পারে নাই। একদিন একটী বন্য মহিষের সহিত যুদ্ধ করিয়া উভয় হস্তে তাহার শৃঙ্গ দুইটী সমূলে উৎপাটন করিয়া মুষ্ট্যাঘাতে তাহাকে বধ করিয়াছিলেন। দেশ বিদেশের মল্লেরা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিত, কিন্তু কেহই পরাজিত না হইয়া ফেরে নাই। জনৈক ফৌজদার মল্লযুদ্ধে বিশেষ বিখ্যাত ছিলেন, তিনিও একদিন আসিলেন, রামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে একটী পাঁচ বৎসরের আম্রতরু উভয় হস্তে ধরিয়া উৎপাটন করায় ফৌজদার আর যুদ্ধ করিতে সাহসী হইলেন না। একদিন রামকৃষ্ণ একটী সবলকায় অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উভয় জানুদ্বারা তাহাকে এমন চাপিয়া ধরিয়াছিলেন যে, অশ্বের পঞ্জরাস্থি চূর্ণ হওয়ায় সে পঞ্চত্ব-প্রাপ্ত হইল। উঁহার পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের পুত্র গোপীমোহনও বিলক্ষণ বলশালী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহারা পিতা পুত্রে যখন ঢাকায় কারাবদ্ধ ছিলেন,তখন একদিন হস্তী দ্বারা নদী হইতে একখানি বৃহদাকার প্রস্তর উত্তোলিত হইতেছিল, প্রস্তরের গুরুত্বহেতু হস্তী বিশেষ চেষ্টা করিয়াও অপারক হইলে গোপীমোহন তাহা তুলিয়া দেন। নবাব তাঁহার এই কার্য্যে আশ্চর্য্য ও সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন।

পূর্ব্বে অনেক ভদ্রলোক বন্যজন্তু শিকারে অভ্যস্ত ছিলেন, বন্দুকের অপ্রাচুর্য্যহেতু তরবার, বর্শা, তীর ধনু এবং লাঠীর দ্বারাই তাঁহারা ব্যাঘ্রাদি শিকার করিতেন। সে সময়ে অনেক ভদ্রলোক রীতিমত যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, হরিনাভির দেববংশের আদিপুরুষ রুদ্ররাম দেব গৌড়ের সেনাপতি ছিলেন। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের সেনাপতিদিগের মধ্যেও অনেকগুলি ভদ্রলোকের নাম পাওয়া যায়। মুর্শিদাবাদের নবাবদিগেরও অনেক বাঙ্গালী সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তাহার পর কেন যে ভদ্রলোকেরা উক্ত বিদ্যা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। যদি যুদ্ধশিক্ষার

প্রচলন থাকিত, তাহা হইলে বর্গী, মগ ও পর্টুগীজদিগের দৌরাত্ম্যে এ প্রদেশ কখনই দুর্দ্দশাপন্ন হইত না। পলাশী যুদ্ধকালে ক্লাইব সাহেব একদল বাঙ্গালী সৈন্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে ভদ্রলোক থাকিলে কালী বাগ্দী ও হরিদাস দাস কখন সেনাপতি হইত না। সেকালের অবলারাও এখনকার মত দুর্ব্বলা ভীরু ছিলেন না, খড়্গ হস্তে লইয়া দস্যু তাড়াইয়াছেন, এমন অনেক কালী অবলার গল্প শুনা যায়।

ভোজন। এখনকার অপেক্ষা তখন ভোজনকার্য্য সাত্ত্বিক ও বৈজ্ঞানিক ভাবে সম্পন্ন হইত। তাঁহারা নিজেরা যে বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা বিজ্ঞ ও বৈজ্ঞানিক ছিলেন, ইহা বিশ্বাস করিতেন। তাঁহাদের কথা অগ্রাহ্য করিলে পাপ হইবে, এই বিশ্বাসে সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। যে যে তিথিতে যে যে খাদ্য নিষেধ্য, তাহা ভোজন করিতেন না। কুষ্মাণ্ড, বেগুণ, কুলীবেগুণ, লাউ, পটোল, মূলা, বেল, নিম্ব, তাল, নারিকেল, কলমীশাক, পুঁইশাক, তাল, মাষকলাই, সর্ষপতৈল, মৎস্য ও মাংস বৎসরের অনেকদিন পরিত্যাগ করিতে হইত। একাদশী, অমাবস্যা, পূর্ণিমা প্রভৃতিতে অনেকে অন্নভোজন করিতেন না। পূর্ব্বে মাংসভোজন বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল; মেষ, ছাগ, হরিণ, শশক, সজারু, হংস, কপোত, ঘুঘু প্রভৃতি বন্যপক্ষীর মাংসভোজন প্রচলিত ছিল। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে মাংস-ভোজন এক প্রকার রহিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যদিও শাক্তেরা তখনও ছাগমাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু দেবোৎসর্গীত না হইলে তাহাকে বৃথা মাংস বলিয়া নিষ্ঠাবানেরা ঘৃণা করিতেন। মাংসভোজন হ্রাস হওয়ার কালে গব্যের দ্বারা তাঁহারা উহার অভাব পূরণ করিতেন। দুগ্ধ, দধি, ক্ষীর ছানা, মাখন ও ঘৃত, মাংস অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল, এবং অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইতেন। চাউল, ডাইল, তরকারি, ফলমূল, এবং মৎস্য ও গব্য প্রভৃতি ভিন্ন গৃহস্থদিগকে প্রায়ই ক্রয় করিতে হইত না। তখন অর্থ মহার্ঘ্য থাকিলেও খাদ্য-দ্রব্যাদি তদনুসারে অনেক সুলভ ছিল। তাহার প্রধান কারণ, গৃহস্থদিগকে আহারীয় বস্তু প্রায় ক্রয় করিবার আবশ্যক হইত না। "খেতের বেগুণ বিলের মাছ তাই খেয়ে খেয়ে ভোঁদড় নাচ।" বাস্তবিক তাঁহাদের প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু ধান জমী এবং বাগান বিল বা পুষ্করিণী ছিল, প্রত্যেক গৃহস্থই গরু পোষিতেন। উঠানে মরাই বাঁধা ধান, বাগানে ফলমূল, তরিতরকারি, পুষ্করিণী বিলে অপর্য্যাপ্ত মৎস্য থাকিতে বাজারে যাইবেন কেন? তৈল আর লবণই হাটে

কিনিতে হইত, অনেকে আবার কলুকে সরিষা দিয়া তৈল ভাঙ্গাইয়া লইতেন, দরিদ্র লোকেরা লবণের পরিবর্ত্তে কলাগাছের ক্ষার ব্যবহার করিত। লবণও এখনকার মত মহার্ঘ্য ছিল না, এখন প্রতি মণে রাজা ২৷৷০ টাকা বিশেষ অনুগ্রহ হইলে ২ টাকা মাসুল লন, তা ছাড়া বিদেশীয় লবণ ব্যবসায়ীদিগের মূল্য ও জাহাজ ভাড়া প্রভৃতি খরচা আছে, কাজেই প্রায় ছয় পয়সায় এক সের লবণ ক্রয় করিতে হয়। তথনও রাজা লবণের কর লইতেন বটে, কিন্তু তাহা এত কম যে, এক পয়সার কম সের বিক্রয় হইত। এই সস্তার কালেও গরিবলোক এত ছিল যে, তাহাদের অন্নের ব্যঞ্জন জুটিত না, সামান্য কলমী হিংচা সজিনা প্রভৃতি শাক সিদ্ধ করিয়া লইতেন। এক ছড়া তেঁতুল, একটা লঙ্কা ও লবণ হইলে আর কিছুর আবশ্যক অনেকের থাকিত না। অনেকে কেবল ফেন দিয়া ভাত খাইতেন। এইরূপ অবস্থাই যে দারিদ্র্যের চিহ্ন, তাহা কি প্রকারে বলিব, বাসগৃহের পার্শ্বে দুই চারি রকম তরকারির গাছ রোপণ করা ত ব্যয়সাধ্য নহে, তাঁহারা উহার অভাব বোধ করিতেন না, ইহাই আসল কথা। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায় একদিন রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামক দরিদ্র মহাপণ্ডিতকে কিছু দান করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার পর্ণকুটীরে গিয়া পণ্ডিতের অভাব কি জিজ্ঞাসা করায়, পণ্ডিত উহা ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় প্রশ্ন মনে করিয়া তদনুরূপ উত্তর দান করিলেন। যখন বুঝিলেন, তাঁহার সাংসারিক অভাবের কথা রাজা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তখন অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, ঐযে তিন্তিড়ী বৃক্ষ দেখিতেছেন, উহার পত্র লইয়া ব্রাহ্মণী এমন উপাদেয় ব্যঞ্জন প্রস্তুত করেন যে, আমি অতি পরিতোষের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া থাকি, আমার সংসারে কোন অভাব নাই। ইহাতে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত কতদূর লোভশূন্য ছিলেন, একদিকে যেমন তাহা বুঝা যাইতেছে, অপরদিকে তেমনি তখনকার লোকে সামান্যে কেমন সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহাও জানিতে পারিতেছি।

তাঁহারা ভোজনে যেমন, হজমেও তেমনি পটু ছিলেন। এখনকার মত তৈল ঘৃতে তখন ভেজাল চলিত না। এখনকার মত শত শত মিঠাই মিষ্টান্ন তখন আবিষ্কার হয় নাই। মুড়ী, মুড়কি, চুড়া, চুড়াভাজা, চালভাজা, নানাবিধ কলাইভাজা, তেলেভাজা বেগুণী ফুলুরী বড়া প্রভৃতি উপাদেয় জলযোগের খাদ্য ছিল। মুড়কির মোয়া মিঠাইয়ের কার্য্য করিত। মাহেশের ঘাটে মুকুন্দ নামক একজন লোক মুড়কির সহিত বিবিধ প্রকারে মসলা মিশ্রিত করিয়া একপ্রকার মোয়া প্রস্তুত করিয়াছিল, তাহা অতি উপাদেয় হওয়ায় "মুকুন্দ মোয়া" বলিয়া

আজিও আদরে বিক্রীত হইয়া নির্ম্মাতার নাম চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। সে সময় দেশ বিদেশে উহার এত সুখ্যাতি প্রচার হইয়াছিল যে, বিলাসী মানুষের কথা দূরে থাকুক, পুরীর জগন্নাথদেব পর্য্যন্ত তাহার লোভে আকৃষ্ট হইয়া গঙ্গা-স্নানের ছলে মাহেশে আসিয়া কৌড়ি অভাবে হাতের সোণার বালা বন্ধক রাখিয়া মুকুন্দ ময়রার নিকট হইতে মোয়া খাইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। ধনেখালির খইচুর আবিষ্কৃত হইয়া মুকুন্দ-মোয়াকে হারাইয়া দিয়াছে। পূর্ব্বে খর্জ্জুর গুড় নানা আকারে ঢালাই হইয়া সন্দেশ নামে ব্যবহৃত হইত, চিনি আবিষ্কৃত হইলে মিষ্টান্ন-জগতে খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছে। প্রথমে জনাই গ্রামে নারিকেলের সহিত পাক হইয়া রসকরা নামে প্রচারিত হইল। রসকরার নিকট খইচুর হার মানিল, ক্রমে ক্রমে নারিকেল সন্দেশ, চন্দ্রপুলি, ক্ষীরের সহিত মিশ্রিত হইয়া ক্ষীরপুলি প্রভৃতির প্রধান হইতে লাগিল। ছানা অনেক পরে প্রস্তুত হইয়া মিষ্টান্নকে তৃতীয় স্বর্গে উন্নত করিয়াছে। সাধারণত মুড়ীই নিত্য জলযোগ হইত, উদর পূর্ণ করিয়া মুড়ী চর্ব্বণান্তে খানিকটা গুড় খাইয়া জলপান করিতেন। এইজন্য কোন প্রণালী-পূজান্তে বা অন্নভোজনের পূর্ব্বে অবশ্য পালনীয়। বালক বালিকারা তিন চারিবার অন্ন ভোজন করিত। প্রাতঃকালে গৃহিণীরা বাসী কাপড়ে উঠানে একটা উনান জ্বালিয়া স্বতন্ত্র হাঁড়িতে ভাত চড়াইয়া দিতেন, সিদ্ধ হইলে তাহাতে একটু লবণ দিয়া ফেন সমেত বালক বালিকারা রাখাল বালক শুদ্ধ ঐ অন্ন ভোজন করিত। দুই এক ঘণ্টা পরে বাটীতেই মুড়ী ভাজা হইলে, বালক বালিকারা ভাত খাইয়াছে বলিয়া ইহাতেও বঞ্চিত হইত না। ব্যায়ামকারী যুবকেরা ব্যায়ামান্তে স্বেচ্ছামত কাঁচা ছোলা, কাঁচা দুধ খাইতেন।

তাঁহারা স্নান আহ্নিকের পর জলযোগ করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে গমন করিতেন এবং মধ্যাহ্নে আসিয়া আহার করিতেন। ভাত ডাল শুক্ত মাছের ঝোল ভাজা চড়চড়ি ডালনা ও অম্বল বড়মানুষের নিত্যভোজ্য। কি বড়মানুষ কি মধ্যবিত্ত, সকলেই প্রথম অন্নে ঘৃত, শেষ দুগ্ধপানে আহার সমাপ্ত করিতেন। এই দুগ্ধাভাবই আমাদের বর্ত্তমান দুর্ব্বলতার প্রধান কারণ। অনেক সাত্ত্বিক হিন্দু স্বপাকভোজী ও হবিষ্যাশী ছিলেন, অনেকে একাহারী ছিলেন। এক সূর্য্যে দুইবার পূর্ণ ভোজন ঘৃণিত আচার বলিয়া কথিত হইত। পূর্ব্বে প্রকাশ্য ভোজও অতি সামান্য রকমে সম্পন্ন হইত। আমার জননী বলিয়াছিলেন, পানিহাটী গ্রামে তাঁহার মাতুলের বিবাহে সাতদিন ধরিয়া ভোজ হইয়াছিল,

একদিন দুই রকম ডাল "দেওড়" (দো আড়া বা দুইবার) দিয়াছিল। দধিমাখা ভাত প্রকাশ্য ভোজে মাছ দিয়া খাইবার রীতি ছিল, নিমন্ত্রিতেরা পূর্ব্ব হইতে মাছগুলি পাতের একপার্শ্বে সংগ্রহ করিয়া রাখিত। একদিন দধির পশ্চাতে মুণ্ডি পরিবেশন হইতেছে দেখিয়া পূর্ব্বসঞ্চিত মাছগুলি লোকেরা আড়ে গিলিতে লাগিল, আর একদিন আহারান্তে সকলে লবঙ্গবিঁধা পানের খিলি পাইয়াছিল। এই ঘোর ঘটার ভোজের কথা নিকটস্থ গ্রামগুলিতে কিছুকাল গল্পের বিষয় হইয়াছিল। ইহা ৬০।৭০ বৎসরের কথা। আমার এক বন্ধু গল্প করিয়াছিলেন, তাঁহার পিসি ঠাকুরাণীর বিবাহে লুচি চিনি হইয়াছিল। অন্যান্য ভদ্রলোকে সে সময় দধি-চুড়া দ্বারা বরযাত্র পরিতোষ করিতেন। লুচি চিনি দেখিয়া বরযাত্রীদের মনে কি প্রকার আনন্দ হইল, পাঠক বুঝিয়া লউন। বরযাত্রীরা এই আদরের বিনিময়ে চিনি অপচয় করিতে লাগিলেন, কেহ আসনের নিম্নে কেহ পাতের নিম্নে রাখিতে লাগিলেন, অনেকেই জলের ঘটিতে চিনি গুলিয়া খাইতেছিলেন। অভিপ্রায়, চিনির অসংকুলান হইলে কন্যাকর্ত্তার লুচী চিনি খাওয়ানর দর্প চূর্ণ হইবে। এদিকে কন্যাকর্ত্তা এই অত্যাচার দেখিয়া আট দশটা বস্তা মাটী পূর্ণ করিয়া মুখ সিলাই করাইলেন, বাহিরে আসিয়া উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন, তোমরা কেন এক একটী ধামা করিয়া চিনি আনিতেছ, গোটাকতক বস্তা আনিয়া উঠানে ফেল। অমনি মাটীর বস্তাগুলি আসিয়া পড়িল, তৎসঙ্গে একটী চিনির বস্তাও ছিল। অগ্রে সেই চিনির বস্তাটী খুলিয়া চিনি বাহির করিবামাত্র বরযাত্রীরা বুঝিলেন, ইঁহাকে আর অপ্রস্তুত করিতে পারিব না, তখন তাঁহারা অপচয়ে ক্ষান্ত হইলেন।

গৃহে নূতন জামাতা বা বিশেষ কুটুম্ব আসিলে, গৃহিণীরা অনেক প্রকার রন্ধনের বাহাদুরী দেখাইতেন। অনেক রকম ডাল, শুক্ত, ডালনা, ঘণ্ট, ভাজা, পায়স, পিষ্টক প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু বৃহৎ ভোজে তাহা সম্ভব নহে, তাহাতে দুই এক প্রকারের ডাল, এক রকম শুক্ত, দুই তিন প্রকার ভাজা, শাকের ঘণ্ট, মোচার ঘণ্ট, ল্যাবড়া (ছেঁচড়া), মাছের ঝোল, অম্বল, এক প্রকার পায়স, কলার বড়া পাক করিলেই যথেষ্ট হইত। নিম্নবঙ্গ অপেক্ষা পূর্ব্ববঙ্গ, বিশেষতঃ বিক্রমপুরের মহিলারা অতি সামান্য তরকারি হইতে এতবিধ সুস্বাদু ব্যঞ্জন রন্ধন করিয়া থাকেন যে, তাহার সংখ্যা করিয়া উঠা যায় না।

এখন কলিকাতার বাজারে যতপ্রকার তরকারি দেখা যায়, পূর্ব্বে তত রকম ছিল না। বিশেষতঃ শীতকালে নানাবিধ নতুন তরকারিতে বাজার পরিপূর্ণ

দেখিতে পাই, তখন পালমশাক, মূলা ও সিম ভিন্ন শীতকালের অন্যবিধ বিশেষ কোন তরকারি ছিল না। এখন গোল আলু লোকের প্রধান তরকারি হইয়াছে, পিতামহেরা উহার নামগন্ধ জানিতেন না। এমন কি, ১৭৬৮ খ্রীঃ ষ্টাভোরিনাস নামক ভ্রমণকারী কলিকাতার বাজারের যে সকল তরকারির তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে বাঁধাকপি ও কড়াইসুটীর উল্লেখ আছে, কিন্তু আলুর নাম নাই। সম্ভবতঃ আলের মধ্যে জন্মে বলিয়াই ইহার নাম "আলু" হইয়া থাকিবে, কিন্তু আমরা আমাদের দেশীয় কন্দজাতীয়মাত্রকেই আলু উপাধি দিয়াছি, যথা রাঙ্গা আলু, শাঁক আলু, চুবড়ী আলু, গরান আলু প্রভৃতি।

এখনকার অপেক্ষা তাঁহারা অধিক আহার করিতেন। শ্রমজীবীদিগের কথা বলিতেছি না, ভদ্রলোকের ঘরে এক কুনকে চাউলের অন্ন সাধারণের ভোজ্য। অনেক বড়লোক, এমন কি, রাজা জমীদারদিগের মধ্যেও বিস্তর বহু-ভোজীর নাম শুনা যায়। একটী কাঁঠাল বা একটী বৃহৎ ছাগলের মাংস একাকী শেষ করিতেন, এমন গল্পের অভাব নাই। পৌষপার্ব্বণ ও অরন্ধনের সময় ভোজনের পরীক্ষা হইত। বড় বড় সিদ্ধপিঠা ও আস্কেগুলি যখন চর্ব্বণ করিতেন, তখন তাঁহাদের মুখভঙ্গিমা দেখিয়া ছোট ছোট ছেলেরা ভয়ে কাঁদিয়া উঠিত। অরন্ধনে এত পর্য্যুসিতান্ন আহার করিতেন যে, গৃহিণীরা কেবল পাথরের খোরা বহিয়া পরিশ্রান্ত হইতেন না, পাছে অকুলান হইয়া পড়ে, এই ভয়ে মনসা দেবীর পূজা মানিতেন। অপরাপর সাধারণ ভোজেও অনেকে ভোজনের পারদর্শীতা দেখাইয়া বিখ্যাত হইতেন। কেহ বা দুই তোলা ডাল খাইয়া ফেলিলেন, কেহ বা দশটা বড় কাতলা মাছের মাথা সুন্দররূপে চর্ব্বণ করিয়া সকলের সঙ্গে আহার সমাপ্ত করিয়া উঠিলেন, কেহ বা এক খোরা অম্ল চুমুক দিয়া শেষ করিলেন, কেহ বা এক তোলা পায়স একাকী আহার করিলেন। এক ব্রাহ্মণের গৃহে সরস্বতী পূজায় একটী অষ্টাদশ বর্ষীয় যুবাকে ১০।১২ জন লোকের খেচরান্ন একাকী খাইতে দেখিয়াছি।

মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর একটু নিদ্রা দেওয়া ছিল। অপরাহ্নে গাত্রোত্থান করিয়া কিছু ফলমূল জলযোগান্তে আবার কার্য্যস্থানে যাইতে হইত। এক প্রহর রাত্রে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া মধ্যাহ্নের ন্যায় ভোজন হইত। কলিকাতার বাবুলোকের মধ্যে অনেকে রুটী, ছোলার ডাল, বেগুণ ভাজা ও ঘণ্ট ভোজন করিয়া দুগ্ধ পান করিতেন।

---

*গত ১৫ই চৈত্র "সাহিত্য পরিষদে" পঠিত প্রবন্ধ, সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত।

প্রাচীন আচার ব্যবহার

২

ধর্ম্ম। শাক্ত, সৌর, শৈব, গাণপত্য ও বৈষ্ণব এই কয় প্রকার উপাসক থাকিলেও, সাধারণত শাক্ত ও বৈষ্ণব, এই দুই শ্রেণীর ধর্ম্মই এ প্রদেশে প্রচলিত। পূর্ব্বে ভাগবতী বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচলিত থাকিলেও শাক্তদিগেরই বিশেষ প্রাবল্য ছিল। চৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থে অদ্বৈত আচার্য্যের কথা পাঠ করিলে বুঝা যায়, শাক্তদিগের ক্রিয়াকর্ম্মে বৈষ্ণবদিগকে অত্যন্ত মর্ম্মবেদনা পাইতে হইত, সেইজন্য তিনি বিষ্ণুভক্তি প্রেরণের জন্য নিয়ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেন। তাঁহার প্রার্থনা গ্রাহ্য হইল, প্রেম-ভক্তি প্রচারার্থ নিমাইচাঁদ প্রেরিত হইলেন, বাঙ্গালায় যুগ পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইল।

যিনি যত বড় পণ্ডিত হউন না কেন, শাস্ত্রকে অগ্রাহ্য করিবার কাহারও সাহস ছিল না, ধর্ম্ম বিষয়ে বিচার উপস্থিত হইলে, যিনি যত শাস্ত্রীয় বচন প্রয়োগ করিতে পারিতেন, তিনিই জয়ী হইতেন। যুক্তি, শাস্ত্রানুযায়িক না হইলে তাহা কুযুক্তি, সুতরাং অগ্রাহ্য হইত। বেদ ও উপনিষদের ধর্ম্ম বাঙ্গালায় কখন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল কি না, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, পৌরাণিক ও তান্ত্রিক ধর্ম্মই বৌদ্ধদিগের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে এ প্রদেশকে আচ্ছন্ন করিয়াছিল।

ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা জনসমাজকে ধর্ম্মপথে অটল রাখিবার জন্য এমন অচ্ছেদ্য পদ্ধতি-শৃঙ্খলে বন্ধন করিয়াছিলেন যে, লোকের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত, চিরজীবনই ধর্ম্মে বাস করিতে হইত। প্রভাতে নিদ্রাভঙ্গ হইতে রাত্রের নিদ্রা পর্য্যন্ত প্রতি নিঃশ্বাসে ধর্ম্মকেই গ্রহণ করিতে হইত। এমন আশ্চর্য প্রবল ধর্ম্ম-শাসন পৃথিবীর অন্য কোন দেশে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই বিংশ শতাব্দীর উচ্চশিক্ষা ও বিজ্ঞান সেই পর্ণকুটীরবাসী তালপত্রবাহী দরিদ্র ব্রাহ্মণদিগের শাসনশৃঙ্খল স্পর্শ করিতেও কম্পিত হইতেছে। অবশ্য কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস ধর্ম্মের নামে বাঙ্গালীজাতির অনেক সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তত্রাচ ইহা নিশ্চয় বলিতে হইবে, উপরোক্ত প্রকার কঠোর শাসনে আবদ্ধ না থাকিলে, প্রবল মুসলমান রাজত্বকালের শেষে বঙ্গদেশে হিন্দু নামে পরিচয় দিবার জন্য কেহ থাকিত কিনা সন্দেহ।

আমরা ইতিপূর্ব্বে স্নান আহ্নিকের কথা যৎকিঞ্চিৎ বর্ণন করিয়াছি, এক্ষণে পালনীয় পর্ব্ব অর্থাৎ "পাল পার্ব্বণের", ব্রতানুষ্ঠানের ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের এমন কি, আমোদ প্রমোদ ও ভীষণ পাপ অত্যাচারের মধ্যেও ধর্ম্ম কি প্রকার প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছিল, তাহা দেখাইতে ইচ্ছা করি।

সম্বৎসরে অর্থাৎ বারমাসে তেরটী পর্ব্ব, যথা—

চৈত্রমাসে চড়ক পূজা গাজনে বাঁধ ভারা (১)
বৈশাখ মাসে দেয় সকল তুলসীগাছে ঝারা (২)
জ্যৈষ্ঠমাসে ষষ্ঠীবাঁটা জামাই আনা আনি (৩)
আষাঢ় মাসে রথযাত্রা দড়া টানাটানি (৪)
শ্রাবণ মাসে ঢেলাফেলা হয় চড়চড়ী (৫)
ভাদ্র মাসে টকপান্তা খান মনসা বুড়ী (৬)
আশ্বিনে অম্বিকা পূজা কাটে মোষ পাঁঠা (৭)
কার্ত্তিকে কালিকা পূজা (৮) ভাইদ্বিতীয়ার ফোঁটা (৯)
অগ্রাণে নবান্ন নূতন ধান কেটে (১০)
পৌষ মাসে বাউনী বাঁধা ঘরে ঘরে পিঠে (১১)
মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমী ছেলের হাতেখড়ি (১২)
ফাল্গুন মাসে দোলযাত্রা ফাগ ছড়াছড়ি (১৩)

উপরোক্ত পর্ব্ব ভিন্ন আরও অসংখ্য ব্রত, পূজা ও নিয়ম আছে, তাহা সমস্ত প্রকাশ করা অসম্ভব। কতকগুলির কথা বলিতেছি। বাসন্তী ও অন্নপূর্ণা পূজা, জল সংক্রান্তি ব্রত, রামনবমী, মদন ত্রয়োদশী, বা কন্দর্প পূজা,[১] অক্ষয় তৃতীয়া—শিব গঙ্গা কৈলাস হিমালয় ও ভগীরথের পূজা, সীতা নবমী, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী—প্রহ্লাদ ও বিষ্ণু পূজা, চন্দন যাত্রা বা ফুলদোল, ত্রিলোচনাষ্টমী, সাবিত্রী ব্রত—যম পূজা, ফলহারিণী কালিকা পূজা, রম্ভা তৃতীয়া ব্রত,উমা চতুর্থী ব্রত,ষট্ পঞ্চমী, আরণ্য ষষ্ঠী, দশহরা—গঙ্গা ও মনসা পূজা, স্নানযাত্রা, অম্বুবাচী, হোড়া পঞ্চমী, বিবস্বৎ সপ্তমী, চাতুর্ম্মাস্য[২] ঝুলনযাত্রা, রাসযাত্রা, জন্মাষ্টমী, অঘোর চতুর্দ্দশী, আলোক অমাবস্যা বা গো-সহস্রী, লক্ষ্মী পূজা, হরিতালিকা ব্রত, সৌভাগ্য চতুর্থী ব্রত, রক্ষা পঞ্চমী, মন্থন ষষ্ঠী পূজা, ললিতা সপ্তমী বা কুক্কুটী ব্রত, রাধাষ্টমী বা দুর্ব্বাষ্টমী ব্রত, সীতাষ্টমী বা জীমূতবাহন পূজা, তর্পণ অমাবস্যা, বীরাষ্টমী ব্রত, কোজাগর পূর্ণিমা বা লক্ষ্মীপ্রতিমা পূজা, ভূতচতুর্দ্দশী, দীপাবলী, কাত্যায়ন ব্রত, গোষ্ঠাষ্টমী, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা, মহাদ্বাদশী, গুহ ষষ্ঠী, মিত্র সপ্তমী,

পাষাণ চতুর্দ্দশী, রটন্তী কালিকা পূজা, বরদা চতুর্থী, বিনায়ক ব্রত বা গণেশ পূজা, শীতলাষ্টমী, ভীম একাদশী, শিবরাত্রি, ঘণ্টাকর্ণ (ঘেঁটু) পূজা, অশোক ষষ্ঠী প্রভৃতি। বালিকাদিগেরও অনেকগুলি ব্রত আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী উল্লেখ করিলাম :—ঋতু পূজা[৩] গোকাল গাভী পূজা, ফল গছান, ধন গছান, সেঁজুতী ব্রত, পুণ্য পুকুর, যম পুকুর, নখচুল প্রভৃতি।

উপরে যতগুলি বিষ্ণু পূজা বিষয়ক পর্ব্ব ও ব্রত লিখিত হইল, সে সমস্তই ভাগবতী বৈষ্ণবকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে। গোস্বামী মহাশয়েরাও চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পর হইতে অনেকগুলি স্মরণীয় দিনে মহোৎসবাদি করিয়া বৈষ্ণব পর্ব্বদিনরূপে প্রচলিত করিয়াছেন।

যোত্রমান লোকে বারমাসে তের পার্ব্বণ ত করিতেনই, তদ্ভিন্ন জগদ্ধাত্রী, কার্ত্তিক প্রভৃতি পূজাও তাঁহাদের অবশ্যকর্ত্তব্য ছিল। যাঁহার গৃহে বৎসরে দুই তিনটী পরবের অনুষ্ঠান না হইত, তিনি পাঁচজনের একজন বলিয়া গণ্য হইতে পারিতেন না। অনেক ভদ্রলোক মহরম পর্ব্বেরও অনুষ্ঠান করিতেন, পথে তাজিয়া বাহির করিয়া হাসন-হুসেনের নাম করিয়া বুক চাপড়াইতেন ও লাঠী খেলিতেন।

হিন্দু মুসলমানে কেহ কাহারও ধর্ম্মে আঘাত দিয়া বাদ বিসম্বাদ প্রায় করিত না। এক গ্রামবাসী হিন্দু মুসলমান পরস্পর সম্পর্ক পাতাইয়া সুখে বাস করিতেন, "দেহ সম্বন্ধ হইতে গ্রাম সম্বন্ধ সাঁচা" বলিতেন। পরস্পরের বিপদে সাহায্য ও সম্পদে যতদূর সাধ্য, যোগদান করিতেন। অনেক মুসলমান গোবধ দূরে থাকুক গো-মাংস ভোজনও করিতেন না। অনেকে হিন্দু দেবতার পূজা দিতেন। বসন্ত রোগ হইতে কেহ আরোগ্য লাভ করিলে, প্রতিবাসী হিন্দুর গৃহে শীতলা প্রতিমা পূজা করাইয়া যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন। তদ্ভিন্ন অনেক মুসলমান জমীদার দুর্গোৎসব করিতেন। পূর্ণিয়া জেলায় কৃষ্ণগঞ্জ সবডিবিসনের মুসলমান জমীদারেরা আজিও তাঁহাদের কুতুবগঞ্জ বাজারটী দুর্গোৎসবের ব্যয়ের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন, প্রতি বৎসর উক্ত বাজারে মহা সমারোহে দুর্গোৎসব হইয়া থাকে। আমরা একবার এই পূজার সময় উপস্থিত ছিলাম, এইস্থানে হিন্দুর বাস নাই বলিলেও হয়, দলে দলে মুসলমান স্ত্রী পুরুষ আসিয়া "দুর্গো বিবিকে" দর্শন করিয়া পয়সা দিয়া সেলাম করিয়া যায়। কেবল দুর্গোৎসব নহে, এই জমীদারের বাটীর সংলগ্ন স্থানে কৃষ্ণচন্দ্র নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছেন। বিগ্রহের রীতিমত ঠাকুরবাটী, পূজারী, লোকজন এবং নিত্য অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে, হিন্দু অতিথি আসিলে এই ঠাকুরবাটীতে সেবাপ্রাপ্ত হয়।

মুসলমান রাজত্বকাল মধ্যে গৌড়নগরে গণেশ নামক যে রাজা ক্ষণপ্রভার ন্যায় কয়েকদিন হিন্দু রাজত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনি হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতির জন্য সত্যনারায়ণের ও শুভচণ্ডীর পূজা প্রবর্ত্তন করেন। প্রথমোক্তটী পুরুষদিগের, দ্বিতীয়টী স্ত্রীলোকদিগের জন্য। উভয় পূজাতেই মুসলমানকে সাদরে নিকটে বসাইতে হয়, পূজা ও দেবতার মাহাত্ম্য পাঠান্তে সভাস্থ মুসলমানকে অগ্রে প্রসাদ বিতরণ করিতে হয়, শুভচণ্ডীর পূজাতেও ঐরূপে অগ্রে মুসলমান সধবার মস্তকে তৈল, সিন্দুর, প্রসাদ ও পান সুপারি দিয়া আদর করিতে হয়।

যিনি দুই টাকা আড়াই টাকা বেতনের চাকুরী করিতেন, তাঁহার গৃহে দোল-দুর্গোৎসব হইবে। বিশেষত ব্রাহ্মণগৃহে দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা, পণ্ডিত ভট্টাচার্য্যের গৃহে বা টোলে, গুরু মহাশয়ের পাঠশালে সরস্বতী পূজা, সৌখীন লোকের গৃহে কার্ত্তিক পূজা, আর নিষ্ঠাবান বৈষ্ণবের বাসগৃহে, উদাসীনের আখড়ায় সমস্ত বৈষ্ণব পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হইত। চারি পাঁচখানি দুর্গোৎসব হইত না, এমন গলি ভদ্রপল্লীতে দেখা যাইত না। পূর্ব্বে যে যে গৃহে পূজার মহা আড়ম্বরে পল্লী আমোদিত হইত, এখন তাঁহাদের অনেক পরিবার হীনাবস্থ হওয়ায়, পূজা বন্ধ হইয়াছে। এখনকার কালে যাঁহারা সহরে নূতন ঐশ্বর্য্যবান হিন্দু বলিয়া পরিচয় দেন, তাঁহারা যে কার্পণ্যপ্রযুক্ত পূজা আনয়ন করেন না, তাহা বলিতে পারি না, তাঁহাদের বিবিধ প্রকার বায়ভূষণেও তাহা বলে না। ইংরাজী শিক্ষা আর ব্রাহ্মসমাজের নিরাকার ঈশ্বরজ্ঞানই তাঁহাদিগকে পৌত্তলিকতা হইতে দূরে রাখিতেছে, তাহার সন্দেহ নাই। বৎসরের পর বৎসর কলিকাতার অধিবাসীর সংখ্যা বাড়িতেছে, অথচ সকল পূজারই প্রতিমা সংখ্যা বৎসরের পর বৎসর কমিয়া আসিতেছে, ইহা দেখিয়া কোন্ চিন্তাশীল লোকে না বলিবে যে, আর পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রতিমাপূজা জনশ্রুতিতেই থাকিয়া যাইবে। ইতিমধ্যেই কোন কোন প্রাচীন পরিবারের পুজার তৈজসাদি খড়্গ মোষ-ছাগবলির রক্ত-চন্দনের হাড়িকাঠ, পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তির চিহ্নস্বরূপ মিউজিয়মের ন্যায় প্রদর্শিত হইয়া থাকে।

পূর্ব্বে সাধারণ লোকে ভক্তিপূর্ব্বক নিষ্ঠার সহিত সাত্ত্বিকভাবে পূজা করিতেন, আড়ম্বরের জন্য নহে, সুতরাং অল্পব্যয়ে কার্য্য সমাধা করিতে পারিতেন। ২০।২৫ টাকায় দুর্গোৎসব সম্পন্ন করিতে শুনা গিয়াছে। রেষারেষির পূজাও যে ছিল না, এমন নহে, "বড় বাবু চারিটা ঢোল দুইটা ঢাক রাখিয়াছে, আমায় আটটা

ঢোল চারিটা ঢাক রাখিতে হইবে। ওখানে দুইটা পাঁঠা বলি হইবে, আমি আটটা বলি দিব” ইত্যাকার ব্যাপারও ছিল। অনেক ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী নিজে নিঃস্ব হইলেও ভিক্ষা করিয়া পূজা করিতেন। আমাদের পল্লীর এক ব্রাহ্মণীর কথা এখানে উপমাস্থলে বলিলে সেকালের অনেক আলোক প্রকাশিত হইবে। তাঁহার নাম বামাঠাকুরাণী। তিনি কুলীনের কন্যা, চিরদিন তাঁহাকে সধবা দেখিয়াছি, কিন্তু কখন তাঁহার স্বামীকে দেখি নাই, তাঁহার কথাও শুনি নাই। বামাঠাকুরাণী পল্লীর অধিষ্ঠাত্রী দেবীর ন্যায় সমস্ত হিন্দু পরিবারের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিতেন। কাহারও মা, কাহারও মাসী, কাহারও পিসী, কাহারও দিদি, কাহারও বা ঠাকুরুণদিদি সুবাদ লইয়া ধনী দরিদ্র ব্রাহ্মণ শূদ্র নির্ব্বিশেষে সকল গৃহে ষোলআনা পসার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। রোগে শোকে ক্রিয়াকর্ম্মে তিনি সকল অন্তঃপুরের প্রধান পরামর্শদায়িনী, সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী। অনেক গৃহে ক্রিয়া উপলক্ষে রন্ধনশালার কর্ত্রী, মেয়ে কর্ম্মে ভাণ্ডারের রক্ষয়িত্রী হইতেন। একাদশীর দিনে সধবারা তাঁহার ললাটে সিন্দূর দিয়া যথাসাধ্য দান করিতেন। ভদ্রগৃহে ক্রিয়াকর্ম্ম উপলক্ষে তিনি এক একখানি সাড়ী ও একটী সিধা পাইতেন। এই প্রকারের আয়ে তাঁহার সম্বৎসরের ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু নিজে কখন কাহাকেও কোন অভাবের কথা জানাইতে শুনি নাই, অথচ সকল বিবাহাদিতে আইবুড়ভাত ও যৌতুকাদি দেওয়া ছিল, অবশ্য প্রণামী পাইতেন। বামাঠাকুরাণী প্রতি বৎসর দুর্গোৎসব ও জগদ্ধাত্রী পূজা করিতেন। তাঁহার পূজায় তামসিকতার প্রবেশ নিষেধ ছিল প্রবেশ নিষেধ ছিল, সম্পূর্ণ সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন হইত। উভয় পূজা উপলক্ষে পল্লীর ইতর ভদ্র কাহারও গৃহে রন্ধন না হয়, ইহা তাঁহার একান্ত অনুরোধ থাকিত। অসংখ্য প্রতিবাসীকে খেচরান্ন ভোজন করাইতেন, যে সকল বাটীর স্ত্রীলোকেরা পূজাগৃহে যাইতে অক্ষম হইত, তাহাদের জন্য প্রসাদ পাঠাইয়া দিতেন, অনেকের গৃহে নিজে প্রসাদ বহন করিয়া দিয়া আসিতেন। ভদ্রলোকে প্রণামী ভিন্ন রীতিমত সিধা পাঠাইতেন, দরিদ্রেরা প্রণামী না দিলেও, যথাসাধ্য সিধা দিতে কাতর হইত না। সে সময় একটী ভাল সিধার মূল্য এখন অপেক্ষা অনেক সুলভ ছিল। একমণ চাউলের মূল্য এক টাকা বার আনা, পাঁচসের ডাল পাঁচ আনা, একপোয়া তৈল এক আনা, একপোয়া ঘি তিন আনা, একসের লবণ এক আনা, কাষ্ঠ মসলা ও তরকারি দিগর দুই আনা, এই আড়াই টাকার মধ্যে এমন একটী সিধা হইত, যাহা এক্ষণে দশ টাকায়

কমে হয় না। এইরূপ সিধা দশ পনেরটী আসিলেই বামাদেবীর দুর্গোৎসব সম্পন্ন হইয়া যাইত, বিচিত্র কি? কেবল আমাদের পাড়ায় নয়, সকল পল্লীতেই দুই একজন এই শ্রেণীর লোক বাস করিতেন। "পাত পাতিলেই ভাত" ব্রাহ্মণ-বাড়ীর ইহা অতি প্রাচীন প্রবাদ। ব্রাহ্মণ যেমন চিরদিন ভিক্ষাজীবী, তেমনি শূদ্র গিয়া তাঁহার নিকট প্রসাদ-প্রার্থী হইলে তিনি তাহাকে কখনই বিমুখ করিবেন না, ইহাই চিরন্তন প্রথা। পূজার সময় ব্রাহ্মণবাটীতে অনিমন্ত্রিত গরিবলোক গিয়া বসিলেই আদরের সহিত উদর পূর্ণ করিয়া আহার করিয়া আসিত।

জন্মতিথি পূজাও একটী অতি সুন্দর ও প্রাচীন পদ্ধতি। ইহার অনুষ্ঠান দেখিয়া বোধ হয়, পৌরাণিক কালের অনেক পূর্ব্বে ইহার প্রচলন হইয়াছে। ইহাতে দুগ্ধের সহিত গুড় মিশ্রিত করিয়া পান করা, তিল বপন করা ও মৎস্য-জীবীর নিকট হইতে জীবিত মৎস্য আনিয়া জলাশয়ে ছাড়িয়া দেওয়া প্রধান অনুষ্ঠান। তিনটীর মধ্যেই সুভাব নিহিত দেখা যায়। দুগ্ধের সহিত গুড় ভোজনের অর্থ এই যে, ভগবান আমায় এক বৎসর যখন বাঁচাইয়া রাখিলেন, তখন তাঁহাকে প্রণাম করিয়া সুখাদ্য ভোজন করি, দ্বিতীয়টীর উদ্দেশ্য তিলের ন্যায় বংশবৃদ্ধি হউক, আর তৃতীয়টীতে একটী জীবের প্রাণদান করা হইল। দুগ্ধ গুড় দেখিয়া অনুমান করা যায়, যখন চিনি আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন হইতে এই পদ্ধতি প্রচলিত। নববস্ত্রাদিতে ভূষিত হইয়া পূজান্তে গুরুজনদিগকে প্রণাম করিয়া, বরের ন্যায় চিত্রিত পিঁড়ায় বসিয়া, দিবসে প্রদীপের আলোকে বন্ধুবান্ধব ও সমবয়সীদিগের সহিত একত্র বসিয়া আহার করাটীও দেখিতে অতি সুন্দর।

"গৃহস্থ যে কোন কার্য্য করিবে, তাহা ভগবানে সমর্পিত হউক" মহা-নির্ব্বাণ-তন্ত্রের এই মহাবাক্য পূর্ব্বের ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা রীতিমত প্রতিপালন করিতেন। চক্ষুরুন্মীলন হইতে চক্ষু মুদ্রিতকরণ পর্য্যন্ত কোন কার্য্য ভগবানকে স্মরণ না করিয়া করিতেন না। বালার্ক ও সন্ধ্যাপ্রদীপ অবশ্যপ্রণম্য ছিল। ধর্ম্মের জন্য ত্যাগস্বীকার গৌরবের বিষয়, ইহা সকলেই বলিয়া থাকে, কিন্তু তাঁহারা ইহা জীবনে সর্ব্বদাই দেখাইতেন। উপবাস বা ভোজনের ব্যবস্থা হিসাব করিলে বৎসরের মধ্যে চারি মাসেরও অধিক দেখা যায়। সকলেই যে সমস্তগুলি পালন করিতেন, তাহা না হইলেও, অনেক বিধবা ও অনেক ধর্মাত্মা পুরুষ অনেক উপবাসাদি করিতেন। ইহাতে তাঁহাদের শরীর ভালই থাকিত। এক বিধবাকে

[উপর্য্যুপরি তিন চারিদিন উপবাস করিয়া গৃহকর্ম্ম করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তোমার এই উপবাসে কি কোন কষ্ট হইতেছে না, তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তুমি কি জান না, আম্সী যত শুকাইবে, ততই ভাল থাকিবে।

ধর্ম্মকে প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়তম করাই শ্রেষ্ঠজীব মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, একথা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু ধর্ম্মের মধ্যে অন্ধবিশ্বাস প্রবেশলাভ করিলে ধর্ম্মকেই অধর্ম্ম করিয়া তোলে। হজরত মহম্মদ বলিয়াছিলেন, "মেঘ হইতে এবং পর্ব্বত ভেদ করিয়া যে জলধারা পতিত হয়, তাহা নির্ম্মল, সেই নির্ম্মল জল পৃথিবী দিয়া যত দূরে গমন করিতে থাকে, ততই কর্দ্দম ও আবর্জ্জনায় অতি জঘন্য মলিনতাপ্রাপ্ত হইয়া অপেয় হয়, তদ্রূপ ভগবানের ভাব যখন সাধু ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তকের ভিতর হইতে প্রকাশিত হয়, তখন খাঁটি সত্য, তাহাই লোকপরম্পরায় নানা অসত্য ও কুসংস্কারের আবর্জ্জনায় মিশ্রিত হইয়া অধর্ম্ম হইয়া দাঁড়ায়।" অতি প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মে অন্ধবিশ্বাস মিশ্রিত হইয়া সেই দশা উপস্থিত হইয়াছিল। ভগবানের কৃপায় ইংরাজ জাতি যদি ভারতের রাজা না হইতেন, তাহা হইলে এতদিনে আমাদের কি দুর্দ্দশা হইত, ভাবিয়া স্থির করা যায় না। তুষানল, অগ্নিকুণ্ড, জগন্নাথের রথচক্র, গোমুখী পর্ব্বত, এলাহাবাদের ত্রিবেণী, আসামের ব্রহ্মকুণ্ড প্রভৃতিকে স্বর্গের দ্বার বিশ্বাস করিয়া কত শত ধর্ম্মবীর যে হাস্যমুখে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাহা বলা যায় না। অন্ধবিশ্বাসে জ্ঞানশূন্য হইয়া গর্ভধারিণী জননী অসহায় দুগ্ধপোষ্য শিশুপুত্রকে স্বহস্তে সাগরজলে বিসর্জ্জন দিয়া আপনাকে সত্যমুক্ত মনে করিতেন।[৪] ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২০ আগষ্ট লর্ড ওয়েলেসলি এই ভীষণ প্রথা রহিত করিয়া আমাদিগের নিকট চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন, ভগবান তাঁহার বংশকে অক্ষয় করুন। উক্ত বৎসর পৌষ সংক্রান্তির সময় সাগরে একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া প্রসূতিদিগকে উক্ত কার্য্য করিতে নিবারণ করা হইয়াছিল।

গঙ্গাযাত্রা ও অন্তর্জ্জলি প্রথা এখনও বর্ত্তমান আছে বটে, কিন্তু পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক শিথিল হইয়াছে। পূর্ব্বে কেহ ঘরে মরিলে প্রেতত্ব লাভ করিত। আত্মহত্যা বা অপমৃত্যু বা আকস্মিক মৃত্যু যেমন নিশ্চয়-প্রেতত্বের লক্ষণ, ঘরের মধ্যে খট্টার উপর "ত্রিশূন্যে" মরিলেও তদ্রূপ বিশ্বাস করা হইত। বৃদ্ধ-বৃদ্ধা ঘরে মরিলে আত্মীয়স্বজনের নিন্দা হইত, পিতা-মাতা ঘরে মরিলে পুত্র লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিতেন না। সজ্ঞানে তীরস্থ হইয়া অন্ততঃ ত্রিরাত্রি গঙ্গাতটে বাস, গঙ্গাজল পান, গঙ্গাদর্শন, হরিনাম উচ্চারণ, হরিকথা শ্রবণান্তর স্বহস্তে বৈতরণী প্রায়শ্চিত্ত করিয়া মৃত্যুকালে গঙ্গাসৈকতে অর্দ্ধনাভি জলে নিমগ্নাবস্থায়

শায়িত হইয়া ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করিবে। চারিদিকে আত্মীয়গণ "অঙ্গে গঙ্গা নারায়ণ ব্রহ্ম বল" বলিয়া নাম ডাকিতে থাকিবে। যিনি এই অবস্থায় মরিতে পারিতেন, তাঁহার সৌভাগ্যের সীমা থাকিত না। চিরজীবন পাপই করুক আর পুণ্যই করুক এই অবস্থায় মৃত্যু হইলে স্বর্গের দ্বার অনিবার্য্য। সেইজন্য চূড়ামণি দত্ত নিজের গঙ্গাযাত্রাকালে যে দর্প-গীত রচনা করিয়াছিলেন, তাহার শেষে ছিল "জপ তপ কর কি ভাই মর্ত্তে জানলে হয়।" ঘাটে লইয়া গিয়া আর চিকিৎসা করা হইত না, তখন তাহাকে মরিতেই হইবে, মৃত্যুর বিলম্ব বুঝিলে আত্মীয়েরা "সৃত" করিতেন। দধি, ঘোল, চাঁপাকলা প্রভৃতি শ্লেষ্মা-উত্তেজক বস্তু খাওয়াইয়া শীঘ্র শীঘ্র আপদ চুকাইবার চেষ্টা করাকে "সৃত" করা বলে। ইহাতেও যদি কেহ বাঁচিয়া যাইত, তাহা হইলে তাহার আর দুর্গতির সীমা থাকিত না, "ঘাট ফেরতা" বলিয়া সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত, গৃহে তাহাকে আর স্থান দেওয়া হইত না। হতভাগ্য নিজ গৃহের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইলেও পরিবারের অকল্যাণ ও লোকগঞ্জনার ভয়ে নিজেই ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন তীর্থে গিয়া বাস করিত। আত্মীয়েরা মৃত-নিশ্চয় করিয়া যাহাকে সৎকারার্থে শ্মশানে লইয়া গিয়াছে, সে যদি জীবনের কোন লক্ষণ প্রদর্শন করিত, তাহা হইলে "দানায়" পাইয়াছে বিশ্বাস করিয়া কুদালি, কুঠার প্রভৃতির আঘাতে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বিনাশ করা হইত।

সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ ও নিষ্ঠুর ব্যাপার, হিন্দুরমণীর সহমরণ প্রথা। খ্রীষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে ধর্ম্মের জন্য অনেক লোক হত হইয়াছে, কিন্তু সে সমস্তই ধর্ম্মযুদ্ধে, কোথাও উভয়েই শাণিত অস্ত্র ধারণ করিয়াছে, আর কোন কোন স্থানে একজনের হস্তে ক্ষমা ও বিশ্বাসের অস্ত্র, অপরে ঘৃণা ও বিদ্বেষ দ্বারা সাধু হত্যা করিয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের শেষাবস্থাতেও অনেক লোক ধর্ম্মার্থ প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছে। অন্ধবিশ্বাস নাই, এমন ধর্ম্ম জগতে দুর্ল্লভ না হইলেও, হিন্দুর ইহাতে শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হইবে। আরব্যোপন্যাসে মৃত পত্নীর সহিত জীবিত পতিকে পর্ব্বতগহ্বরে মরিতে প্রেরণ করার গল্প পাঠ করিয়া শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠে, তবুও তাহা গল্পমাত্র, আর আমাদের পিতামহীরা আত্মীয়-কুটুম্ব ও গর্ভজাত সন্তানের সাহায্যে যেরূপে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণদান করিতেন, তাহার গল্প শুনিলে কাঁদিতে হয়, লজ্জায়, শোকে ও ক্রোধে অধীর হইতে হয়। আজিও অনেক সতীর গর্ভজাত সন্তান পৃথিবীতে বর্ত্তমান রহিয়াছেন, কারণ সে ত অধিকদিনের কথা নহে, ৭৬ বৎসর পূর্ব্বের মাত্র।

১. ইহা এক্ষণে দক্ষিণ বাঙ্গালায় প্রচলিত দেখা যায় না, কিন্তু উত্তরবঙ্গে

বিশেষত কুচবিহার ও আসাম প্রদেশে সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হয়।

২. যো বিনা নিয়মং মর্ত্ত্যো ব্রতং বা জপ্যমেববা,
চাতুর্ম্মাস্যং নয়েন্মুর্খো জীবন্নপি মৃতোহি সঃ।
শ্রাবণে বর্জ্জয়েচ্ছাকং দধি ভাদ্রপদে তথা,
দুগ্ধ মাশ্বযুজেমাসি কার্ত্তিকে চামিষং ত্যজেৎ॥

৩. অগ্রহায়ণের ১লা ও প্রতি রবিবার প্রাতে প্রত্যেক বালিকা প্রতিপালন করিতে বাধ্য। প্রাতে গৃহিণী বালিকাদিগকে লইয়া শয্যায় ঋতু অর্থাৎ সূর্য্যদেবের পূজার মাহাত্ম্য গল্প শুনাইয়া শয্যাত্যাগ করিতেন, যতক্ষণ না পূজা হয়, ততক্ষণ বালিকারা জল পর্য্যন্ত পান করিতে পায় না।

৪. অনেক প্রসূতির নিজের অসুস্থতাবশত দ্বিতীয় সন্তান ভূমিষ্ঠ হইতে না হইতে প্রথম শিশুটী মারা পড়ে, স্ত্রীলোকেরা এই মৃত্যু নিবারণার্থ নানাপ্রকার "তুক তাক" করিয়া থাকে, তন্মধ্যে কড়ি লইয়া ধাত্রীকে পুত্রবিক্রয় প্রথাটীও প্রচলিত, কড়ির অনুপাতে এক কড়ি, দুকড়ি, তিনকড়ি, পাঁচকড়ি, সাতকড়ি এমনকি নকড়িতে বিক্রয়েরও প্রমাণ পাওয়া যায়। এ সংস্কারের উপর কোন আপত্তি নাই, দেবতার পূজা মানাতেও আপত্তি নাই, কিন্তু সাগরকে পুত্রদান স্বীকার করিয়া দ্বিতীয় পুত্রের প্রার্থনা কি ভীষণ নৃশংস ব্যাপার! "হে সমুদ্র আমার কোলে একটী আর কাঁকে বা হাতে একটী হইলে আমি একটী সন্তান তোমাকে প্রদান করিব"বলিয়া মানস করিয়া রাখা হইত। সাগরের কৃপায় (!) যদি তাহাই হইত তবে পৌষ সংক্রান্তির সাগরস্নানের সময় সাগরসঙ্গমে লইয়া গিয়া কোলের শিশুটীকে গভীর জলে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দেওয়া হইত। নিকটে অল্প জলে ফেলিলে অপরে তুলিয়া লইবে, প্রসূতি প্রতিপালন না করিয়া অপরের দ্বারা পালিত হইলেও চলিবে না, কারণ তাহাতে সন্তানটীর মায়া কাটাইয়া ত সাগরকে দেওয়া হইল না। সেই সময় নরমাংসলোলুপ শত শত হাঙ্গর কুম্ভীর শিশু গ্রাস করিবার জন্য মুখব্যাদান করিয়া থাকিত, সুতরাং কোন মনুষ্য সাহস করিয় নিক্ষিপ্ত শিশুকে রক্ষা করিতে যাইত না। কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিলাম ভাবিয়া প্রসূতি হাস্যমুখে অপর শিশুটীর "সাগরদাস"নাম রাখিয়া কোলে লইয়া গৃহে ফিরিতেন সন্ন্যাসীর নিকট হইতে ঔষধ সেবন করিয়া প্রসূতির মৃতবৎসা রোগ আরোগ হইলে একটী পুত্র সন্ন্যাসীর প্রাপ্য হইত। পঞ্চম বৎসরের অধিক বয়স্ক হইলে সন্ন্যাসী আসিয়া প্রার্থনা করিবামাত্র পুত্রটীকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইত চৈতন্যদেবের প্রধান সহকারী নিত্যানন্দ প্রভুও এই নিয়মে অবধূত সম্প্রদা হইয়াছিলেন।

প্রাচীন আচার ব্যবহার

৩

সতীদাহের আমরা অনেকগুলি গল্প শুনিয়াছি, কিন্তু ইংরাজেরা যে সমস্ত গল্প সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই যেন অতিরঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়। কেবল একমাত্র হালিডে সাহেব, যিনি সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালার ছোট-লাট হইয়াছিলেন, তাঁহার বর্ণনায় সতীর প্রতি কোন অত্যাচারের উল্লেখ নাই। সাহেবেরা লিখিয়াছেন, পুরুষেরা আপনাদিগের বংশগৌরব বৃদ্ধি, ধনলোভ প্রভৃতির জন্য বিধবাদিগকে মৃত পতির সহিত মরিবার নিমিত্ত নানাপ্রকারে উত্তেজিত করিত, ভয় দেখাইত, পুণ্য ও স্বর্গবাসের লাভ এবং পূর্ব্ব মহিলাদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করিয়া যাহাতে সে মরিতে সংকল্প করে, তাহার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করিত। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধাদিগের অপেক্ষা অল্পবয়স্কা যুবতী বা বালিকাদিগকে মারিবার জন্যই অধিক চেষ্টা হইত। "ভগবান নির্ব্বিঘ্নে কার্য্যসিদ্ধি করিবেন" বলিয়া অপর্য্যাপ্ত সিদ্ধি সেবন করান হইত। সাহেবদের এইসকল কথা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, তাহাও বলা যায় না। লোকে বিধবার সুখ্যাতি, ব্রহ্মচর্য্য ও পারিবারিক সেবার কথা উল্লেখ করিয়া যতই কেন গৌরব প্রকাশ করুক না, বালবিধবা বা অল্পবয়স্কা বিধবা যে পরিবারের কণ্টক ও চক্ষুশূল, ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? সহমরণের নিষ্ঠুরতা ছাড়িয়া দিলেও এ কথা কি মিথ্যা যে, উক্তবিধ মহিলার মৃত্যুতে লোকে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইয়া থাকে? আমরা একটী যুবতী বিধবাকে মৃত্যুশয্যায় তাহার রোরুদ্যমানা সধবা জননীকে এই বলিয়া প্রবোধ দিতে শুনিয়াছি যে, "মা তুমি যে কি আরাম পাইতেছ, তাহা কি আমি বুঝিয়া যাইতেছি না।" সত্যকথা বলিতে কি, যে জাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত নাই, সে জাতিতে সতীদাহ প্রচলিত থাকাই যেন উচিত। চিরজীবন তুষানলে দগ্ধ হওয়া অপেক্ষা বিধবা হওয়ামাত্র স্বামীসহ চিতায় দগ্ধ হওয়া যেন ভাল বোধ হয়। প্রাচীন আর্য্যেরাও এই কারণে সতীদাহ বিধি প্রচার করিয়া থাকিবেন। রামায়ণে সতীদাহের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, মহাভারতে মাদ্রী দেবী পাণ্ডুরাজের মৃতদেহের সহিত দগ্ধ হইয়াছিলেন দেখিতে পাওয়া যায়।

সতীদাহ দ্বিবিধ, সহমরণ ও অনুমরণ। স্বামীর দেহসহ দগ্ধ হওয়া সহমরণ,

আর দূরদেশে মৃত স্বামীর দেহাভাবে তাঁহার কোন ব্যবহার্য্য বস্তু লইয়া চুল্লী-শয়ন করিয়া দগ্ধ হওয়াকে অনুমরণ বলিত। এই অনুমরণ প্রথা ব্রাহ্মণীদিগের পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। গর্ভবতী স্ত্রীদিগেরও সহমরণে অধিকার ছিল না, শূদ্রাণী হইলে প্রসবান্তে অনুগমন করিতে পারিতেন।

সতীদাহের দৃশ্য। স্বামীর মৃত্যুরপর যে স্ত্রী সহগমন করিবেন, তিনি একটী আম্রপল্লব ভাঙ্গিয়া ধরিয়া থাকিতেন। নববিধবাকে আম্রপল্লবধারিণী দেখিলেই সকলে বুঝিয়া লইতেন, ইনি সহগমনে দৃঢ়সংকল্প করিয়াছেন। (আজিও ঝি-বউ কঠিন আবদার ধরিলে গৃহিণীরা বলিয়া থাকেন, "মেয়ে যেন আমের ডাল ভেঙ্গেছেন।") আত্মীয়েরা বিধবাকে ক্ষান্ত করিবার জন্য যুক্তি প্রদর্শন করিয়া প্রবোধ দিতেন, কিন্তু যতই প্রতিরোধ হইত, ততই ব্যাকুলতার সহিত প্রতিজ্ঞা-কারিণী এমন ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন যে, শেষে বুক চাপড়াইয়া, মাথা কুটিয়া ইতস্তত: ছুটাছুটী করিতেন, আপনার কেশগুচ্ছ উৎপাটন করিতেন। তখন তাঁহার ব্যবহার এমন প্রবল উন্মত্তের ন্যায় দেখা যাইত যে, আজিও স্ত্রীলোকেরা ক্রোধে উন্মত্ত নারীকে "আগুণখাকীর" দৃষ্টান্ত দিয়া থাকে। দীপশিখায় অঙ্গুলি জ্বালাইয়া পরীক্ষাদানের কথা অনেক স্থানে শুনা গিয়াছে। মৃত ব্যক্তির একাধিক স্ত্রী থাকিলে বিষম গণ্ডগোল উপস্থিত হইত। সকলেই সহমরণে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেন, কিন্তু একাধিক বিধবার সহমরণ নিষিদ্ধ[১] বলিয়া গুরু পুরোহিত ও আত্মীয়স্বজন মধ্যস্থ হইয়া একজনকেই নির্ব্বাচন করিতেন। সতী রক্তবস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিতা হইতেন, তাঁহার ললাট পূর্ণ করিয়া সিন্দুর লেপিত হইত, তাঁহার চক্ষু হইতে একবিন্দু শোকাশ্রুপাত হইত না, স্বামীসহ স্বর্গধামে যাইতেছেন, এই বিশ্বাসে হৃদয় পূর্ণ থাকিত। যাত্রাকালের দৃশ্য অতি অপূর্ব্ব। অগ্রে পতির শবদেহ, তৎপশ্চাৎ প্রফুল্লমুখী সতী সেই আম্রপল্লব হস্তে লইয়া ধীর গম্ভীরভাবে চলিয়াছেন; তাঁহার পশ্চাতে আত্মীয় আত্মীয়া, প্রতিবাসী প্রতিবাসিনীরা তাঁহাকে অন্তিম বিদায় দিবার জন্য দলে দলে বিলাপ করিতে করিতে যাইতেছেন, মৃদঙ্গ, করতাল, ঢাকঢোলের শব্দের সহিত হরিবোলধ্বনি পল্লী হইতে পল্লী প্রতিধ্বনিত করিত। পথ লোকে লোকারণ্য হইত। পার্শ্বস্থ বাটীর মহিলারা গৃহকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সতীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পথে আসিয়া দাঁড়াইতেন; প্রণাম করিতেন, আগ্রহ সহকারে তাঁহার সিন্দুর ভিক্ষা করিয়া লইতেন। সতীর সিন্দুর অতি আদরের সহিত রক্ষিত হইত। অনেক প্রাচীন পরিবারে আজিও তাহা লক্ষ্মীর কৌটায়

ন্যায় সযত্নে রক্ষিত আছে। তাঁহার পদাঙ্ক হইতে ধূলি তুলিয়া লইতেন। সতীও সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

শ্মশানে চিতা এইরূপ সজ্জিত হইত:—দুই হাত প্রস্থ, তিন হাত দীর্ঘ ও তিন হাত উচ্চ কাষ্ঠরাশির মধ্যে ও উপরে পাটকাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া তন্মধ্যে ঘৃত ও ধূনা ঢালিয়া দেওয়া হইত। এইভাবে চিতা সজ্জিত হইলে, সতী জ্যেষ্ঠদিগকে প্রণাম এবং প্রণত কনিষ্ঠদিগকে আশীর্ব্বাদ ও চুম্বন করিয়া, আপনার অলঙ্কারগুলি খুলিয়া প্রিয়তমাদিগকে উপহার দিয়া, উপস্থিত নরনারী-দিগকে সাদরে বিদায়দান করিতেন। অনন্তর সজ্জিত চিতাকে তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়া তাহাতে আরোহণ করিতেন। স্বামীর দিকে পার্শ্ব ফিরিয়া তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া শয়ন করিলে, চারিদিকে বাদ্যভাণ্ডের সহিত হরিধ্বনি ও সতীর নামে জয়ধ্বনি বার বার প্রবল বেগে উত্থিত হইত। আত্মীয়েরা এই সময় গুরুভার কাষ্ঠ দ্বারা মৃত ও জীবিত দেহদ্বয়কে উচ্চ করিয়া আচ্ছাদন করিত, রাশি রাশি খড়ে চিতার উপর ও চারিদিক ঢাকিয়া বাঁশ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিলে পুত্র অগ্নি হস্তে লইয়া তিনবার চিতা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক পিতৃমুখে অগ্নিস্পর্শ করাইলে চিতা প্রজ্বলিত করা হইত। এই সময় বাদ্যসহ জয়ধ্বনি অধিকতর প্রবল বেগে উত্থিত হইত। স্ত্রী যতক্ষণ না চিতা স্পর্শ করিতেন, ততক্ষণ তাঁহার ফিরিবার উপায় থাকিত, চিতারোহণের পর ফিরিলে, নিজের গৃহ ত দূরের কথা, মুর্দ্দফরাসের আশ্রয় ভিন্ন অন্য কোথাও স্থান হইত না। তাঁহার আত্মীয়স্বজন লোকসমাজে মুখ দেখাইতে পারিত না। আমার মাতামহী, বাগবাজারের হরলাল মিত্রের বাটীর কোন মহিলার সহমরণের সময় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিতেন, উক্ত সতী চিতার ভিতর হইতে দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া ঘুরাইতে ঘুরাইতে আপনার পুত্রদ্বয়ের নামোচ্চারণ করিয়া "জয় হউক, জয় হউক" বলিয়া বার বার আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

কাশীপুর, চিৎপুর, কাশীমিত্রের ঘাট এবং কালীঘাটের কেওড়াতলার ঘাট-গুলিতে যে কত শত অবলার জীবন্ত দেহ ভস্মসাৎ হইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে সুপ্রীম কোর্টের জজদিগের আদেশে কলিকাতার সীমার মধ্যে সতীদাহ হয় নাই। উত্তরে চিৎপুর আর দক্ষিণে কেওড়াতলার ঘাট তখন সতীদিগের মরিবার ক্ষেত্র হইয়াছিল। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি যথেষ্ট অত্যাচার হইয়াছিল সত্য, কিন্তু হিন্দু কুলবালার প্রতি অত্যাচারের ত্রুটী হয় নাই। তাঁহারা সতীদাহের উপর

কখন হস্তক্ষেপ বা সতীর প্রতি অত্যাচার নিবারণ করিয়াছেন বলিয়া শুনা যায় না। সম্রাট আকবরসাহ সতীদাহ নিবারণ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার হিন্দু অমাত্যবর্গের প্রতিবন্ধকতাবশতঃ সে সংকল্প পরিত্যাগ করেন। নবাবী আমলে যতক্ষণ থানাদারের লিখিত অনুমতি না আসিত, ততক্ষণ কোন সতী চিতারোহণ করিতে পাইতেন না।

ধন্য ইংরাজরাজ, যাঁহাদের কৃপায় আমাদের জননী, ভগিনী ও কন্যাগণ বিনা ব্যাধিতে মৃত্যুকবলিতা হইতেছেন না। অবলাকুলের এই নির্ব্বাক আশীর্ব্বাদেই ইংরাজ রাজত্ব ভারতে অক্ষুণ্ণ থাকিবে, সন্দেহ নাই। সহৃদয় লর্ড ওয়েলেস্‌লি গঙ্গাসাগরে পুত্রবিসর্জ্জন প্রথা রহিত করিয়া বিধবা অবলাদিগের রক্ষার জন্য ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর আপীল আদালতের জজদিগকে সতীদাহ নিবারণ করিতে যুক্তি প্রদানের আদেশ করিয়াছিলেন। উক্ত রিপোর্ট প্রস্তুত হইতে প্রায় এক বৎসর লাগিয়াছিল। ইতিমধ্যে লাটসাহেব বিলাত চলিয়া গেলেন, ব্যাপারটীও চাপা পড়িয়া রহিল। ১৮১২ সালে পুনরায় উহার আন্দোলন উপস্থিত হইলে তর্ক উপস্থিত হয় যে, এই নিষ্ঠুর প্রথা প্রবল হস্তে নিবারণ করা উচিত, কি চড়ক ও গঙ্গাযাত্রা প্রভৃতি নিষ্ঠুর প্রথা যেমন সভ্যতাবৃদ্ধির সহিত উঠিয়া যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করিয়া রাখা হইয়াছে, ইহাকেও সেইভাবে রাখা হইবে। মন্ত্রী-দিগের মধ্যে অনেকেই প্রজাসাধারণের মধ্যে ঘোর অসন্তোষ উৎপাদিত হইবে ভাবিয়া বলিয়াছিলেন, ইহাতে হস্তক্ষেপ করিলে প্রজারা দলবদ্ধ হইয়া মফস্বলে ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিশনরিদিগকে হত্যা করিবে, গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয়-সকল জ্বালাইয়া দিয়া ধনাগার লুণ্ঠন করিবে। অগত্যা গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে হস্তক্ষেপ না করিয়া, অল্পে অল্পে কার্য্য করা শ্রেয় বিবেচনা করিলেন। পূর্ব্বে সতীদাহ সম্বন্ধে কতকগুলি নিয়ম প্রবর্ত্তন হয়, তাহাতে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশের বিশেষ সতর্কতায় ও সম্মুখে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামত যদি কোন স্ত্রীলোক সহমরণ যাইতে সংকল্প করিত সেই যাইতে পারিত অপরের সাধ্য হইত না। ১৫ বৎসরকাল এইরূপ কার্য্য করায় সতীদাহের সংখ্যা অনেক হ্রাস হইয়া আসিল, তখন প্রজা-সাধারণের মধ্যে কোন অসন্তোষের চিহ্ন লক্ষিত হইল না। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে বিলাতে ইণ্ডিয়া হাউসে এই প্রথা রহিত করিবার জন্য অনেক তর্কবিতর্ক হয়, তদনুসারে লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর তাঁহার ১৮ মাস শাসনকালে ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর, উক্ত সনের ৮ আইন অনুসারে সতীদাহ নিবারণ করেন। সমস্ত হিন্দু প্রজা একবাক্যে গবর্ণমেণ্টের এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে

আপত্তি করিয়াছিল। কেবল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার অল্প-সংখ্যক সহযোগীর সহানুভূতি ও রাজার শাস্ত্রোক্ত যুক্তিতর্কের উপর নির্ভর করিয়া গবর্ণমেণ্ট হিন্দুসাধারণের আপত্তি উপেক্ষা করিয়াছিলেন। যদিও সহমরণের ন্যায় ধর্ম্মমূলক উচ্চভাব পৃথিবীর কোথাও নাই, তত্রাচ ইহা যে নিতান্ত নৃশংস ও বর্ব্বরের ন্যায় কার্য্য, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সুতরাং ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ইহা রহিত করিয়া আমাদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে অন্তরের সহিত লোকে ধন্যবাদ প্রদান করে। লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক বাহাদুর এই মহৎ সৎকার্য্যের জন্য চিরদিন ভারত-ইতিহাসে কৃতজ্ঞতার পূজা প্রাপ্ত হইবেন।

পূর্ব্বে স্নান আহ্নিকের কথা বলিয়াছি। আহ্নিকের পর আবার গৃহদেবতাকে প্রণাম করিতে হইত। স্নানান্তে গৃহস্থ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা, দাস-দাসীকে পর্য্যন্ত তুলসীবৃক্ষে জল সেচন করিয়া প্রণাম করিতে হইত। যাহারা শাস্ত্রীয় মন্ত্র না জানিত, তাহারা "তুলসী তুলসী নারায়ণ, তুমি তুলসী বৃন্দাবন, তোমার মাথায় ঢালি জল, অন্তকালে দিও স্থল," এই মন্ত্র পাঠ করিত। এখনও অনেক পরিবারে এ নিয়ম প্রচলিত আছে, কিন্তু যেভাবে হ্রাস পাইতেছে, তাহাতে বুঝা যায়, আর কিছুকাল পরে উহা থাকিবে না। চিকিৎসকেরা বলেন, তুলসী বায়ুপরিষ্কারক। প্রাচীন হিন্দুধর্ম্ম স্বাস্থ্যরক্ষার সকল উপায়-গুলিকে ধর্ম্মে জড়িত করিয়া রাখিয়াছিলেন, কারণ তাঁহারা দেহকে ভগবানের মন্দির ও লীলাক্ষেত্র বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তুলসীর বায়ুশোধক গুণ থাকায় উহা গুল্ম হইলেও বৃক্ষ নামে সম্মানিত ও নারায়ণভাবে পূজিত হইয়াছে। গৃহের মধ্যস্থলে উচ্চমঞ্চ করিয়া সাদরে তুলসীবৃক্ষ অবশ্য রক্ষণীয় ছিল। প্রাতঃ-কালে দুর্গানাম লিখিতে হইত। বৈষ্ণবেরা হরিনাম বা রাধাকৃষ্ণনাম লিখিতেন। কেহ কেহ এক সহস্র নাম লিখিয়া উঠিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, আহারা অতি সাত্ত্বিকভাবে সম্পন্ন হইত। কারণ তাঁহারা ইহাকে "প্রাণযজ্ঞ" বলিতেন। সেইজন্য ভগবানকে নিবেদন না করিয়া কোন বস্তু ভোজন করিতেন না। প্রসাদান্ন পুনর্নিবেদিত হইত না বটে, কিন্তু প্রণাম করিয়া ভোজন করা হইত। কার্য্যস্থানে গমনের সময় গৃহদেবতাকে প্রণাম করিয়া দুর্গানাম উচ্চারণ করিয়া বাহির হইতেন। গৃহের বাহিরে যাইতে হইলেই দুর্গানাম উচ্চারণ করিতেন। কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ভগবানকে প্রণাম করিতেন, সামান্য দুই ছত্র লিখিতে হইলেও উপরে ইষ্টদেবের

নাম লিখিয়া প্রণামান্তে প্রয়োজনীয় লিপি আরম্ভ করিতেন। কার্য্যান্তে গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে গৃহদেবতাকে প্রণাম করিতেন। সন্ধ্যাকালে যাঁহারা গৃহে থাকেন, তাঁহারা তাঁহার আরতি দর্শন করিতেন, গৃহের বাহিরে থাকিলে নিকটস্থ দেবালয়ে শঙ্খ-ঘণ্টাধ্বনি শ্রবণমাত্র তথায় উপস্থিত হইতেন। আরতি-দর্শন একটী অবশ্যপালনীয় কর্ত্তব্য। শয়নকালে ইষ্টদেব, গুরু ও অপরাপর দেবদেবীকে প্রণাম করিয়া "পদ্মনাভ" উচ্চারণান্তর চক্ষু মুদ্রিত করিতেন।

প্রত্যেক হিন্দুগৃহে রন্ধনশালার ন্যায় পারিবারিক দেবালয় স্থাপিত ছিল। যাঁহারা অদৃষ্টে বিগ্রহ বা শালগ্রামশিলা প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই, তিনি গৃহের একটী পরিচ্ছন্ন ঘরে হয় একটী শিবলিঙ্গ, না হয় ক্ষুদ্র পিত্তলের রাধাকৃষ্ণ মূর্ত্তি একখানি ক্ষুদ্র সিংহাসনে রাখিয়া ব্রাহ্মণ নিয়োগের সংস্থান না থাকিলে বাটীর কর্ত্তা বা গৃহিণী নিজেই পূজা করিতেন। ইতর লোকেরা গৃহমধ্যস্থ তুলসীকেই গৃহদেবতা-রূপে ভক্তি করিত। ধনীদিগের স্বতন্ত্র ঠাকুরবাটী থাকিলেও বাসগৃহে একটী গৃহদেবতা অবশ্য পূজনীয়। প্রত্যেক গৃহে গোশালা থাকিত, তাহাও দেবালয়ের ন্যায় পবিত্র স্থান বলিয়া পরিচিত হইত। এমন কি, যে জাতির গৃহে ব্রাহ্মণ জল-স্পর্শ করিলে অপবিত্র হয়, তাহার গোশালায় বসিয়া অন্নপাক করিয়া খাইলেও ধর্ম্মহানি হইত না। গাভী ভগবতী, ষণ্ড মহাদেব বলিয়া লোকের বিশ্বাস ছিল, এখনকার মত বিশ্বাস নহে, আন্তরিক বিশ্বাস। একজন ইংরাজ ভ্রমণকারী লিখিয়াছিলেন, "আমি জনৈক ম্যাজিষ্ট্রেটের গৃহে অতিথি হইয়াছিলাম। একদিন গরু আসিয়া তাঁহার ফুলবাগানটীর সর্ব্বনাশ করিতেছে দেখিয়া, তিনি এত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, বন্দুক লইয়া গরুটাকে মারিবার উদ্যোগ করিয়াছেন, এমন সময় তাঁহার হিন্দু চাপরাসী বন্দুকের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল, আমাকে না মারিলে তুমি গরুকে মারিতে পারিবে না। অগত্যা সাহেব নিরস্ত হইলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, এ গরুটা কি ইহারই, সাহেব বলিলেন, তাহা নহে, এই মূর্খেরা সমস্ত গরুগুলাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করে।" সেকালে গোসেবা অতি পুণ্যকার্য্য বলিয়া বিশ্বাস ছিল, এবং গরুর পূজা হইত; অবশ্য এ প্রথা একেবারে উঠিয়া যায় নাই।

সেবা। সেবা গৃহস্থের প্রধান ধর্ম্ম ছিল। দেবসেবা, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, সাধু সন্ন্যাসী, অতিথি, আত্মীয়-কুটুম্ব, দরিদ্র ও রোগীদিগের সেবা করা যেন স্বাভাবিক প্রকৃতির ন্যায় ছিল। গো-সেবা, পশু-পক্ষী, এমন কি বৃক্ষলতার সেবাও ধর্ম্মকার্য্য ও অবশ্যপালনীয় ব্রতরূপে নিষ্ঠার সহিত প্রতিপালিত হইত।

অতিথিকে নারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস ছিল এবং তদ্রূপ ভক্তির সহিত সেবা করা হইত। গৃহস্থদিগের আহারের পূর্ব্বে কোন অতিথি আসিলে যতক্ষণ না তাহার ভোজন হইত, ততক্ষণ গৃহস্থ ভোজন করিতে পাইতেন না। অতিথি সেবা না লইয়া বিমুখ হইলে সে দিন গৃহস্থ সপরিবারে উপবাসী থাকিতেন। জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের শিক্ষক রঘুদেব বিদ্যাবাচস্পতির গৃহ হইতে রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ সেবা না লইয়া প্রস্থান করায় রঘুদেব সে দিন সপরিবারে ও সশিষ্য সম্প্রদায়ে উপবাসী ছিলেন।

তাঁহারা উপাধি বা রাজসম্মানের জন্য লালায়িত ছিলেন না। কোম্পানির প্রাচীন ও প্রধান বেনিয়া[২] লক্ষ্মীকান্ত ধরকে (নকু ধর) লর্ড ক্লাইব বাদসাহের নিকট হইতে মহারাজা উপাধি আনিয়া প্রদান করিতে চাহিলে, তিনি নিজে না লইয়া আপনার একমাত্র দৌহিত্র সুখময় রায়কে দিবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ কৃষ্ণ পান্তিকেও রাজা উপাধি প্রদান করিতে চাহিলে তিনি জিব কাটিয়া বলিয়াছিলেন, "কৃষ্ণনগরের রাজা আমার রাজা, আমি তাঁহার প্রজা হইয়া রাজা উপাধি কিরূপে লইব ?" ইহাতে কোম্পানি তাঁহাকে রাজোপাধির উপযুক্ত নহবতাদি খেলাতের সহিত পাল চৌধুরী উপাধি দিয়াছিলেন। এমন কি, এখন প্রত্যেকের নামের সহিত সংযুক্ত "বাবু" পদ পূর্ব্বে কাহারও ব্যবহার করিবার অধিকার ছিল না, ইহা নবাব প্রদত্ত একটী উপাধি ছিল। সম্মানিত ধনাঢ্য ব্যক্তি ভিন্ন নবাবেরা অপর কাহাকেও উহা দিতেন না। চুঁচুড়ার সুপ্রসিদ্ধ বহু সম্মানাস্পদ প্রাচীন বলভদ্র সোমের অধঃস্তন পুরুষ শ্যামরাম সোমকে নবাব সিরাজউদ্দৌলা হুগলিতে আসিয়া অতি সমাদরের সহিত বিবিধ খেলাতসহ "বাবু" উপাধি দান করিয়াছিলেন।

দান, সেবা ও ক্রিয়াকলাপে সেকালের বাঙ্গালীরা যশস্বী হইতে চেষ্টা করিতেন। ধনবানেরা ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, দেবালয়, জলাশয়, অতিথিশালা ও গোচারণ-ক্ষেত্রাদি দান করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, কবি, গায়ক, বাদক, শিল্পী প্রভৃতিকে প্রচুর পুরস্কার ও বৃত্তি দিয়া উৎসাহিত করিতেন। চতুষ্পাঠী, পাঠশালা, মাদ্রাসা, চিকিৎসালয়, সঙ্গীতের আখড়া, সাধারণের আমোদ প্রমোদের জন্য উদ্যানসহ বারদ্বারি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেন। পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রস্তাবে আমরা প্রাচীন অধিবাসীদিগের যে সকল বংশ ও ক্রিয়া বর্ণন করিয়াছি, তাহাতে উপরোক্ত সৎকার্য্যের যথেষ্ট দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। দরিদ্র প্রতিবাসী বা আত্মীয় অনুগতদিগকে ঘৃণা করা ত দূরের

কথা, প্রাতঃকালে উহাদের সংবাদ লওয়া তাঁহাদের একটী দৈনন্দিন কার্য্য ছিল। যিনি প্রধান বলিয়া পরিচিত হইতেন, তিনি সকলের রোগ শোক, বিপদে সম্পদে বুক পাতিয়া দিয়া দাঁড়াইতেন। আহা বড়লোকের এই সহানুভূতিতে দরিদ্রের যে কি পর্য্যন্ত উপকার হইত ও সাহস বাড়িত, তাহা গরিবলোকেই বুঝিতে পারে। "কর্ত্তা আসিয়াছেন আর ভাবনা কি" বলিয়া সে নিশ্চিন্ত হইত। কর্ত্তা যথাকর্ত্তব্য সমস্ত কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়া গৃহে ফিরিতেন। দরিদ্রের সহিত বন্ধুতা রাখিতে বা মিশিতে তাঁহারা তিলার্দ্ধ কুণ্ঠিত হইতেন না। মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের সম্বন্ধে একটী গল্প আছে। তিনি যে কেবল একজন প্রধান ধনী ছিলেন তাহা নহে, সে সময় কি ইংরাজ, কি দেশীয় সর্ব্বত্রই তাঁহার সম্মান সর্ব্বপ্রধান ছিল। চিৎপুর রোড হইতে নিমতলা ষ্ট্রীটে প্রবেশ করিয়া উত্তরদিকে বসু মহাশয়দিগের যে পুরাতন বাটী দেখা যায়, তাহার পূর্ব্বাংশের বাটীতে অভয়চরণ মিত্র নামে একজন ভদ্রলোক থাকিতেন। তিনি মহাত্মা দ্বারিকানাথ ঠাকুরের বাল্যকালের সহপাঠী ছিলেন। একদিন তিনি বাটীর দ্বারে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছেন, সেই সময় দ্বারিকানাথ বাবু সেই পথ দিয়া জুড়ীগাড়ী করিয়া যাইতেছিলেন। গাড়ী হইতে বাল্যবন্ধুকে দেখিবামাত্র নামিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইলে মিত্রজ মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসন আনিতে যাইতেছিলেন। দ্বারিকানাথ বাবু তাঁহার হাত ধরিয়া বসাইলেন, আপনিও তাঁহার পার্শ্বে রোয়াকে বসিলেন। বন্ধু ব্রাহ্মণের হুঁকা আনিতে চাহিলে তাহাতেও বাধা দিয়াবলিলেন, কেন ভাই, আমি চলিয়া গেলেই ত তুমি হুঁকাটী ভাঙ্গিয়া ফেলিবে, আমার কি সে আক্কেল নাই, একটু কলাপাত আন। পরে কলাপাতার ঠোঙ্গায় তামাক খাইতে খাইতে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা ও গল্পগুজব হইয়াছিল। পথের লোকে দেখিয়া যাইতেছে, কিন্তু তখন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না, সুতরাং কেহই আশ্চর্য্য হয় নাই। আমরা এখন ঐ সম্মিলনকে পৌরাণিক আখ্যায়িকার ন্যায় মনে করিতেছি।

কি ধনী, কি মধ্যবিত্ত কেহই একাকী আহার করিতে ভালবাসিতেন না। স্বজাতীয় অনুগত বা আত্মীয়স্বজন অনেককে লইয়া আহার করিতেন। অনেক ধনী লোকের গৃহে নিত্য রীতিমত ভোজ হইত। হাটখোলার মাণিক বসু যখন ঢাকার দেওয়ান ছিলেন, তখন তাঁহার দ্বারে একটী বৃহৎ ঘণ্টা ঝুলান থাকিত, আহারে বসিবার পূর্ব্বে কিছুক্ষণ উহা বাজান হইত, অভুক্ত

কায়স্থ-সন্তান ঘণ্টাধ্বনি শুনিয়া যতই আসুক, তিনি তাহাদিগকে লইয়া একত্র আহার করিতেন। হরিঘোষের গোয়ালের গল্প পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকতর আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল ভোজে কর্ত্তার ন্যায় সমান ভোজ্য সকলকেই দেওয়া হইত। যদি কোন গৃহে কিছুমাত্র তারতম্য করা হইত, তাহা হইলে কর্ত্তার নিন্দা রাখিবার আর স্থান থাকিত না।

কেবল যে পুরুষেরাই দরিদ্রের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি দেখাইতেন, তাহা নহে, গৃহিণীরাও মেয়েমহলে ঠিক এই রকম ছিলেন। বাল্যরোগের চিকিৎসায় অনেক গৃহিণী বিখ্যাত চিকিৎসক ছিলেন। দরজীপাড়ায় যদুর মা বলিয়া এক কায়স্থ বিধবা ছিলেন, তিনি কেবল বাল্যচিকিৎসায় পটু ছিলেন না, রীতিমত কবিরাজী করিতেন। তিনি কলিকাতায় অতি উচ্চবরের বধূ ছিলেন। গত পৌষ মাসের নব্যভারতের ৪৬৭ পৃষ্ঠায় আমরা বলিয়াছি, বর্গীর হাঙ্গামায় আন্দুলের দত্ত চৌধুরীরা কলিকাতায় পলাইয়া আসেন, তন্মধ্যে বিনোদবিহারী দত্ত কোম্পানির চাকুরী পাইয়া এখানে রহিয়া গেলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ভবানীচরণ দত্ত মহাশয় সে সময়ের পাবলিক ওয়ার্কের প্রধান দেশীয় কর্ম্মচারী অর্থাৎ দেওয়ান ছিলেন। বর্ত্তমান ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ হইতে গবর্ণমেণ্ট হাউস পর্য্যন্ত অনেক গৃহ তাঁহার তত্ত্বাবধানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাঁহার আটটী পুত্র। যদুর মা চতুর্থ পুত্র কাশীনাথ দত্ত মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী তাহার স্বামী কাশী-ধামে এক অবধূতের নিকট বহুপ্রকার উৎকট রোগের ঔষধ ও চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া আসিয়াছিলেন, এবং এখানে চিকিৎসা ব্যবসায় করিতেন। ঔষধগুলির গুহ্য প্রকরণ কেবল আপনার পত্নীকে শিখাইয়াছিলেন। যদুর মা কতকগুলি নাবালক পুত্রকন্যা লইয়া বিধবা হইলে চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বনে সংসার প্রতিপালন করিতেন। তদ্ভিন্ন দুর্গোৎসব হইতে রথ পর্য্যন্ত বার মাসে তের পার্ব্বণ, গৃহে বিগ্রহসেবা, অতিথিসেবা, এবং তীর্থদর্শন প্রভৃতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া বেশ সচ্ছলভাবে সংসার চালাইতেন। আত্মীয়, প্রতিবাসী ও দরিদ্র-দিগের নিকট অর্থ লইতেন না। কলিকাতায় অনেক ধনবান লোকের বাটীর নিয়মিত চিকিৎসায় নিযুক্ত ছিলেন। সে সময় কলিকাতায় ২।৪ জন মাত্র ইংরাজ ডাক্তার ছিলেন। মেডিকেল কলেজ তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায় স্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং বাঙ্গালী ডাক্তার একেবারে ছিল না, জনকয়েকমাত্র কবিরাজ ছিলেন। ইংরাজ ডাক্তারেরা তাঁহার অদ্ভুত চিকিৎসানৈপুণ্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতেন। কবিরাজেরা রোগনির্ণয়ে অনেক সময় তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন।

ক্ষয়কাশ রোগে তাঁহার সোণাভস্ম অব্যর্থ মহৌষধ ছিল। নাড়ীপরীক্ষায় এমন চমৎকার ক্ষমতা ছিল যে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগের গঙ্গাযাত্রার সময় তাঁহাকে দিয়া নাড়ী-পরীক্ষা করা হইত। কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁহার "প্রভাকর" পত্রে এক সময় যদুর মার চিকিৎসার বিস্তর প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন—

"ডাক্তার কবিরাজ রণে যারে হারে।
যদুর জননী গিয়া জয় করে তারে॥"

অনেক গৃহিণী ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ পটু ছিলেন। কেবল আত্মীয়স্থানে নহে, জাতিনির্ব্বিশেষে প্রতিবাসীদিগের পর্ণকুটীরে প্রবেশ করিয়া অকাতরে উৎকট অবস্থায় ধাত্রীকার্য্য সমাধা করিয়া আসিতেন। তখন ফোড়া, অস্ত্র প্রভৃতি কাটাকুটী কার্য্য নাপিত ও নাপিতানীরা সম্পন্ন করিত, উক্ত বিদ্যাতেও এক একজন নাপিত এমন দক্ষ ছিল যে, তাহারা কেবল উক্ত কার্য্যেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীটে রাজুর মা নাপিতানী অস্ত্রবিদ্যায় এমন দক্ষ ছিলেন যে, পুত্র রাজনারায়ণকে নব প্রতিষ্ঠিত মেডিকেল কলেজে পড়াইয়াছিলেন।

১. নেপালরাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধানমন্ত্রী সার জং বাহাদুরের মৃত্যুর পর, তাঁহার একাধিক পত্নী সহমৃতা হইয়াছিলেন।

২. সুবর্ণবণিকেরা কোম্পানি ও ইংরাজ সওদাগরদিগের প্রয়োজন মত অর্থ কর্জ্জ দিতেন, তাঁহাদের নিকট তাঁহারা বেনিয়া বলিয়া কথিত হইতেন। "বেনিয়ান" শব্দ বেনিয়া শব্দেরই অপভ্রংশ।

৪

সকল দেশে সকল কালের অবলা জাতির অলঙ্কারপ্রিয়তার কথা শুনিতে পাই, কিন্তু প্রাচীন কালের বঙ্গমহিলাদিগের যে সমস্ত গল্প শুনা গিয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহারা ভোগবিলাস বা বস্ত্রালঙ্কারের জন্য লালায়িতা ছিলেন না। "মোটা ভাত মোটা কাপড়" চিরদিন পাওয়াকে শ্লাঘ্য মনে করিতেন। গত চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৬৫২ পৃষ্ঠায় যে রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত নামক দরিদ্র মহা-নৈয়ায়িক পণ্ডিতের উল্লেখ করা হইয়াছে, একদা তাঁহার ব্রাহ্মণী আর কৃষ্ণচন্দ্রের রাজমহিষী একঘাটে স্নান করিতেছিলেন। ব্রাহ্মণীর উভয় হস্তে দুইগাছি মাত্র লাল সূতা বাঁধা দেখিয়া রাজ্ঞী বলিয়াছিলেন, কোন দিন সূতা দুগাছা ছিঁড়িয়া যাইবে, দুগাছা কড় পরিতে পার না? ব্রাহ্মণী তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, আশীর্ব্বাদ কর যেন এই সূতা লইয়া চক্ষু মুদিত করিতে পারি, যে দিন এই সূতা ছিঁড়িবে, সেই দিন কৃষ্ণনগর অন্ধকার হইবে। রাণীর মুখে এই গল্প শুনিয়া রাজা পণ্ডিতের কুটীরে গমন করিয়াছিলেন। গৃহস্থ অপরাপর মহিলার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অলঙ্কার ধারণ করিতে মহিলারা সঙ্কুচিতা হইতেন। স্বর্ণালঙ্কার অপেক্ষা পরসেবাকে হস্তের, লোককে ভালবাসাকে বক্ষের এবং ঠাকুরদের কথা শুনাকে কর্ণের অলঙ্কার বলিয়া ভালবাসিতেন।

লজ্জা তাঁহাদের এমন অভ্যস্ত ছিল যে, অশীতিবর্ষীয়া বৃদ্ধা দশ বৎসরের বালককে দেখিলেও অবগুণ্ঠন না দিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্বামী, দেবর ও শাশুড়ী ননন্দার কথা দূরে থাকুক, নিজ গর্ভজাত বয়স্ক পুত্রের সম্মুখেও মাথার কাপড় খুলিতেন না। উচ্চ সম্পর্কীয়া মহিলাদিগের সহিতও কথা কহিতেন না। উচ্চ সম্পর্কীয়া মহিলা গৃহে থাকিলে দিবসে স্বামীর সম্মুখীন হইতেন না। শাশুড়ী ননন্দা থাকিতে বধূ যতই বয়স্থা হউন, কিছুতেই গৃহিণীপনা করিতেন না, সাধারণ পরিচারিকার ন্যায় উঁহাদের আদেশমত সমস্ত গৃহকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। ইহাতেও নিস্তার ছিল না, গালাগালি, কটুকাটব্য ও বাক্য-যন্ত্রণারূপ পুরস্কার দিবারাত্রি অজস্রধারে বধূর উপর বর্ষিত হইত। পরিত্যক্ত অপকৃষ্ট খাদ্য, যাহা দাস দাসীরাও গ্রহণ করিতে চাহিত না, বধূকে আদরের

সহিত তাহা লইতে হইত। অনেক উগ্রচণ্ডী শাশুড়ীর হস্তে বধূরা এত যন্ত্রণা পাইত যে, আত্মহত্যা ভিন্ন তাহাদের গত্যন্তর থাকিত না। অনেকস্থলে শাশুড়ী ননদের প্রহারে বধূ প্রাণত্যাগ করিত, পরে দড়িতে ঝুলাইয়া বা পুকুরে ফেলিয়া দিয়া আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া ঘোষণা করা হইত। কোন পুরুষের সাধ্য ছিল না যে, স্ত্রীর পক্ষাবলম্বন করিয়া মাতা বা ভগিনীকে কোন কথা বলে। স্ত্রী মরিলেও পুরুষেরা শোকার্ত্ত হইতেন বলিয়া বোধ হয় না, শাশুড়ী ননদের ত কথাই নাই। "অভাগার ঘোড়া মরে ভাগ্যবন্তের মাগ[১] মরে" ইহা যে দেশের এবং যে কালের প্রবাদবাক্য, সে স্থলে আবার স্ত্রী মরিলে দুঃখ কিসের! অশৌচের ভিতরেই সম্বন্ধ স্থির হইত, অশৌচান্তে আবার নূতন হতভাগিনীকে শঙ্খধ্বনি করিয়া গৃহে আনা হইত। যে সকল শাশুড়ী বধূদিগকে যন্ত্রণা দেয়, তাহাদিগকে "বউকাঁটকী" বলে, এই বউকাঁটকীদিগের সংখ্যা পূর্ব্বে বিস্তর ছিল। ইহাদের কার্য্য সমর্থক প্রবাদ বাক্য "হলুদ জব্দ শিলে, বউ জব্দ কিলে, পাড়াপড়সী জব্দ হয় চোখে আঙ্গুল দিলে," এই কথাটী কথায় কথায় উচ্চারণ করিতেন। যে সকল শাশুড়ী লোকনিন্দার ভয় রাখিতেন, উঁহারা "ঝিকে মেরে বউকে শিখাইতেন।" ননন্দাদিগের অত্যাচার অধিকতর কুটীলতা মিশ্রিত, ননন্দা শব্দের অর্থই হইতেছে, যিনি কখন আনন্দ দেন না, সুতরাং তাঁহার নিকট কেহ কোনকালে আনন্দের প্রত্যাশা করেও নাই। বালিকারা ব্রত করিবার সময় প্রার্থনা করে "দশরথের মত শ্বশুর হউক, কৌশল্যার মত শাশুড়ী হউক, রামের মত স্বামী হউক আর লক্ষ্মণের মত দেবর হউক" কিন্তু শান্তার মত ননদ হউক, এ কথা ত কোনদিন কোন বালিকাকে বলিতে শুনি নাই। তবে কি রামরাজ্যেও ননদের যন্ত্রণায় বধূগুলি অস্থির হইতেন! শান্তাও কি বাপের বাড়ী আসিয়া সীতার গায় গরম ফেন ফেলিয়া দিতেন? অসম্ভব নহে। এইরূপ যন্ত্রণা যে সহমরণে সহায়তা করিত, তাহার সন্দেহ নাই, যে সংসারে সধবাবস্থায় এত সুখ, সে স্থলে বিধবা হইলে কি আর কেহ তিষ্ঠিতে পারে? সুতরাং অগ্নিকুণ্ডই চিরশান্তির স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে অসম্ভব কি?

যে সকল বধূ অবাধ্য এবং শাশুড়ী ননদের কার্য্যে প্রতিবাদ করিত, তাহারাই অধিক যন্ত্রণা পাইত। শান্তস্বভাবা, বাধ্য, অনুগত, কষ্টসহিষ্ণু, বুদ্ধিমতী বালিকারা প্রতিবাসীদিগের সহানুভূতি, উপদেশ এবং নিজ পিতৃগৃহের সুশিক্ষা ও সৎদৃষ্টান্ত পাইত, তাহারা শাশুড়ী ননদকে সেবায় ও ব্যবহারে এমন বশীভূত করিত যে, তাঁহারাও আপন কন্যা ও ভগিনীর ন্যায় বধূকে দেখিতেন।

অত্যাচারী শাশুড়ী ননদের কথা অনেক বলা হইল বলিয়া স্নেহময়ী শাশুড়ী ননদের যে এককালে অভাব ছিল, তাহা নহে। যাহা হউক, বধূগুলি প্রথমকাল কষ্টে কাটাইলেও বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তাঁহাদের শ্রমশীলতা পরিবারের মঙ্গলকামনা ও সেবার ভাব বিশেষ বর্দ্ধিত হইত। ঠাকুর দেবতা ও গুরুজনকে ভক্তি এবং সাধারণের প্রতি সন্তানবৎ স্নেহ স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইত। এখনকার মত পূর্ব্বে পাচক পাচিকা রাখার নিয়ম ছিল না। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, বড় বড় ধনীদিগের গৃহে ভিন্নজাতীয় কর্ম্মচারী ও দাস দাসীদিগের জন্য বহির্ব্বাটীতে ব্রাহ্মণ পাচক থাকিত, কিন্তু অন্তঃপুরের রন্ধনকার্য্য মহিলারা স্বয়ং আদর ও আহ্লাদের সহিত সম্পন্ন করিতেন। সমস্ত দিন রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতে হইলেও তাঁহারা কষ্টবোধ করিতেন না। তখনকার নারী জাতির প্রধান শিক্ষা ছিল রন্ধন, রন্ধনে যে জন যত পটু হইতেন, সর্ব্বত্র তাঁহার তদ্রূপ সম্মান হইত। গ্রামের মধ্যে যে মহিলা রন্ধনে বিশেষ দক্ষা, তাঁহার জ্ঞাতীয় কোন গৃহে ক্রিয়াকলাপে তাঁহার আদর দেখে কে, ক্রিয়ার পূর্ব্ব হইতে ক্রিয়াকর্ত্তারা তাঁহারই সহিত পরামর্শ করিতেন। তাঁহার আদেশমত দ্রব্যসম্ভার সংগ্রহ করা হইত, এবং রন্ধনশালার ও ভাণ্ডারের ভার সম্পূর্ণরূপে তাঁহার হস্তে সমর্পিত হইত। অন্যান্য মহিলারা তাঁহার সহকারিণী হইবার জন্য পূর্ব্ব হইতে তাঁহার তোষামোদ করিত। সহকারিণী নির্ব্বাচনের জন্য মধ্যে মধ্যে মহিলাসমাজের অধিবেশন হইত। "অমুকের বিবাহে যে ডাল ধরাইয়া ফেলিয়াছিল, যে পায়স ঝাঁকিয়া দিয়াছিল, যে অপরিষ্কার, যে পরিশ্রমকাতর, যে অসাবধান হাত পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল" প্রভৃতি অকর্ম্মণ্যাদিগের নাম খারিজ হইয়া যাইত। যাঁহারা নির্ব্বাচিতা হইতেন, তাঁহাদের উৎসাহ দেখে কে, "আমার হাতের ময়লা দশজনে খাইবে" ইহাকে পরম সৌভাগ্য মনে করিয়া দেবতার পূজা মানিতেন। ক্রিয়া-দিবসে সকলে প্রাতঃস্নান করিয়া শুদ্ধবস্ত্রে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের দলকর্ত্রী, অগ্নির পূজা করিতেন, সকলে অগ্নিকে প্রণাম করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। দলকর্ত্রীর আদেশ সর্ব্বদা শিরোধার্য্য করিয়া ভয়ে ও মহা উৎসাহে সমস্ত দিন এবং রাত্রি পর্য্যন্ত যতক্ষণ সমস্ত লোকের ভোজন সমাধা না হয়, ততক্ষণ রন্ধন ও পরিবেশন করিয়া শেষে আপনারা ভোজন করিতেন। ভোজনীদিগের নিকট রন্ধনের সুখ্যাতি শুনিলে আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতেন। ক্রিয়াশেষে সমস্ত মহিলা একত্র হইয়া শুভচণ্ডীর পূজা করিতেন।

পূর্ব্বকালের সাদর ভোজনের বন্দোবস্তের কথা, অদ্বৈত ঠাকুরের গৃহে

চৈতন্যদেব ও ঠাকুর নিত্যানন্দকে যে ভোজ্য প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা নিম্নে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল :—

বত্তিশ আঁঠিয়া কলার আঙ্গটিয়া পাতে।
দুই ঠাঁই ভোগ বাড়াইল ভালমতে॥
মধ্যে পীত ঘৃতসিক্ত শাল্যন্ন স্তূপ।
চারিদিকে ব্যঞ্জন ডোঙ্গা আর মুদ্গ সূপ॥
সাদ্রক বাস্তুক শাক বিবিধ প্রকার।
পটোল কুষ্মাণ্ড বড়ি মানকচু আর॥
চই মরীচ সুক্তা দিঞা সব ফলমূলে।
অমৃত নিন্দক পঞ্চবিধ তিক্ত ঝালে॥
কোমল নিম্বপত্র সহ ভাজা বার্ত্তাকী।
পটোল ফুলবড়ি ভাজা কুষ্মাণ্ড মানচাকী॥
নারিকেল শস্য ছেনা শর্করা মধুর।
মোচাঘণ্ট দুগ্ধ কুষ্মাণ্ড সকল প্রচুর॥
মধুরাম্ল বড়াম্লাদি অম্ল পাঁচ ছয়।
সকল ব্যঞ্জন কৈল লোকে যত হয়॥
মুদ্গবড়া মাষবড়া কলাবড়া মিষ্ট।
ক্ষীরপুলী নারিকেল যত পিষ্ট ইষ্ট॥
বত্তিশ আঁঠিয়া কলার ডোঙ্গা বড় বড়।
চলে হালে নাহি ডোঙ্গা অতি বড় দড়॥
পঞ্চাশ পঞ্চাশ ডোঙ্গা ব্যঞ্জন ভরিঞা।
তিন ভোগের আশে পাশে রাখিলা ধরিয়া॥
সঘৃত পায়স নব মৃৎকুণ্ডিকা ভরি।
তিন২ পাত্র ঘনাবর্ত্ত দুগ্ধ দিলা ধরি॥
দুগ্ধ চিতাউ দুগ্ধ লকলকী কুণ্ডী ভরি।
চাঁপাকলা দধি সন্দেশ কহিতে না পারি॥

এই প্রকার বহুবিধ খাদ্যদ্রব্য প্রাচীনকালের মহিলারা প্রস্তুত করিয়া অতিথি অভ্যাগতদিগের সেবা করিতেন। ভোজনী তন্মধ্যে যে ব্যঞ্জনের প্রশংসা করিতেন, সেইটী বার বার প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়া আহার করান হইত। এই আদরের প্রসঙ্গে একটী কৌতুকজনক গল্প আছে। এক শিশু গুরুগৃহে

অতিথি হইয়াছিলেন। গুরুপত্নী স্নেহের সহিত নানাপ্রকার ব্যঞ্জনসহ প্রচুর অম্ল পরিবেশন করিয়াছেন, গুরুর প্রসাদ ফেলিতে নাই, সুতরাং শিষ্য প্রাণপণে সকল বস্তুর শেষ কণিকা পর্য্যন্ত কোনরূপে আহার করিয়া শেষে আমড়ার অম্বলের একটী আঁটি ছিল, সেটিকেও অল্প অল্প করিয়া দাঁত দিয়া কাটিয়া খাইতেছিলেন। গুরুপত্নী ভাবিলেন, আমড়ার অম্ল এত ভাল হইয়াছে যে, শিষ্য আঁটিটি পর্য্যন্ত খাইতেছে, সুতরাং আর ৫।৬টী আঁটিসহ একবাটী অম্ল তাহার পাতে ঢালিয়া দিলেন।

পরিশ্রমে পিতামহীরা কাতর হইতেন না। তাঁহাদিগকে ধান ভানিয়া চাউল প্রস্তুত করিতে হইত, গোশালার সমস্ত কাজ করিয়া ঘুটিয়া দিতে হইত, রন্ধন, বাসনমাজা, গৃহলেপন, সন্তানসেবা প্রভৃতিতে ভোর হইতে রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত অকাতরে পরিশ্রম করিতেন। তাহার মধ্যে একটু হাত অবকাশ হইলে শিল্পকার্য্য করার নিয়ম ছিল। তাঁহারা বহুবিধ শিল্পকার্য্য জানিতেন, তন্মধ্যে চরকায় সূতা কাটাই প্রধান। সকলেরই নিজের এক একটী চরকা থাকিত, গৃহস্থদিগের অষ্টপ্রহরী বস্ত্রের এবং বিছানার সমস্ত বস্ত্রের সূতা মহিলাদিগকে প্রস্তুত করিতে হইত। চরকার সহিত এক একটী ধনুক থাকিত, তদ্দ্বারা তাঁহারা তুলা ধুনিতেন, স্বহস্তে লেপ তোষকাদি বালিস প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। যাঁহাদিগের অবকাশকাল অধিক থাকিত, তাঁহারা সূতা কাটিয়া হাটে বেচিতে পাঠাইতেন। এক একজন এমন সূক্ষ্ম সূতা কাটিতে পারিতেন যে, তাঁহাদের সূতা দেশ বিদেশের ব্যাপারীরা আসিয়া বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। কেবল ভারতের নহে, পৃথিবীর অপরাপর দেশের রাজা রাণীরা অতি আদরের সহিত তাঁহাদের সূতার বস্ত্র পরিধান করিতেন।

প্রাচীন বাবিলন ও রোম প্রভৃতি যখন আপনাপন মুকুটের জ্যোতিতে পশ্চিম এসিয়া ও সমগ্র ইউরোপ খণ্ডকে আলোকিত করিত, তখন বাঙ্গালার সূক্ষ্ম সূত্র-নির্ম্মিত বিবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট বস্ত্রই তাঁহাদের আদরের পরিধেয় ছিল। সেই জন্য প্রবাদ আছে—

চরকা মোর ভাতার পুত চরকা মোর নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা হাতী॥

হায় আজ তাঁহাদিগের পৌত্রী প্রপৌত্রীদিগের বিদেশীয় সূত্র ভিন্ন লজ্জা-নিবারণের উপায় নাই।[৩] সূতা কাটার নাম কাটনা কাটা, এই কাটনা কাটা ভিন্ন তাঁহারা অতি সুন্দর কাঁথা প্রস্তুত করিতে জানিতেন। আজিও যশোহর

খুলনা প্রভৃতি জিলার মহিলারা এমন সুন্দর চিত্রবিচিত্র কাঁথা প্রস্তুত করেন যে, বিশেষ লক্ষ্য করিয়া না দেখিলে তাহা শাল বলিয়া মনে হয়। এই কাঁথা শিশুদিগের এবং নিজেদের শয্যা হইত, উৎকৃষ্টগুলি কর্ত্তাদিগের পাছুড়ী হইত, অৰ্দ্ধ হাত প্রস্থ তিন হাত দীর্ঘ কাঁথাকে পাপস বলিত, কর্ত্তারা শীতকালে তাহা পদতল হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত জড়াইয়া শীত কাটাইতেন। পাটের নানাবিধ কারুকার্য্যবিশিষ্ট শিকা প্রস্তুত করিতেন। কড়ি বসাইয়া একপ্রকার মনোহর ও মূল্যবান শিকা, আলনা, ঝাঁপি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন। মোম এবং খয়েরের কারুকার্য্যে তাঁহারা বিশেষ দক্ষা ছিলেন। মোমের নানা প্রকার পুত্তলিকা এবং খয়েরের অতি সুন্দর সকলপ্রকার অলঙ্কার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তৈজসপত্র, খট্টা, পশুপক্ষী এবং সুন্দর উদ্যান প্রস্তুত করিতে অনেকে জানিতেন। চিত্রবিদ্যায়ও ন্যূন ছিলেন না, আলিপনা দ্বারা ক্রিয়াকর্ম্মে প্রাঙ্গণ সুচিত্রিত করিতেন, ঠাকুরঘর ও আপনাদিগের ঘরের প্রাচীরে অতি চমৎকার আলিপনা দিয়া রাখিতেন। বিবাহাদির পিঁড়ায় এক একটী মহিলা এমন অপূর্ব্ব আলিপনা-চিত্র অঙ্কিত করিতেন যে, লোকে তাহা দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিত। তাঁহার দ্বারা আলিপনা দিবার জন্য অনেকে তোষামোদ করিয়া পিঁড়া পাঠাইয়া দিত। বিবাহে বরণের জন্য তণ্ডুলপিণ্ডের অতি চমৎকার কারুকার্য্যবিশিষ্ট "শ্রী-" নির্ম্মাণের জন্য অনেকে বিখ্যাত ছিলেন। তদ্ভিন্ন ক্ষীরের ছাঁচ ও চন্দ্রপুলির জন্য অতি সুন্দর চিত্রবিচিত্র মাটীর ও কাঠের ছাঁচ খুদিতেন। পরিত্যক্ত কেশগুচ্ছ দ্বারা অতি সূক্ষ্ম সূত্রগুচ্ছ প্রস্তুত করিয়া আপনাদিগের কবরী বন্ধন করিতেন, নানা বর্ণের কার্পাসসূত্রে ঘুন্সী বিনাইতেন। ইত্যাদি অনেক কারুকার্য্যে অনেকেই বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

দিবারাত্রি অকাতরে প্রফুল্লচিত্তে পরিশ্রম করিতেন বলিয়া এখনকার মহিলাদিগের অপেক্ষা তাঁহারা অনেক সুস্থ থাকিতেন। বায়ুরোগ (হিষ্টিরিয়া) অতি অল্প স্ত্রীলোকেরই হইত, পেট ফাঁপা, (ডিস্পেপ্‌সিয়া) এবং বহুমূত্র কাহাকে বলে, তাহা তাঁহারা জানিতেন না, অম্লরোগও অনেক অল্প হইত। কেবল যে তাঁহারাই সুস্থ থাকিতেন, তাহা নহে, তাঁহাদের সন্তানেরাও তাঁহাদের স্বাস্থ্যগুণে সবল ও দীর্ঘজীবী হইত।

আমোদ। সাবেক কর্ত্তাদিগের অধিকাংশ আমোদ প্রমোদ ধর্ম্ম লইয়া হইত। তন্মধ্যে পূজার আমোদই প্রধান। দুর্গোৎসব, কালীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, কার্ত্তিক পূজা ও সরস্বতী পূজায় অনেকেই যথেষ্ট অর্থব্যয় করিতেন।

কুমারটুলীর গোবিন্দরাম মিত্রের দুর্গাপূজা যেন উপন্যাসের ব্যাপার, এখানে তাহার কোন বর্ণনা করিব না, তাঁহার কথা লিখিবার সময় বলিবার ইচ্ছা রহিল। তবে এইমাত্র বলিব যে, তাঁহার কয়েক অধঃস্তন পুরুষ পৈতৃক রীত্যনুসারে পূজার ধুমধাম করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর পলাশীযুদ্ধ হইতে ফিরিয়া আসিয়া ঘোরঘটায় দুর্গোৎসব করিবার জন্য উত্তরের রাজবাটী এত সত্বর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন যে, শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। তাঁহার দুর্গোৎসবে উদ্বোধন হইতে বাইনাচ আরম্ভ হইত, তাহা দেখিবার জন্য সহরের বড় বড় সাহেব নিমন্ত্রিত হইতেন এবং এখনও হন। সাহেবেরা এই নৃত্যোৎসবকে পলাশীযুদ্ধজয়ের স্মৃতি-উৎসব বলিয়া সাদরে যোগদান করিতেন এবং আজিও করেন।

কালীশঙ্কর ঘোষের বাটীর কালীপূজা অতি ভয়ানক ব্যাপার ছিল। এই স্থানে সংক্ষেপে তাঁহাদের কথা কিছু বলিয়া রাখি, ইঁহারা চোপার ঘোষ, ভীষণ তান্ত্রিক, এখনও সুরাপান ভিন্ন আহ্নিক সম্পন্ন হয় না। কালীশঙ্কর ঘোষের বাটীর গুরু পুরোহিত কর্ত্তা প্রভৃতি পুরুষ, অন্দরে গৃহিণী এবং সমস্ত পুরনারী মায় দাস দাসীকে পর্য্যন্ত সুরাপান করিতে হইত। শ্যামাপূজার রাত্রে এই সুরাপান অব্যাহতভাবে চলিত। সুরাপানে উন্মত্ততা সম্বন্ধে কতকগুলি গল্প প্রচলিত আছে, একবার ঢুলিরা পূজার দিন মধ্যাহ্নকালে অন্তঃপুরে গৃহিণীর নিকট গিয়া তৈল ও জলপান প্রার্থনা করায় পানোন্মত্তা গৃহিণী বলিলেন, "কি তোরা আমার বাড়ীতে তেল জলপান চাহিতেছিস, মিঠাই খা মোমবাতি মাখ।" একদিন সন্ধ্যাহ্নিক অন্তে কালীশঙ্কর একটী পা মুড়িয়া একটী পা বাড়াইয়া মালাজপ করিতেছেন, মাতাল ভৃত্য সেই পাখানি টিপিতে টিপিতে কাঁদিতেছে। বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, তুই কাঁদিতেছিস কেন রে? উত্তর হইল, কর্ত্তা এতদিন চাকুরী করিতেছি, কখনও কোন অপরাধ করি নাই, আজ আপনার একখানা পা হারাইয়া ফেলিয়াছি, খুঁজিয়া পাইতেছি না। কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, তার জন্য চিন্তা কি, বোধ হয় জল খাবার জায়গায় ফেলিয়া আসিয়াছি, যা বাটীর ভিতর হইতে লইয়া আয়। ভৃত্য অন্দরে গিয়া অনেক অনুসন্ধান করিল, শেষে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, একবার আহ্নিকের জায়গায় দেখিয়া আয়, তাহাও হইল, কিন্তু পা পাওয়া গেল না। কাঁদিতে কাঁদিতে ভৃত্য আবার কর্ত্তাকে সমস্ত অনুসন্ধানের কথা জানাইল, তিনি বলিলেন, তবে বুঝি আহ্নিকের নৈবেদ্য সহিত ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে গিয়াছে, যা সেখানে জিজ্ঞাসা করিয়া

আয়। ভৃত্য গুরুর গৃহে গিয়া জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, ওরে কালীশঙ্করের পা যদি আমার বাটীতে আসিয়া থাকে; তাহা হইলে আমি কাল সকালে মাথায় করিয়া পঁহুছাইয়া দিয়া আসিব, তুই এখন যা। ভৃত্য আশ্বস্ত হইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল।

একবার কালীপূজার রাত্রে কর্ত্তার খেয়াল হইল যে, আমি এতগুলা পশুকে বলিদান দিয়া স্বর্গে পাঠাইতেছি, আমার কত পুণ্য হইতেছে, যদি গুরুদেবকে বলিদান করিয়া স্বর্গে পাঠাই, তাহা হইলে ত আরও পুণ্য হইবে। গুরুকেও এই কথা জিজ্ঞাসা করা মাত্র তিনি তথাস্তু বলিয়া নাচিয়া উঠিলেন। তাঁহাকে হাড়িকাঠের নিকট উপস্থিত করা হইল। যে কামারেরা বলিদান করিতেছিল, তাহাদিগকেও মদ খাইতে হইয়াছে। কিন্তু যখন এত বলিদান করিতে হইবে, তখন মাতাল হইলে বিপদের সম্ভাবনা জানিয়া তাহারা সামান্য পান করিয়া কর্ত্তাদিগের নিকট অধিক পানের ভান করিতেছিল। কামার বলিল, কর্ত্তা মহাশয় এসব খাঁড়াগুলাতে চিরকাল পশুবলি দিয়া আসিতেছি, ইহাতে কি গুরুদেবকে বলি দিতে আছে? আমার গৃহে গুরুবলির জন্য নূতন খাঁড়া প্রস্তুত আছে, একটু অপেক্ষা করুন, আমি শীঘ্র লইয়া আসিতেছি। এই বলিয়া আপনার সহকারীদিগকে সাবধান করিয়া দিয়া বাহিরে গিয়া থানাদারকে ডাকিয়া আনিয়া গুরুকে রক্ষা করিল।

এই গৃহে শ্যামাপূজার রাত্রে প্রাঙ্গণ রক্তে ডুবিয়া যাইত, নর্দ্দমা দিয়া রক্তের স্রোত বহিত। সাত হাত লম্বা প্রতিমা হইত, দালানে পর্ব্বতপ্রমাণ মিষ্টান্নের স্তূপ হইত। আমরা বাল্যকালে ইঁহার পরবংশীয়দিগের পূজার এক একটী মিঠাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইতাম, দুইটী বড় মালসার ভিতর মিঠাই ঢালিয়া এক একটী মিঠাই প্রস্তুত হইত।

দরজীপাড়ায় কবিরাজ রামকমল সেনের বাটীর জগদ্ধাত্রী পূজারও শেষাবস্থার ব্যাপার আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি। এখন তত বড় ঠাকুর ও সে রকম জাঁকজমক কোথাও দেখিতে পাই না। ঐ জগদ্ধাত্রীর সিংহ মধ্যে মধ্যে মুখব্যাদান করিত, লেজ নাড়িত। এই রূপ পূজার ধূমধাম পাড়ায় এত হইত যে, আবালবৃদ্ধবনিতা প্রত্যেক পূজায় মাতিয়া থাকিত। কোজাগর পূর্ণিমায় এবং শিবরাত্রে কেবল বৃদ্ধ বৃদ্ধারা নহে, অল্পবয়স্ক বালক বালিকা ভিন্ন সকলকেই রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। কোজাগরের দিনে উপবাস নাই, কেবল রাত্রে লক্ষ্মীপূজার পর ঝুনা নারিকেল চিঁড়া ও

তালের ফোঁপল খাইয়া সকলকে সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতে হইত। তদুপলক্ষে অনেক গৃহে নাচ তামাসা লইয়া জাগরণ হইত, অনেকে তাস পাশা প্রভৃতি খেলায় রাত্রি কাটাইতেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে দিবারাত্রি উপবাস করিতে হইত, "উপবাসে পরিশ্রান্ত হইয়া কেহ রাত্রে ঘুমাইয়া পড়িলে দয়াময় শিব নিজে আসিয়া ভক্তের পদসেবা করিয়া থাকেন", এই বিশ্বাসে কেহ ঘুমাইতেন না। বৃদ্ধ বৃদ্ধারা শিবপূজায় ধ্যান ধারণায় থাকিতেন, যুবক যুবতীরা নৃত্য গীত তাস পাশা প্রভৃতি দ্বারা রাত্রি জাগরণ করিতেন।

দুর্গোৎসবের তিনদিন শাক্তদিগের গৃহে বলিদান হইত, নবমীর দিন অনেক স্থানে বলিদানের বিশেষ বাড়াবাড়ি। শোভাবাজারে কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট যাহাকে জয় মিত্রের গলি বলে, সেই রাস্তায় জয় মিত্রের বাড়ী, আমরা তাঁহার দুর্গোৎসবে নবমীর দিন অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি দেখিয়াছি। যাঁহারা মহাষ্টমীর দিন কালীঘাটে গিয়াছেন, তাঁহারা তথাকার ব্যাপার স্মরণ করিলেই সে দৃশ্য বুঝিতে পারিবেন। কথিত আছে, জয় মিত্র সপ্তমীর দিন হইতে যত বলিদান হইত, নিজ গৃহের ব্যবহার্য্য ভিন্ন অপর ছেদিত ছাগগুলি গুদামজাত করিয়া রাখিতেন, একাদশীর দিন খাতা দেখিয়া পৈতৃক আমল হইতে যে যে ব্রাহ্মণের বার্ষিক ছিল, তাঁহাদের গৃহে পাঠাইয়া দেওয়া হইত।

নবমীর বলিদানের আমোদ কর্ত্তাদিগের নিকট যাহা শুনিয়াছি, তাহা আরও অদ্ভুত। তাঁহারা বলিতেন, কেবল মহিষ মেষ ছাগ কুষ্মাণ্ড ও আখ বলি নহে, অনেক গৃহে আমোদ করিয়া গোধিকা, কপোত, মাগুরমাছ, নানাবিধ লেবু সুপারি এবং গোলমরিচ পর্য্যন্ত বলিদান হইত। বলিদানের পরে আরতি শেষ হইলে নৃত্য আরম্ভ হইত, কেবল নৃত্য নহে, সেই রক্তপ্লাবিত প্রাঙ্গণে মল্লযুদ্ধ ও নানাপ্রকার ব্যায়ামক্রীড়া হইত। মোষের মুণ্ড, আখ, কুমড়া, লেবু, নারিকেল প্রভৃতি লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে করিতে রক্তে গড়াগড়ি দেওয়া হইত। এক একজন উবু হইয়া বসিয়া উদর ও উরুদ্বয়ের মধ্যে একটী নারিকেল ধরিয়া রাখিতেন, আট দশজন বীর তাঁহার সেই নারিকেলটী বাহির করিয়া লইবার জন্য টানাটানি করিয়া আছাড় পিছাড় করিতেন। এইরূপে রক্ত মাখিয়া গীতবাদ্যের সহিত নৃত্য করিতে করিতে পথে মিছিল বাহির হইত। সেই সময় তাঁহাদের দেখিলে মনে হইত যেন দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া শৈব সৈন্যেরা সদর্পে পৃথিবী কাঁপাইয়া চলিয়াছেন। জন্মাষ্টমীর দধিকাদা মাখিয়াও এইরূপে মিছিল বাহির করিয়া গঙ্গাস্নানে যাওয়া হইত। এ দুইটী মিছিলে পথে দর্শকদের প্রতি

কোন উপদ্রব হইত না, কিন্তু দোলের মিছিলের ব্যাপার স্বতন্ত্র। সে সময় কোন ব্যক্তির বেদাগ বস্ত্র থাকিত না, দলে দলে মিছিল বাহির হইতেছে, পিচকারি ও আবীরে পথঘাট ঘরবাড়ী লালে লাল হইয়া যাইতেছে। মিছিলওয়ালারা সুশ্রাব্য অশ্রাব্য গীতে পাড়া মাতাইয়া এবং নরনারী যাহাকে সম্মুখে পাইত, তাহাকে আবীর ও পিচকারিতে ব্যতিব্যস্ত করিয়া চলিয়া যাইত। এমন অশ্রাব্য গীত এবং কুৎসিত সং প্রকাশ্যে পথে বাহির করিতেন যে, এখনকার লোকে তাহা কল্পনা করিতে পারে না। কর্ত্তারা কিন্তু তাহা লইয়া খুব আমোদ করিতেন। গৃহিণী ও বালক বালিকাদিগের সহিত শ্রবণ ও দর্শন করিতেন।

ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে লালদীঘিতে দোলযাত্রার বড় ঘটা হইত। এই লালদীঘি গোবিন্দপুরবাসী মুকুন্দরাম শেঠ বা তাঁহার পুত্রের খোদিত। ইহার পশ্চিম পাড়ে গঙ্গাতীরে তাঁহার ইষ্টক-নির্ম্মিত কাছারীবাটী ছিল, সমস্ত কাছারী ও পুষ্করিণী এক সীমায় আবেষ্টিত থাকিত। দীঘির উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুইটী দোলমঞ্চ নির্ম্মিত ছিল, দক্ষিণের মঞ্চে গোবিন্দজী, উত্তরের মঞ্চে রাধিকাজীকে স্থাপন করিয়া কতক লোক রাখালবেশে গোবিন্দজীর পক্ষে, আর কতক লোক সখীবেশে রাধিকাজীর পক্ষে থাকিয়া পরস্পরে আবীরযুদ্ধ খেলা হইত। দীঘির জলে আবীর গুলিয়া পিচকারি দেওয়া হইত, সেইজন্যই উহার "লালদীঘি" নাম হইয়াছে। বহুদূর হইতে গ্রামবাসীরা আসিয়া এই দোল উৎসবে যোগ দিত, তদুপলক্ষে বহুদূর বিস্তৃত বাজার বসিত। রাধারাণীর উত্তরের বাজারটীর নাম রাধাবাজার বলিত, সেই নাম আজিও রহিয়াছে, যে স্থানে পর্ব্বতপ্রমাণ আবীরের স্তূপ বিক্রয়ার্থ থাকিত, তাহাকে লালবাজার বলিত।

ইংরাজেরা দ্বিতীয়বার সুতানুটীতে আসিয়া যখন বসেন, তখন তাঁহাদের অতি দুরবস্থা, থাকিবার বাসাঘরগুলি ভাঙ্গা, বেমেরামত, সুতরাং কেহ কেহ তাঁবুতে, কেহ কেহ জাহাজের উপর বা নৌকায় বাস করিতেন। তাঁহারা এই দোলের উৎসব দেখিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরে প্রবেশের অনুমতি না পাইয়া বল-প্রয়োগ করিয়া প্রবেশের চেষ্টা করায় দেশীয়েরা বিলক্ষণ উত্তমমধ্যম দিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিল। সাহেবেরা প্রহার খাইয়া পলাইয়া আসিলেন বটে, কিন্তু পরক্ষণে জব চার্ণক স্বয়ং সদলে বন্দুক লইয়া উপস্থিত হন। বন্দুকের শব্দ শুনিয়া দোলযাত্রীরা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিলে, চার্ণক সাহেব উক্ত কাছারীবাটী

দখল করিয়া আপনাদের দপ্তরখানা আনিয়া ঐ বাটীতে স্থাপন করেন। সে সময় শেঠ বসাকদের এতদঞ্চলে অদ্বিতীয় ক্ষমতা। তাঁহাদের সহিত বিবাদ করিয়া এখানে বাণিজ্যের চেষ্টা করা বিড়ম্বনা জানিয়া শেষে আপোষে বিবাদ মিটাইয়া লওয়া হইয়াছিল, কিন্তু কাছারীবাটী আর ছাড়িয়া দেওয়া হইল না, মূল্য দিয়া ক্রয় করিয়া তাহার প্রাঙ্গণে চালাঘর বাঁধিয়া আপনারা বাস করিতে লাগিলেন। পরে ঐ স্থানেই দুর্গ নির্ম্মিত হয়, দুর্গনির্ম্মাণের পরও দুর্গ-প্রাঙ্গণে উক্ত কাছারীবাটী কয়েক বৎসর রাখা হইয়াছিল।

রাসের আমোদও এখানে খুব হইত। শিয়ালদহের পূর্ব্বে যে সারপল্লী নামক অতি প্রাচীন গ্রামের উল্লেখ আমরা পূর্ব্বে করিয়াছি, তাহাই এখন শুঁড়ো বলিয়া পরিচিত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র সর্ব্বপ্রথম দিল্লীর সম্রাটের নিকট চাকুরীসূত্রে রাজা বাহাদুর উপাধিসহ জায়গীর ও দশহাজার অশ্বারোহীর মনসবদার হইয়াছিলেন। তিনি ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে চাকুরী ছাড়িয়া ভবানীচরণ দত্ত মহাশয়ের পরামর্শে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন, এবং মেছুয়াবাজারের বাটী পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ায় যে উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, সপরিবারে তথায় গিয়া বাস করিলেন। সেখানে মহা ধূমধামে রাসোৎসব করিতেন, তদবধি আজ পর্য্যন্ত শুঁড়ার রাস অত্যন্ত বিখ্যাত। যদিও এখন পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক হ্রাস হইয়া আসিতেছে। বাগবাজারের গোকুলচন্দ্র মিত্র বিষ্ণুপুরের রাজা দ্বিতীয় দামোদর সিংহের নিকট হইতে মদনমোহন বিগ্রহ এক লক্ষ টাকায় বন্ধক রাখিয়াছিলেন। এইরূপ গল্প প্রচলিত আছে, যখন রাজা মদনমোহনকে উদ্ধার করিতে আসেন, তখন গোকুল মিত্র আর একটী মদনমোহন প্রস্তুত করিয়া পাশাপাশি দুইটী মূর্ত্তি রাখিয়া রাজাকে নিজের বিগ্রহ তুলিয়া লইতে বলেন। কোন কোন লোকের মতে রাজা নকল মদনমোহন লইয়া গিয়াছেন, আবার কোন কোন লোকে বলে রাজা তাঁহার নিজ ঠাকুরকেই আনিয়াছেন। এ সম্বন্ধে একটী গীতাংশ প্রচলিত আছে, যথা :—

"সুবুদ্ধি রাজার কুবুদ্ধি ঘটিল।
সোণার মদনমোহন বাঁধা দিয়ে গেল ॥"

আর একটী কথা বালকেরা ব্যবহার করে, যথা :—

"কারুর কিছু হারিয়েছে।
বাগবাজারের মদনমোহন পালিয়েছে ॥"

মদনমোহন সোণার নহেন, কৃষ্ণ প্রস্তরের। গোকুল বাবু মদনমোহনকে

পাইবার পরই একটী রাধিকা গড়াইয়াছিলেন, কারণ রাজা নিজ রাধিকাকে বাঁধা দেন নাই। গোকুল বাবু রাধা-মদনমোহনের ঠাকুরবাটী, রাসমঞ্চ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া সমস্ত পর্ব্ব যথেষ্ট অর্থব্যয়ে সম্পন্ন করিতেন। তন্মধ্যে রাসোৎসবটীই প্রধান, তদুপলক্ষে কোন আমোদ তামাসার ত্রুটী হইত না। ঠাকুরবাটীর দক্ষিণে বৃহৎ একটী দীঘি ছিল, তাহাতে চারিখানি নৌকা ভাসাইয়া স্ত্রীলোকদের কবিগান হইত। অনেক প্রকারের সং এবং কৃষ্ণলীলা বিষয়ক ছবি টাঙ্গানো হইত, সুবৃহৎ রাসমঞ্চের সম্মুখে সুসজ্জিত প্রাঙ্গণে অবিশ্রান্ত নৃত্য-গীত হইত, দর্শকের জনতায় সম্মুখস্থ চিৎপুর রোডে যাতায়াত করা দুরূহ ছিল। আহীরীটোলার নিমু গোঁসাইয়ের লেনে চিৎপুর রোড দিয়া প্রবেশ করিয়া, ডান হাতেই নিমাইচরণ গোস্বামীর বৃহৎ বাটী, তাঁহার গৃহে বলরাম বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত। তিনি চৈত্র মাসে ঘোরঘটায় বলরামের রাসোৎসব করিতেন। রাসের জাল খাটাইবার জন্য প্রাঙ্গণে বহুসংখ্যক সুউচ্চ স্তম্ভ নির্ম্মিত হইত, স্তম্ভগুলি ৪০।৫০টি বাঁশ একত্র তাড়া বাঁধিয়া নির্ম্মিত হওয়ায় লোকে গীত বাঁধিয়াছিল,

"জন্ম মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্রমাসে রাস।
আলোর সঙ্গে খোঁজ নাইক বোঝা বোঝা বাঁশ ॥"

সিমুলিয়ার অনাথনাথ দেবের বাজারের দক্ষিণে বাবু বংশীধর মিত্রের বাটী, তাঁহার বাটীতেও রাস উপলক্ষে আমোদ হইত। কৃষ্ণলীলা বিষয়ক নানা প্রকার বহুমূল্য বৃহদাকার ছবি ও পুত্তলিকা ইত্যাদি দ্বারা গৃহকে এমন চমৎকার সাজান হইত যে, উপরোক্ত কয়েকটী বিখ্যাত রাসের কোথাও তেমন হইত না।

খড়্গাদহ অর্থাৎ খড়দার শ্যামসুন্দর বড় জাগ্রত দেবতা, তজ্জন্য খড়দা হিন্দুদিগের একটী তীর্থস্থানরূপে প্রচলিত বলিলেও বলা যায়। এখানকার রাস দেখিবার জন্য নিকটস্থ অনেক গ্রাম ও নগরের লোক সমবেত হয়। আমরা এই শ্যামসুন্দর বিগ্রহের সম্বন্ধে যে যে গল্প শুনিয়াছি, তাহা এই স্থানে বর্ণন করিব। রুদ্ররাম নামক একটী ব্রাহ্মণ যুবা শ্রীরামপুরের নিকটস্থ চাতড়া গ্রামে মাতুলালয়ে বাস করিতেন। একদিন তিনি মাতুলের কৃষ্ণবিগ্রহের পূজা করিতেছেন দেখিয়া মাতুল বলিলেন, এখনও তোমার এই বিগ্রহ পূজা করিবার অধিকার হয় নাই। যুবক ইহা শুনিয়া মর্ম্মাহত হইয়া বর্ত্তমান বল্লভপুর তখন নিবিড় জঙ্গল ছিল, তিনি সেই বনে প্রবেশ করিয়া গঙ্গাতীরে তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। কিছুকাল পরে তিনি দেশ পর্য্যটনে গমন করেন। একদিন গৌড়নগরে ভ্রমণকালে সহরের একটী ফটকের সম্মুখে বসিয়া আছেন,

ফটকের উপরে দেখিতে পাইলেন, একখানি কৃষ্ণবর্ণ বৃহৎ প্রস্তর সর্ব্বদাই ঘর্ম্মাক্ত হইতেছে। তিনি ভাবিলেন, এই প্রস্তরে কৃষ্ণমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতে পারিলে ভক্তসমাজের বিশেষ ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে, কিন্তু মুসলমান নবাবের ফটকের প্রস্তর খুলিয়া লইয়া দেবতা গঠন করার অভিপ্রায় অপেক্ষা আকাশ-কুসুম আর কি হইতে পারে? রুদ্ররাম যে একজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং অধ্যবসায়ী পুরুষ, তাহা তাঁহার প্রথম কার্য্যেই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। তিনি এই অসম্ভব ব্যাপারেও নিরস্ত হইলেন না। জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার কিয়ৎপরিমাণে অধিকার ছিল, তিনি একজন ক্ষমতাবান হিন্দু অমাত্যের নিকট গিয়া বলিলেন, "খাঁ সাহেব[8] আমি নারায়ণের আদেশে বহুদূর হইতে আপনার নিকট আসিয়াছি, তিনি স্বপ্নযোগে আমায় বলিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বরের তোরণদ্বারের উপর আমি প্রস্তররূপে আবদ্ধ আছি, তুমি খাঁ সাহেবের নিকট গমন করিলে তিনি আমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিবেন, তৎপরে তুমি আমার মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া পূজা প্রবর্ত্তন করিবে। খাঁ সাহেব, আমি ভগবানের আদেশ আপনাকে জানাইলাম, এক্ষণে আপনার যাহা কর্ত্তব্য তাহা করুন, আমি গরিব ব্রাহ্মণ আমার কি সাধ্য।"

ভগবানের আদেশশ্রবণে হিন্দু অমাত্যের প্রাণ শিহরিয়া উঠিল, কি করিবেন ভাবিয়া আকুল হইলেন। যদিও সে সময়ের নবাব হুসেন সা হিন্দুধর্ম্মের বিশেষ পক্ষপাতী, মুসলমান হইলেও হিন্দু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সন্ন্যাসী ও ভক্তদিগকে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন। আপনার ধর্ম্মভাবকেও অনেক পরিমাণে হিন্দু ভাবাপন্ন করিয়াছিলেন। এমন কি, তাঁহার আদেশে তাঁহার কবরের উপর একখানি শ্বেত প্রস্তরফলকে একটী পদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া স্থাপন করা হইয়াছে, প্রত্যহ তাহাতে শ্বেত চন্দন লেপন করিবার জন্য একজন লোক নিযুক্ত এবং তাহার ভরণপোষণের জন্য ভূমি প্রদত্ত আছে। সমাধি মন্দিরটী "কদম রসুল" অর্থাৎ হজরত মহম্মদ রসুলের পদাঙ্ক মন্দির বলে। আমরা গৌড়ের কোন পুরাতন মন্দিরাদিতে সেবায়ত দেখি নাই, কেবল এই স্থানে লোক-জন উদ্যান ইত্যাদি বর্ত্তমান আছে। এই নবাব হিন্দুবিরোধী না হইলেও মুসলমান ত বটে, সুতরাং তাঁহাকে কি ভরসায় এমন গুরুতর কার্য্যের জন্য অনুরোধ করিবেন, অমাত্যবর তাহাই একান্তচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন। শেষে ব্রাহ্মণকে বলিলেন, ঠাকুর, আমি যে বিষম বিপদে পড়িলাম, এ দুর্ব্বল ব্যক্তির প্রতি ভগবানের এমন গুরুতর আদেশ কেন হইল, বুঝিতে পারিতেছি না, নিশ্চয়

ইহা তাঁহার ছলনা বলিয়াই বোধ হয়। আপনার চরণে ধরিয়া নিবেদন করিতেছি, আপনি আমায় ইহার উপায় বলিয়া দিয়া এ বিষম দৈব ছলনা হইতে রক্ষা করুন।

ব্রাহ্মণ বলিলেন, আপনার কোন ভয় নাই, আমি গণনা করিয়া দেখিয়াছি, আপনি নির্বিঘ্নে এই আদেশ পালনে সক্ষম হইবেন। আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না, একজন জ্যোতির্বিবদ পণ্ডিত বলিয়া আমায় নবাব দরবারে উপস্থিত করিয়া দিন, তাহা হইলেই সমস্ত কার্য্য আমি সাধন করিয়া লইব। খাঁ সাহেব তাহাই করিলেন। নবাব পণ্ডিতকে নানা বিষয়ের প্রশ্ন করিতে লাগিলেন, কবে চন্দ্রগ্রহণ, কবে সূর্য্যগ্রহণ হইবে, বৃষ্টি কেমন হইবে, শস্য কেমন হইবে, প্রভৃতি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদত্ত হইলে একজন রহস্যপ্রিয় মুসলমান মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, ভাল পণ্ডিতজী কবে ভূমিকম্প হইবে বলিতে পারেন? পণ্ডিত তদুত্তরে বলিলেন, ইহা হিন্দুদিগের বলিবার ক্ষমতা নাই, কারণ আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মরিলে আমরা তাঁহার দেহ ভস্ম করিয়া থাকি, ধূমের সহিত তাঁহাদের আত্মা আকাশে গমন করেন এবং আকাশের সংবাদ আমাদের জানাইয়া থাকেন, আপনাদের পূর্ব্বপুরুষেরা মৃত্তিকায় কবরিত হন, তাঁহারা আপনাদিগকে ভূমিকম্পের সঠিক সংবাদ অবশ্যই প্রদান করিয়া থাকেন। সুতরাং সুবিজ্ঞ মৌলবী সাহেবেরা তাঁহাদের কেতাবের সাহায্যে অবশ্য বলিতে পারিবেন। এই সুযোগ্য যুক্তি নবাবের বিশেষ মনঃপুত হওয়ায় তিনি ব্রাহ্মণের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ব্রাহ্মণ যখন দেখিলেন যে, নবাবের চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, তখন বলিলেন, বাদসাহ, আমি গণনার দ্বারা আপনার রাজধানীতে একটী বহুকালস্থায়ী অমঙ্গল দেখিতেছি। একটা ভূত বহুকাল হইতে রাজধানীর অমুক ফটকের উপর প্রস্তরমধ্যে আবদ্ধ আছে এবং দিবারাত্রি রোদন করিতেছে, তাহার চক্ষের জল প্রস্তর ভেদ করিয়া বাহির হইতেছে। আপনার পূর্ব্ব বাদসাহের উষ্ণীষের উপর তাহার অশ্রুপাত হওয়ায় সেই বাদসাহ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। আপনার সুযোগ্য পুত্র যে কোচদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে গিয়া পরাস্ত হইয়া আসেন, তাহার কারণ ঐ ভূত ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাদসাহজাদা যখন যাত্রা করেন, তখন তাঁহার উষ্ণীষের উপরেও উহার অশ্রু পতিত হইয়াছিল। আপনি মহা পুণ্যবান, সেই জন্য কেবল আপনার পুণ্যবলে তাঁহার প্রাণরক্ষা হইয়াছে। অপরের পুত্র হইলে জীবন সংশয় হইত। সেই ভূতকে দূরীভূত না করিলে আপনার এবং

রাজ্যের আর মঙ্গল নাই। আমরা জ্যোতির্বিবদ শুভাশুভ সকল কথাই আমা-দিগকে বলিতে হয়, তাই এই অশুভ কথাও আপনাকে বলিলাম।

সেই রোরুদ্যমান ভূতকে দেখাইতে পারিবেন কিনা, জিজ্ঞাসিত হইলে পণ্ডিত তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। নবাব সপারিষদ ব্যগ্রতার সহিত ব্রাহ্মণের পশ্চাতে ভূত দর্শনে গমন করিয়া যখন স্বচক্ষে সেই ঘর্ম্মসিক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর দর্শন করিলেন, তখন কেবল আশ্চর্য্য হইলেন না, ভয়ে তাঁহার সমস্ত দেহ কাঁপিতে লাগিল। তিনি তৎক্ষণাৎ সেই বৃহৎ তোরণ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার আদেশ প্রদান করিলেন। তখন ব্রাহ্মণ বলিলেন, বাদসাহ আমায় ক্ষমা করুন, এ আদেশ প্রত্যাহার করুন, এমন কোন মনুষ্য নাই যে, উহাকে স্পর্শ করিতে পারে, আমায় আজ্ঞা করুন, আমি এই স্থানে একটী যজ্ঞ করিব, সেই যজ্ঞের মন্ত্রপূত হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইলে তাহার উত্তাপে ঐ ভীষণ ভূত যখন মৃতপ্রায় হইবে, তখন আমি স্বহস্তে উহাকে নামাইয়া নৌকাযোগে লইয়া গিয়া একেবারে মহাসমুদ্রে ফেলিয়া দিয়া আসিব।

ব্রাহ্মণের প্রতি নবাব হুসেন সার এমন অটল বিশ্বাস হইয়াছিল যে, তিনি তাঁহার প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন। চতুর ব্রাহ্মণ এই সুকৌশলে কার্য্যোদ্ধার করিয়া নবাবের নিকট যথেষ্ট পুরস্কার লইয়া নৌকাযোগে খড়দহে উপনীত হন এবং সেই প্রস্তরে চারিটী কৃষ্ণমূর্ত্তি গঠন করেন। তাহারই একটী খড়দহের শ্যামসুন্দর, একটী বল্লভপুরের রাধাবল্লভ, একটী সাঁইবনার নন্দদুলাল, আর একটী বগড়ির কৃষ্ণরায় নামে বিখ্যাত বিগ্রহরূপে বিরাজ করিতেছেন। আরও খানিক প্রস্তর খড়দহের অশ্বত্থমূলে আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই চারিটী বিগ্রহই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের বিশেষ পূজনীয়। তজ্জন্য খড়দহের রাসোৎসব অতি বিখ্যাত। কিন্তু এক্ষণে বগড়ির কৃষ্ণরায় ভিন্ন অন্য কোন বিগ্রহকে ঘামিতে দেখা যায় না। খড়দহের শ্যামসুন্দর কখন কখন ঘর্ম্মাক্ত হন, কিন্তু ইনি ঘর্ম্মাক্ত হইলেই প্রধান সেবায়তের মৃত্যু হয় বলিয়া প্রবাদ আছে। রাস ভিন্ন ফুলদোল উপলক্ষেও খড়দহে অনেক যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। শ্যামসুন্দর সম্বন্ধে আর একটী কিম্বদন্তি এই যে, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরভদ্র যখন মক্কাতীর্থ দর্শন করিয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন, তখন বাদসাহ তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্য গোমাংস বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দেন। বাহক উহাকে বাদসাহ প্রেরিত পুষ্প বলিয়া বীরভদ্রের সম্মুখে উপস্থিত করিলে তিনি বস্ত্র উদঘাটন করিতে আদেশ করেন। আবৃত বস্তু তখন সত্য সত্যই পুষ্পে পরিণত হইয়াছে। বাহক বাদসাহের নিকট এই সংবাদ প্রদান করিলে

তিনি সন্তুষ্টচিত্তে বৈষ্ণবকে পুরস্কার দিতে চাহিলে, গোস্বামী তাঁহার ফটকের উপরিস্থ উক্ত প্রস্তরখণ্ড প্রার্থনা করেন এবং লাভ করিয়া খড়দহে আনিয়া মূর্ত্তি-চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করেন।৬

পানিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের স্থাপিত বিগ্রহেরও বিশেষ সমারোহে রাসোৎসব হইয়া থাকে। এই বিগ্রহ খড়দহের শ্যামসুন্দর অপেক্ষাও প্রাচীন, কারণ রাঘব পণ্ডিত চৈতন্যদেবের একজন প্রধান সহচর ও বন্ধু ছিলেন, চৈতন্যদেবের জীবনে ঐ বিগ্রহসেবার অনেক উল্লেখ আছে। পূর্ব্বে বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র বৈষ্ণব পর্ব্বের মধ্যে রাস ও দোলযাত্রাই সর্ব্বপ্রধান পর্ব্ব। সকল দেবালয়েই এই দুই পর্ব্ব উপলক্ষে সমারোহ হইত।

রথের উৎসবও কলিকাতায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। ইংরাজদিগের আগমনের পূর্ব্বে এখানে যোত্রমান হিন্দু অনেক ছিলেন, তাঁহারা মহাসমারোহে বার মাসের তের পার্ব্বণ সম্পন্ন করিতেন। তাহার প্রমাণ শেঠদিগের লালদীঘির দোল এবং বৈঠকখানার রথে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। ঐ রথখানি ইংরাজ ঐতিহাসিকদিগের মতে ৭০ ফুট উচ্চ, সমস্ত বৎসর বৈঠকখানার সুবৃহৎ বট-বৃক্ষের নিম্নে অবস্থিতি করিত, ইহার অধিকারী কাহারা, তাহার কোন প্রমাণ তাঁহারা দেন নাই। আমাদের অনুমান হয়, গোবিন্দপুরের শেঠেরাই ইহার প্রকৃত অধিকারী ছিলেন। লালদীঘি হইতে বৈঠকখানা পর্য্যন্ত সরল পথটাই কলিকাতার অতি পুরাতন ও প্রশস্ত রাস্তা, এই পথেই তাঁহাদের গোবিন্দজীর রথযাত্রা হওয়া সুবিধাজনক।

পোস্তার জগন্নাথের তিনখানি সুবৃহৎ রথ বাহির হইত। এই রথ তিনখানির কথা কলিকাতাবাসী অনেক বৃদ্ধেরই স্মরণ আছে। সম্বৎসর রথ তিনখানি গরাণহাটায় লালাবাবুর বাটীর প্রাঙ্গণে থাকিত। এই বাটী বর্ত্তমান বিডন উদ্যানের দক্ষিণে চিৎপুর রোডে, সেখানে এখন পাটের কল আছে। সুবিখ্যাত রাসমণি দাসীর শ্বশুর প্রীতরাম মাড় মহাসমারোহে রৌপ্যনির্ম্মিত রথ বাহির করিতেন, সে রথযাত্রা আজিও তাঁহার উত্তরাধিকারীরা করিয়া থাকেন। তদ্ভিন্ন বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বী ক্ষমতাবান হিন্দুরা অনেকেই ছোট রথ বাহির করিতেন। এখনও দুই একখানা রথ কলিকাতার পথে দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্ব্বের মত জাঁকজমক কিছুই নাই বলিলেও বলা যায়। রথযাত্রার অগ্রে নানা বর্ণের দুই শ্রেণী পতাকার মধ্যে বিবিধ প্রকার বাদ্যভাণ্ড, দলে দলে সংকীর্ত্তন, সুবৃহৎ ছাতায় রাস্তা আচ্ছাদিত হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে তিন চারি হস্ত

পরিধিবিশিষ্ট গোলপাতার ছাতাই অধিক, বস্ত্রের ছাতাও দুই চারিটী থাকিত। এই বস্ত্রের ছাতাগুলি অতি সুন্দর, নানা বর্ণের মোটা মোটা বস্ত্রে আচ্ছাদিত, অতি সুবৃহৎ ঝালোরে তাহার নিম্নদেশ বেষ্টিত, মোটা মোটা বেতের শিক, দুই তিন ইঞ্চি মোটা কাঠের রং করা বাঁট (আজিও কোন কোন নগর সংকীর্ত্তনে গোঁসাইজীর মস্তকে সেই প্রকার ছাতা ধরিতে দেখা যায়)। তা ছাড়া বড় বড় হাতপাখা আড়ানী, রংমশাল, ন্যাকড়ার মশাল এবং নারিকেল শাঁসের মশালের আলোকশ্রেণীতে পথ আলোকিত হইত। কর্ত্তারা খালি গায় খালি পায় কেহ কোমরে কেহ মাথায় উড়ানী বাঁধিয়া বর্ষাকালের কাঁচা রাস্তায় এক হাঁটু কাদার উপর মহা উৎসাহে "জগবন্ধু দেখা দাও আমারে কত মহাপাপী উদ্ধারিলে বসে শ্রীমন্দিরে" প্রভৃতি সংকীর্ত্তন করিয়া নৃত্য করিতেন। দোলযাত্রার ন্যায় রথযাত্রায় অশ্লীল সঙ্গীত গাইতেন না। পথের উভয় পার্শ্বে তালপাতার ছোট বড় নানাপ্রকার কারুকার্য্য করা ভেঁপু, মাটীর রথ, জগন্নাথ প্রভৃতি খেলনা, হাঁড়ি ধামা চুবড়ী. নানাপ্রকার ফল, জলপান ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির দোকান সাজান হওয়ায় মেলাটী খুব জমকাল হইত। ভীড় এত অধিক হইত যে, কোথাও অধিক জনতা দেখিলে লোকে "রথ দোলের মেলা হইয়াছে" বলিয়া থাকে।

আজিও নিকটবর্ত্তী মাহেশ ও বল্লভপুরে আট দিন ধরিয়া রথের মেলা মহাসমারোহে হইয়া থাকে। এই মাহেশ গ্রাম অতি প্রাচীন। মুকুন্দরামের চণ্ডীকাব্য এবং কবিরামের "দিগ্বিজয়প্রকাশ" নামক ভৌগোলিক গ্রন্থে ইহার উল্লেখ দেখা যায়। কবিরাম লিখিয়াছেন, মাহেশ ও খড়দহের মধ্যে গঙ্গা বহুদূর সরলরেখায় চলিয়া গিয়াছেন, মাহেশের রাজার নাম কুলপাল, তিনি কায়স্থবংশীয়, তাঁহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ হরিপাল হইতে হরিপাল নামক গ্রামের স্থাপনা।

বৈষ্ণব কবি জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গলে নিত্যানন্দের প্রচার সম্বন্ধে মাহেশের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার গ্রন্থেও মাহেশের জগন্নাথ বা বিখ্যাত স্নানযাত্রা বা রথের কোন উল্লেখ নাই। আমরা ইতিপূর্ব্বে গত চৈত্র মাসের নব্যভারতের ৬৫২ পৃষ্ঠায় মুকুন্দ ময়রার মোয়া খাইবার জন্য জগন্নাথের মাহেশে আগমন বর্ণন করিয়াছি। কিন্তু তাহা কোন্ সময় তাহার কোন উল্লেখ নাই। যাহা হউক, চৈতন্যদেবের লীলাসাঙ্গের অনেকদিন পরে, এমন কি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কবিরামের সময়ও যদি জগন্নাথের মাহেশে অধিষ্ঠান থাকিত, তাহা হইলে তিনি তাঁহার গ্রন্থে উহার অবশ্য উল্লেখ করিতেন। বল্লভপুরের মন্দির-নির্ম্মাতা কৃষ্ণদাস মল্লিকের প্রপৌত্র নয়ানচাঁদ বা কমলনয়ান মল্লিক? যিনি ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে

কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাহেশের মন্দির এবং ধর্ম্মশালার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। শ্যামবাজারের দেওয়ান কৃষ্ণরাম বসু, যিনি ১৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হুগলির নিকট তারা (তড়া) গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি প্রায় বিংশতি বৎসর বয়সে কলিকাতায় আগমন করিয়া অতি সামান্য মূলধনে লবণের ব্যবসায় করিতেন। একবার তিনি অদৃষ্টে নির্ভর করিয়া কোম্পানির লবণের একটী চালান একেবারে একচেটিয়া রূপে সমস্ত বায়না করিয়া তোলেন, অদৃষ্টক্রমে সেই লবণে তাঁহার ৪০ হাজার টাকা লভ্য হইয়াছিল। সেই লভ্যাংশ হইতে তিনি মাহেশের জগন্নাথের রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। পরে যখন তিনি হুগলির কলেক্টরের দেওয়ান হন, তখন হুগলি জেলার অনেক জমীদারী ক্রয় করেন, তাহা হইতে জগন্নাথকে এমন ভূসম্পত্তি দিয়াছিলেন যে, আজিও মাহেশের রথের সমস্ত ব্যয় কৃষ্ণরাম বসুর প্রদত্ত সম্পত্তি হইতে সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই রথ উপলক্ষে আট দিন মেলা বসে এবং বিক্রেতা ও দর্শকে কত লক্ষ লোক যে কত দূর হইতে আসিয়া থাকে, তাহার সংখ্যা নাই।

১. প্রবাদবাক্য অবিকল রাখিবার জন্য অপভাষা ব্যবহারে বাধ্য। পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।

২. তিন ঠাঞি ভোগ বাড়াইল সম করি।
কৃষ্ণের ভোগ বাড়াইল ধাতুপাত্র পরি॥

৩. ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৬৬০ হইতে ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এক কোটী টাকার সূক্ষ্মবস্ত্র কেবল ঢাকা হইতে ইংলণ্ডে পাঠাইয়াছিলেন। তাহার পর তাঁহাদের বাঙ্গালার বস্ত্র ব্যবসায় ক্রমশঃ অধিকতর উন্নত হইয়াছিল। ১৭৮৫ সালে বিলাতের নটিংহাম নগরে প্রথম সূক্ষ্মবস্ত্রের কল হয়, তখনও হাতে বয়ন হইত। দুই বৎসর পরে বিলাতের তন্তুবায়েরা বৎসরে পাঁচ লক্ষ থান সূক্ষ্মবস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। সেই সময় ইংলণ্ডে স্বদেশী শিল্প উন্নতির জন্য ভারতবর্ষীয় বস্ত্রের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলন আরম্ভ হয়, তাহার ফলে পার্লামেণ্ট ভারতীয় তুলার বস্ত্রের উপর শতকরা ৭৫ টাকা শুল্ক নির্দ্ধারণ করেন। তদবধি ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায় কমিতে লাগিল, তত্রাচ ১৭৮৭ সালে ৩০ লক্ষ, ১৮০৭ সালে ৮ লক্ষ ৫০ হাজার এবং ১৮১৩ সালে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকার ঢাকাই বস্ত্র কোম্পানি লইয়া গিয়াছিলেন। এইরূপ অসুবিধা দেখিয়া শেষে ১৮১৭ সালে তাঁহাদে

ঢাকার কুঠী তুলিয়া দিয়াছেন। বিলাতের তন্তুবায়েরা তখন অতি সহজ কৌশলে এত রকম বস্ত্র ও সূত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল যে ১৮২১ সালে তাহারা প্রায় চারি কোটী টাকার এবং ১৮৩১ সালে প্রায় সাত কোটী টাকার কেবল সূত্র এদেশে পাঠাইয়াছিল। এই প্রতিযোগিতায় পিতামহীদিগের দুর্ব্বল হস্তনির্ম্মিত চরকার সূত্র কেবল ব্রাহ্মণের উপবীতের জন্যই প্রস্তুত হইত।

Old Records of India Office, p. 59.

৪. নবাবী আমলে হিন্দু প্রধান অমাত্যেরা খাঁ উপাধি পাইতেন, লোকে তাঁহাদিগকে খাঁ সাহেব বলিয়া সম্বোধন করিত।

৫. কুচবিহারের রাজা কান্তেশ্বর গুরুতর কারণে আপনার গুরুপুত্রের প্রতি এমন কুপিত হন যে তাহাকে হত্যা করিয়া তাহার মাংস রন্ধনপূর্ব্বক গুরুকে ভোজন করাইয়াছিলেন। গুরু, পুত্রের মাংস খাইলাম জানিতে পারিয়া মর্ম্মাহত চিত্তে একেবারে গৌড়নগরে আসিয়া নবাব হুসেন সার নিকট অভিযোগ করিলেন। নবাব ব্রাহ্মণের প্রতি বিনা দোষে পুত্রের মাংস ভোজন করান শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাঁহার প্রতি আন্তরিক সহানুভূতি করিয়া আপনার পুত্রকে সসৈন্যে কুচবিহার গিয়া রাজাকে বন্ধন করিয়া আনিতে আজ্ঞা করেন। কান্তেশ্বর এমন প্রবল নরপতি ছিলেন যে, তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাওয়া ত দূরের কথা, তিনি নবাব সৈন্যদিগকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করেন, তাহারা পলায়নপরায়ণ হইলে গৌড়ের প্রাচীর পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া প্রাচীরগাত্রে আপনার বিজয়-পতাকা স্থাপন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তিত হইয়াছিলেন।

৬. নবাব সায়দ হুসেন সাহ ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন, কবি জয়ানন্দ তাঁহার চৈতন্যমঙ্গলে ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বৈষ্ণবদিগের প্রচারবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। খড়দহের উল্লেখ এবং তথায় নিত্যানন্দের বাসস্থান নির্ম্মাণের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন, মাহেশ গ্রামেরও উল্লেখ আছে, কিন্তু বল্লভপুর বা রাধাবল্লভ অথবা খড়দার শ্যামসুন্দরের কোন উল্লেখ নাই। ১৫৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বীরভদ্র গোস্বামী বালক, অবশ্য যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে কখনই মক্কা-তীর্থ যাইতে সক্ষম হন নাই। আমাদের অনুমান হয়, জাহাঙ্গীর বাদসাহের সময় তিনিই দিল্লী হইতে উক্ত কৃষ্ণ প্রস্তর আনিয়া থাকিবেন। বড়বাজারের মল্লিক বংশের ইতিহাসে দেখা যায়, তাঁহাদের আদিপুরুষ সপ্তগ্রামবাসী বনমালী মল্লিকের পৌত্র কৃষ্ণদাস মল্লিক বল্লভপুরে রাধাবল্লভের মন্দির নির্ম্মাণ

করিয়া দিয়াছিলেন। এই কৃষ্ণদাস মল্লিক ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, কিছু-দিন পরে তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে পিতামহের মৃত্যুতে ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াছিলেন এবং ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাণত্যাগ করেন। জাহাঙ্গীর ১৬০৬ হইতে ২৬ খ্রীঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এই ২০ বৎসরের মধ্যে উপরোক্ত মূর্ত্তিগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়। এবং মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে প্রথমবারের মূর্ত্তিটী অত্যন্ত বৃহৎ হওয়ায় পরিত্যক্ত হয়, তাহাই বল্লভপুরে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ কৃষ্ণদাস মল্লিক ঐ স্থানের জঙ্গল কাটাইয়া মন্দির নির্ম্মাণ করেন এবং বল্লভপুর গ্রাম স্থাপন করিয়াছিলেন। শ্যামসুন্দর মূর্ত্তিটীই সর্ব্বশেষে নির্ম্মিত এবং সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর হইয়াছিল। যদি রুদ্ররাম পণ্ডিত প্রস্তর আনিয়া মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইতেন, তাহা হইলে তিনি পরম সুন্দর মূর্ত্তিটী আপনার তপোবনে স্থাপন না করিয়া খড়দহের বীরভদ্র গোস্বামীকে প্রদান করিলেন কেন। ইহাতে অনুমান হয়, বীরভদ্র গোস্বামীই প্রস্তর আনাইয়া মূর্ত্তি গঠন করাইয়া, প্রথমটী তাঁহার পছন্দ না হওয়ায় উহা রুদ্ররাম পণ্ডিতকে প্রদান করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস মল্লিকের পঞ্চম পুরুষ অর্থাৎ বৃদ্ধ প্রপৌত্র নিমাইচরণ মল্লিক, যিনি কলিকাতায় ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি পূর্ব্বপুরুষদের কীর্ত্তিটীর ভগ্নদশা দেখিয়া অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে আর একটী নূতন মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন।

৭. সেন্সস উপলক্ষে কলিকাতার যে ইতিহাস লেখা হইয়াছে, তাহাতে বড়বাজারকে অতি প্রাচীন বাজার বলিয়া বলা হইয়াছে। "শিবের একটী নাম বুড়া সেই বুড়ার বাজার বলিয়া পূর্ব্বে ইহার নাম ছিল, ক্রমে বড়বাজার হইয়াছে।" বাস্তবিক তাহা নহে, কৃষ্ণদাস মল্লিকের পৌত্র দর্পনারায়ণ মল্লিক মুসলমানদিগের উৎপীড়নের ভয়ে ত্রিবেণী হইতে ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ইংরাজ কোম্পানির সীমানার মধ্যে বাস করিতে চাহিলে, তাঁহাকে কলিকাতা গ্রামের মধ্যে বহুবিস্তীর্ণ একটী ভূখণ্ড প্রদত্ত হয়। তিনি দস্যুভয়ে সেই সমস্ত স্থান উচ্চ প্রাচীরে বেষ্টিত করিয়া তাহার মধ্যে আপনার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই দেয়াল দৃষ্টে কলিকাতার প্রবাদ আছে, "কায়েত মরে খেয়ালে, বেণে মরে দেয়ালে।" দর্পনারায়ণ মল্লিকের পুত্র নয়ানচাঁদ, তাঁহাকে কমলনয়ানও বলিত। কালে উক্ত বহুদূরব্যাপী প্রাচীরকে লোকে "কমলনয়ানের বেড়" বলিত। বেড় বলার কারণ এই যে, সে সময় বাঁধা রাস্তা অতি অল্পই ছিল, লোকে আবশ্যক মত অন্যের জমীর উপর দিয়া সুবিধামত

গমনাগমন করিত, কিন্তু নয়ানচাঁদের জমী প্রাচীরবেষ্টিত থাকায় সেখানে বহুদূর বেষ্টন করিয়া যাইতে লোকের বড় অসুবিধা হইত, তাই উহাকে রহস্যভাবে কমলনয়ানের বেড় বলিত। তখন বড়বাজার প্রতিষ্ঠিত হয় নাই; মুল্লুকচাঁদ ক্ষেত্রী (বাবু দামোদর দাস বর্ম্মার পূর্ব্বপুরুষ) মুরসিদাবাদ হইতে আসিয়া মল্লিকদের প্রতিবাসী হইয়া উভয়ে বড়বাজারের পত্তন করেন।

প্রাচীন আচার ব্যবহার

৫

চড়ক পর্ব্ব। চড়কের আমোদ অতি ভয়ানক। ঝুলঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপ বা বঁটিঝাঁপের কথা বলিতেছি না, বাণফোঁড়ার ব্যাপার স্মরণ করিলে বাঙ্গালীর দেবোদ্দেশে কষ্টসহিষ্ণুতার নিন্দা করিবার আর পথ থাকে না। রথ ও চড়ক, দুইটীই বৌদ্ধ পর্ব্ব বলিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা উল্লেখ করিতেছেন। রথ অবশ্য বৌদ্ধ পর্ব্ব, তাহার কোন সন্দেহ নাই, বুদ্ধদেব রথারোহণ করিয়া স্বীয় রাজধানীর পথে লোকের কষ্ট যন্ত্রণা মৃত্যু দেখিয়া তাঁহার বিবেক জাগ্রত হওয়ায় তিনি রাজসম্পদ ত্যাগ করিয়া জীবের দুঃখ নিবারণ উদ্দেশে তপস্যায় প্রবৃত্ত হন। সেই ঘটনার স্মৃতি জন্য বৌদ্ধেরা রথযাত্রা পর্ব্ব অবলম্বন করেন, ইতিহাসে তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, আজিও অনেক বৌদ্ধভূমে উহা মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। জগন্নাথদেবেরই রথযাত্রা হইয়া থাকে, ইহাতে রথ যে বৌদ্ধপর্ব্ব তাহা প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু চড়কের কোন বৌদ্ধ ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেবল তিব্বত প্রভৃতি বৌদ্ধদেশে চৈত্র মাসে দেব দানব সাজিয়া লোকে নৃত্যগীত কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি করায় ঐতিহাসিকেরা চড়কের বৌদ্ধত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। কিন্তু হিন্দুদিগের মধ্যে ইহা বাণরাজার শিব-তপস্যা বলিয়া কথিত হয়। মধ্যভারতের বেরারের মধ্যে বাণগঙ্গা ও পাণগঙ্গা নামে দুইটী সরিৎ একটী পর্ব্বততলে মিলিত হইয়া ক্রমে গোদাবরী নদীতে পতিত হইয়াছে। ঐ ক্ষুদ্র পর্ব্বতশৃঙ্গকে "খাউ" বলিয়া থাকে, উহা মাণিক দুর্গের কয়েক ক্রোশ উত্তর পশ্চিম এবং চান্দা নগরের কয়েক ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। সেই পর্ব্বতশৃঙ্গে বাণরাজা শিবের তুষ্টির জন্য তপস্যায় প্রবৃত্ত হন, এবং ক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর-ভাবে সাধনা করিয়াছিলেন। যথা—প্রথমে কেবল পূজায় অভীষ্টলাভ করিতে না পারিয়া একটী বৃক্ষের নিম্নে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া বৃক্ষশাখায় পদদ্বয় বন্ধন-পূর্ব্বক উক্ত অগ্নির উপর হেঁটমুণ্ডে ঝুলিতে লাগিলেন, শিবের কৃপায় ইহাতে তাঁহার প্রাণান্ত দূরে থাক কোন কষ্টই হইল না, অথচ অভীষ্টলাভ করিলেন না। ইহার অনুকরণের নাম ঝুলঝাঁপ। ইহা দিবাগমের পূর্ব্বে সম্পন্ন হয়। যাহারা বাণরাজার তপস্যার অনুকরণ করে, তাহাদিগকে সন্ন্যাসী বলে, ব্রাহ্মণেরা এই সন্ন্যাস করেন না।

বাণরাজা তৎপরে প্রাণত্যাগ করিবেন বলিয়া মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া পর্ব্বতশৃঙ্গ হইতে কণ্টকাদিপূর্ণ উপত্যকায় ঝম্প প্রদান করিলেন, শিবের কৃপায় মরিতে পারিলেন না, অভীষ্টও সিদ্ধ হইল না। ইহাই কাঁটাঝাঁপ। এই উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা বৈকালে স্নানান্তে বাদ্যভাণ্ডসহ নিকটস্থ জঙ্গল হইতে বঁইচি ফলের কণ্টকিত ঝাড়গুলি কাটিয়া আনে এবং একটী বাঁশের ভারা বাঁধিয়া তাহার সম্মুখে স্তূপাকারে রাখিয়া লাঠীর দ্বারা কাঁটাঝাড়গুলি এমন করিয়া পিটিতে থাকে যে, উপরের কণ্টকগুলি ভাঙ্গিয়া বা অধোমুখ হইয়া যায়, তৎপরে একে একে ভারার উপর হইতে মহাদেবের নামোচ্চারণ করিয়া সেই বঁইচির ঝাড়গুলির উপর পড়িতে থাকে।

বাণরাজা শিবের উদ্দেশ্যে প্রাণদানের জন্য তরবারি প্রভৃতি অস্ত্র পৃথিবীতে বিদ্ধ করিয়া বৃক্ষশাখা হইতে তদুপরি পতিত হইলেন, অথচ প্রাণ বাহির হইল না, অভীষ্টও অপূর্ণ রহিল। ইহার অনুকরণ বঁটিঝাঁপ, কাঁটাঝাঁপের পরদিন করিতে হয়, ঐ দিন অপরাহ্ণে সন্ন্যাসীরা স্নানান্তে কতকগুলি নূতন বঁটি (তাহাতে কিছুমাত্র ধার থাকে না) মাথায় করিয়া আনিয়া ঝাঁপের ভারার নিম্নে রক্ষা করে, একটা বৃহৎ থলিয়া খড়পূর্ণ করিয়া ঐ বঁটিগুলি সারি সারি তাহার উপর পাতিয়া জনকয়েক লোক থলিয়াটি ধরিয়া থাকে, সন্ন্যাসীরা ভারার উপর হইতে "মহাদেব" নাম উচ্চারণ করিয়া তদুপরি পতিত হয়। প্রায়ই দেখা যাইত, এক একজন পড়িবার পূর্ব্বেই বঁটিগুলি কাত হইয়া পড়িত। উপরোক্ত তিনটী ঝাঁপের পূর্ব্বে শিবের অনুমতি লইতে হইত। অনুমতি লওয়ার প্রথা এইরূপ, সন্ন্যাসীরা শিবের ঘরের সম্মুখে বসিয়া মাথা ঘুরাইতে থাকে, ইহাকে মাথাচালা বলে, সেই সময় পূজারী ব্রাহ্মণ ঘরের ভিতর শিবের মস্তকে ফুল গঙ্গাজল চড়াইতে থাকেন। যতক্ষণ না শিবের মাথার ফুল পড়িয়া যায়, ততক্ষণ সন্ন্যাসীরা প্রাণপণে মাথা চালিতে থাকে, এই প্রক্রিয়ায় কাহারও কাহারও মুখ দিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িত। লোকে বলিত, এই ব্যক্তি গোপনে সন্ন্যাস ভঙ্গ করিয়াছে। কোন কোন সন্ন্যাসী অচেতন হইয়া পড়িত, কেহবা অচেতন হইয়া নানাপ্রকার বকিতে আরম্ভ করিত। ইহার উপর শিবের ভর হইয়াছে বলিয়া সকলে তাহার পদধূলি লইত, মাথায় গঙ্গাজল দিত, এবং ভক্তি করিত। সে ব্যক্তি নানাপ্রকার ভূত ভবিষ্যতের কথা বলিয়া শ্রোতাদিগকে ত্রস্ত করিয়া দিত। অনেক পরিচিত পরিবারের ভবিষ্যৎ অমঙ্গল-বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে বর্ণন করিয়া সেই পরিবারের প্রতি দেবাভিশাপের ভয়

দেখাইত, কখন বা মূল সন্ন্যাসীর কখন বা যে বাবুর চড়ক, সেই বাবুর দোষের কথা তুলিয়া তাহার সর্ব্বনাশের পূর্ব্বাভাস প্রকাশ করিত। তখন সন্ন্যাসীদল বাবুর নিকটস্থ হইয়া, কখন বা তাঁহাকে ধরিয়া কখন বা কৃত্রিম বন্ধন করিয়া শিবের সম্মুখে উপস্থিত করিত। বাবু উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক আত্ম-অপরাধের জন্য বিবিধ স্তুতি মিনতি করিতেন; দণ্ড স্বীকার করিলে শিবের মাথা হইতে ফুল পড়িত। তখন সন্ন্যাসীরা বাদ্যসহ নৃত্য করিতে করিতে "তারকেশ্বরের শিবো মহাদেব" বলিয়া চীৎকার করিয়া ঝাঁপের নিকট উপস্থিত হইত।

কঠোর সাধক বাণরাজা নিরস্ত না হইয়া উন্মত্তের ন্যায় আপনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বাণ দ্বারা বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। শেষে পৃষ্ঠদেশে বাণ বিদ্ধ করিয়া উহা বৃক্ষ-শাখায় বান্ধিয়া ঝুলিতে লাগিলেন, তখন সদাশিব সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অভীষ্ট বর দান করিয়াছিলেন।

কলিকাতার সন্ন্যাসীরা অতিপ্রত্যুষে কালীঘাটে গিয়া বাণ ফুঁড়িয়া আসিত। অন্যান্য কালীস্থানেও বাণ ফোঁড়ার রীতি প্রচলিত ছিল। আমরা হুগলকুড়িয়ার বাবু শিবচন্দ্র গুহের কালীবাড়ীতে একটি লোকের জিহ্বা ফুঁড়িতে দেখিয়াছিলাম। একদল সন্ন্যাসী আসিয়া উক্ত কালীবাড়ীতে উপস্থিত হইলে চারিদিক বাদ্যভাণ্ডে পূর্ণ হইল, একজন ব্রাহ্মণ Scrachর মত একখানি অস্ত্র আনিয়া জনৈক সন্ন্যাসীর জিহ্বাখানি টানিয়া ধরিয়া তাহার মধ্যস্থলে বিদ্ধ করিয়া দিল। সন্ন্যাসী থুথুর মত খানিকটা শোণিত ফেলিয়া দিয়া, অগ্রভাগ সূক্ষ্ম মূলভাগ এক ইঞ্চি অপেক্ষাও স্থূল ৪।৫ হস্ত দীর্ঘ একটি লৌহশলাকা তন্মধ্যে প্রবেশ করাইয়া নৃত্য করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে প্রায় প্রতি পল্লীতে এবং প্রত্যেক বাজারে গাজন হইত। এই সকল গাজনের দল কালীঘাট হইতে বাহির হইয়া সহরের পথে পথে, ভদ্রলোকের গৃহে গৃহে, প্রত্যেক ঠাকুরবাড়ী ও শিবমন্দিরের সম্মুখে নৃত্য করিত। ঢাক ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র, অন্যান্য বাদ্যও থাকিত। দুইটী বালককে হরগৌরী সাজান হইত, তাহাদের সঙ্গে কয়েকটী ভূত এবং অন্যান্য অনেক সং সাজাইয়া পথে রঙ্গভঙ্গ করিত। তন্মধ্যে জেলেপাড়া ও কাঁসারীপাড়ার সং দেখিবার জন্য চিৎপুর রোড ও যে যে পথ দিয়া তাহারা প্রতি বৎসর যাইত, সেই সকল রাস্তা লোকে লোকারণ্য হইত। প্রত্যেক গৃহের ছাদ বা রাস্তা ও জানালায় তিলার্দ্ধ স্থান থাকিত না। ইহার মধ্যে অশ্লীল সং, সঙ্গীত, অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গী যথেষ্ট

থাকিত। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, যদিও তখন বাণ ফোঁড়া প্রচলিত ছিল না, তত্রাচ কাঁসারীপাড়ার বাবু তারকনাথ প্রামাণিকের উৎসাহে কাঁসারীরা মহা উৎসাহে সঙের মিছিল বাহির করিত। সেই সময় মহাত্মা বাবু কেশবচন্দ্র সেনের যত্নে কলিকাতার অনেকগুলি কৃতবিদ্য লোক ও খ্রীষ্টান পাদরী একটি অশ্লীলতানিবারণী সভা প্রতিষ্ঠিত করেন; এই সভার অনুরোধে গবর্ণমেণ্ট প্রকাশ্য পথে অশ্লীল সঙ্গীতাদি নিবারণোদ্দেশে দণ্ডবিধির প্রচার করায় ঐ মিছিল বন্ধ হইয়া যায়। দুঃখের বিষয়, অমৃতবাজার পত্রিকার ন্যায় সংবাদপত্র এই সভাকে বিদ্রূপ করিতে ছাড়েন নাই।

গাজনের সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে হাড়ী, মুচি, বাগদী প্রভৃতি ইতরজাতীয় লোকেরাই বাণ ফুঁড়িত, উপবীতের ন্যায় একগোছা সূতা গলায় পরিধান করিত, সে সময় তাহাদের সম্মান দেখে কে, ব্রাহ্মণ ভিন্ন শূদ্রেরা তাহাদিগকে প্রণাম করিত; এমন কি, অনেকে মূল সন্ন্যাসীর পদধূলিও গ্রহণ করিত। অতি আদরের সহিত তাহাদিগকে ভোজন করাইত। তাহারা লৌহশলাকা ভিন্ন বাহুতে ছিপ, বাঁশ পূরিয়া নৃত্য করিত, কোন কোন সন্ন্যাসীকে ক্ষতছিদ্রে সর্প পূরিয়া রাখিতেও দেখা গিয়াছে। উদরের উভয় পার্শ্বে ছিদ্র করিয়া দুইটী ত্রিশূলাকৃতি ক্ষুদ্র বাণ বিদ্ধ করিয়া অগ্রভাগে ঘৃতসিক্ত বস্ত্রখণ্ড জড়াইয়া অগ্নিসংযোগ করিয়া মধ্যে মধ্যে ধূনা প্রজ্জ্বলিত করা হইত, ইহাকে দশলকি বাণ বলিত। এই বাণ বালক সন্ন্যাসীরা ফুঁড়িত। দুইগাছি দড়ির উভয় মুখ দুইজন লোকে ধরিয়া থাকিত, একদল বালক সন্ন্যাসী আপনাদিগের উদরের উভয় পার্শ্ব বিদ্ধ করিয়া তন্মধ্যে উক্ত রজ্জু প্রবেশ করাইয়া সারি বাঁধিয়া নৃত্য করিত। কণ্ঠনলির সম্মুখের চর্ম্ম ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে তরবারি বা ছোরা বিদ্ধ করিয়া রাখিত।

শেষদিনে চড়ক। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট আইন করিয়া বাণফোঁড়া বন্ধ করায় চড়ক অগত্যা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, তবুও দুই এক স্থানে বাণ না ফুঁড়িয়া যতদূর হইতে পারে, তাহা হয়। তন্মধ্যে ফরিদপুর জেলায় কোটালীপাড়া এবং কলিকাতায় সাতুবাবুর মাঠে চড়কগাছে ঘুরান হয় দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে যে যে সন্ন্যাসী চড়কগাছে ঘুরিত, তাহাদের পৃষ্ঠে দুইটী মোটা মোটা বঁড়শী বিদ্ধ করিয়া রজ্জুযোগে তুলিয়া পাক দেওয়া হইত। সে সময় তাঁহার কষ্টের কথা বর্ণনাতীত, কিন্তু সে ব্যক্তি কোনপ্রকার কষ্ট প্রকাশ করা দূরে থাকুক, নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গী, নৃত্য ও ব্যঙ্গ পরিহাস করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিত। সেইজন্য

"চড়কীর হাসি" প্রবাদবাক্যে পরিণত হইয়াছে। পিঠের চামড়া ছিঁড়িয়া সময়ে সময়ে সন্ন্যাসী পড়িয়া মারা যাইত। ম্যাজিষ্ট্রেটগণ, ঐরূপ মৃত্যু নিবারণ জন্য পৃষ্ঠের ছিদ্রের উপর একখানি গামছা বাঁধিয়া চড়কগাছে তুলিবার নিয়ম করায় অনেক উপকার হইয়াছিল, কিন্তু এই বীভৎস ব্যাপারে কত সন্ন্যাসী যে শেষে ধনুষ্টংকার রোগে মারা যাইত, তাহার সংখ্যা নাই।

বাগুয়া বাজার অর্থাৎ বাগবাজারের ষোলচড়কী কলিকাতায় সর্ব্বপ্রধান বিখ্যাত চড়ক ছিল, বাগবাজার ষ্ট্রীটের এখন যেখানে মৃত বাবু নন্দলাল বসুর বাটী, তাহার দক্ষিণ-পূর্ব্ব কোণে এই চড়ক হইত। ইহাতে চড়কগাছের গাত্রে উপর উপর করিয়া চারিটী মাচান বাঁধিয়া সর্ব্বোচ্চ মাচানের মধ্যস্থলে একজনকে মহাদেব সাজাইয়া বসান হইত, আর প্রত্যেক মাচানের প্রত্যেক কোণে একজন করিয়া ১৬জন লোকের পিঠ ফুঁড়িয়া ঝুলাইয়া দিয়া ঘুরান হইত। কিন্তু দু-চড়কীগুলি যেমন বেগে ঘুরিত, ১৬ চড়কী তেমন ঘুরিত না। এই চড়কগাছটী সম্বৎসর পেরিংস্ উদ্যানের বৃহৎ পুষ্করিণীতে নিক্ষিপ্ত থাকিত। গত ১৩০৯ সালের জ্যৈষ্ঠমাসের "নব্যভারতের" ৭৭ পৃষ্ঠায় ইহার বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ইহা রামধন ঘোষের চড়ক, অনুমান ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে এই চড়ক বন্ধ হইয়াছে।

ঘেঁটুপূজা। এখনও বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে ঘেঁটুপূজা হইয়া থাকে। এটী বড় চমৎকার পূজা, ইহার পদ্ধতি এইরূপ :—ফাল্গুন মাসের সংক্রান্তির প্রাতঃকালে বাটীর গৃহিণী বা অপর কোন বয়স্থা মহিলা বাসী মুখে বাসী কাপড়ে একটা ভাঙ্গা কাল হাঁড়ি সদরদ্বারের বাহিরে উবুড় করিয়া পাতিয়া তাহার উপর এক ড্যালা গোবর, একটু সিন্দুর, পাঁচ কড়া কাণা কড়ি, একটু ছেঁড়া চুল, অত্যল্প সিদ্ধ চাউল এবং ভাট ফুল (ঘেঁটু ফুলও বলিয়া থাকে) দিয়া পূজা করিতে হয়। পূজাও বাম হস্তে করিবার নিয়ম। প্রণামের পরিবর্ত্তে বালকেরা এই হাঁড়ির উপর লগুড়াঘাত করিয়া থাকে। পরে সেই ভাঙ্গা হাঁড়ির একটু খাপরা এবং পাঁচ কড়া কাণা কড়ির সহিত গোবরটুকু পূজাকারিণী গৃহে লইয়া গিয়া খাপরার কালী দ্বারা বালক বালিকা ও শিশুদিগের চক্ষে অঞ্জন লেপন করিয়া গোবরটুকু দ্বারের উপরের চৌকাঠে লাগাইয়া তাহাতে কড়ি পাঁচটী বসাইয়া দেন।

ঘেঁটুপূজার ইতিহাস এইরূপ। মেধার গর্ভজাত মঙ্গলের পুত্র ঘণ্টেশ্বর অভিশপ্ত হইয়া নররূপে উজ্জয়িনী নগরে জন্মগ্রহণ করিয়া বিক্রমাদিত্যের প্রধান পণ্ডিত হইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন, কিন্তু শিব তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন না। ইহাতে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, মুখে আর শিবনাম উচ্চারণ

করিব না, কর্ণে আর শিবনাম শুনিব না। কিন্তু মুখে বলা না বলা তাঁহার সাধ্যায়ত্ত হইলেও অপরে বলিলে কর্ণে নিশ্চয় শুনিতে হইবে, সুতরাং তিনি দুই কর্ণে কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধিয়া রাখিলেন। কেহ শিবনাম উচ্চারণ করিতেছে বুঝিলেই মাথা নাড়িতেন এবং ঘণ্টাগুলি বাজিত। তিনি মহাপণ্ডিত ছিলেন. বিক্রমাদিত্যের সভাকে পরাজয় করিতে অগ্রসর হইলেন, কালিদাস ব্যতীত আর সকলেই পরাস্ত হইলেন, এইবার কালিদাসের পালা, তিনি কৌশল করিয়া বলিলেন, আচ্ছা আমি আপনার সহিত বিচার করিতে পারি, যদি আপনি একটী শিবস্তোত্র রচনা করিয়া শুনাইতে পারেন। তখন ঘণ্টাকর্ণ শিবনাম ব্যতীত এমন চমৎকার একটী স্তোত্র রচনা করেন যে, সমস্ত সভাসদ চমৎকৃত হইলেন, কালিদাস বিনা বিচারে পরাভব স্বীকার করিলেন।

কর্ণে ঘণ্টা বাঁধার জন্য ইঁহার ঘণ্টাকর্ণ নাম হয়। এবং শিবনাম ত্যাগ করায় লোকে তাঁহাকে শিববৈরী বলিত, ঘৃণার সহিত সকল প্রকার চর্ম্মরোগের অধিষ্ঠাতৃ দেবতা করিয়া পূজার ব্যপদেশে অপমান করিবার প্রথা প্রচলিত হয়। কিন্তু "তীর্থাদিতত্ত্ব" গ্রন্থে লিখিত আছে, ইনি মহাদেবের একজন প্রিয় অনুচর, মীন সংক্রান্তিতে সুহীবৃক্ষতলে ইঁহার পূজা করিতে হয়। মন্ত্র যথা :—

ঘণ্টাকর্ণ মহাবীর সর্ব্বব্যাধি বিনাশন
বিস্ফোটক ভয়প্রাপ্তে রক্ষ রক্ষ মহাবল ॥

ঘেঁটুপূজাও পূর্ব্বে এখনকার মত সামান্য ভাবে হইত না, ইহার কয়েকদিন পূর্ব্ব হইতে কর্ত্তারা নানাপ্রকার বাদ্যসহ পথে পথে রঙ্গভঙ্গের সহিত গীতবাদ্য করিতেন, ফাল্গুন সংক্রান্তির প্রাতে বড় বড় জালা গামলা প্রভৃতি দ্বারা আড়ম্বর ও রহস্যসহ পূজা সমাপ্ত হইত। প্রণাম অর্থাৎ লগুড়াঘাতের সময় কে আগে লগুড়াঘাত করিবে, তাহা লইয়া বল পরীক্ষা হইত, যে সকলকে পরাস্ত করিতে পারিত, সেই অগ্রে লগুড়াঘাতের অধিকার পাইত।

পরিশিষ্ট

কলিকাতার ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

সূচনা — কলিকাতার প্রাচীনত্ব — আইন-ই- আকবরীতে কলিকাতার উল্লেখ — কালীক্ষেত্র —পুরাণে উল্লেখ—প্রাচীন কলিকাতার বিস্তৃতি—পীঠস্থান ও তীর্থ—বল্লালসেনের সময়ে কলিকাতার অবস্থা—মুসলমান কর্ত্তৃক বাঙ্গালা বিজয়—আজম্-উল্-মুলুক—সম্রাট আকবর—তোড়রমল্ল—আকবরের সময়ে কলিকাতার অবস্থা—সুন্দরবনের উৎপত্তি—কলিকাতার ভগ্নদশা।

আমরা এক্ষণে কলিকাতার যেরূপ অবস্থা দেখিতে পাই, দুইশত বৎসর পূর্ব্বে ইহার এ সকল কিছুই ছিল না। দুইশত বৎসরই বা বলি কেন? দশ বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার যে অবস্থা ছিল, আজিকার দিনে তাহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। কলিকাতার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ক্রমেই বাড়িতেছে।

যদিও বর্ত্তমান কলিকাতা নগর বহুদিনের নয়, কিন্তু এই স্থান বহুদিন হইতে এই নামে পরিচিত। আইন-ই-আকবরীতে এই স্থান এই নামেই উক্ত হইয়াছে। আইন-ই-আকবরীতে কলিকাতাকে সাতগাঁও-(সপ্তগ্রাম)-সরকার-ভুক্ত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে[১]। এই গ্রন্থ সম্রাট আকবরের প্রধান মন্ত্রী বিখ্যাত পণ্ডিত ও যোদ্ধা আবু-উল্-ফজ্‌ল্ কর্ত্তৃক রচিত হয়। সুতরাং আকবরের সময়ে কলিকাতার অবস্থা নিতান্ত মন্দ ছিল না।

কিন্তু আকবরের সময়ে কলিকাতার যেরূপ উন্নত অবস্থা দেখিতে পাই, সেরূপ উন্নত অবস্থা কালসাপেক্ষ। সুতরাং আরও প্রাচীনকালে কলিকাতার কথা অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। আইন-ই-আকবরীর পূর্ব্বের অন্য কোন গ্রন্থে কলিকাতার উল্লেখ দেখা যায় না, কিন্তু এক্ষণে যে স্থানে কলিকাতা অবস্থিত, ঐ স্থানে কালীক্ষেত্র নামে কোন স্থানের উল্লেখ দেখা যায়। প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধায়ী কোন কোন পণ্ডিত বলেন পুরাণাদিতে এই স্থানের উল্লেখ আছে। কালীক্ষেত্র একটি বিখ্যাত পীঠস্থান। পুরাণপ্রসিদ্ধ একান্ন মহাপীঠের একটি মহাপীঠ। 'প্রাচীন পীঠের উপর কালীর মন্দির নির্ম্মিত নহে'[২]। কালীক্ষেত্র বহুলা নামক স্থান হইতে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। বহুলা অধুনা বেহালা নামে পরিচিত, দক্ষিণেশ্বর আজিও আছে[৩]।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এই স্থান

অতি প্রাচীন এবং পূর্ব্বাপর একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান বলিয়া পরিচিত। ইংরাজাধিকারের সূচনা হইতেই কালীক্ষেত্রের সীমা সঙ্কুচিত হইয়া আধুনিক কালীঘাটে পরিণত হইলেও, উহা আজিও তীর্থ বলিয়া বিশেষ পরিচিত। কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের ন্যায় এই স্থানের অন্য কোন প্রাচীন বিশেষ বিবরণ জানিবার উপায় নাই।

তৎপরে একেবারে বল্লালসেনের সময়ে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়[৪]। সে সময়ে ইহা একটি সুসমৃদ্ধ সহর। তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে এখানে অসংখ্য যাত্রীর সমাবেশ হইত।

আইন-ই-আকবরীতে লিখিত আছে বল্লালসেন খ্রীঃ ১০৬৬ অব্দে রাজা হন। তিনি দেশহিতকর নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া প্রায় ৩০ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ ১২০৩ অব্দে বাঙ্গালাদেশ মুসলমান কর্ত্তৃক বিজিত হইলেও এই স্থান প্রায় আরও শতবৎসরকাল স্বাধীন হিন্দু রাজার অধীন ছিল।

বঙ্গদেশ দিল্লীর অধীন হইলে, ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রদেশে বিভক্ত হইয়া, ভিন্ন ভিন্ন শাসনকর্ত্তা দ্বারা শাসিত হইত। সপ্তগ্রাম ঐ সকল প্রদেশের একটি। এ অঞ্চল মুসলমানাধিকৃত হইলেই, সপ্তগ্রাম একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ হয়, কলিকাতা প্রভৃতি স্থান সম্ভবতঃ সপ্তগ্রাম প্রদেশেরই অন্তর্গত ছিল। সম্রাট মহম্মদ তোগলক যে সময় দিল্লীর সিংহাসনে, আজম-উল্-মুল্ক্ সে সময় সপ্তগ্রাম শাসন করিতেছিলেন। এসময়ে বঙ্গের শাসনকর্ত্তারা কেবল মুখে দিল্লীর শাসন স্বীকার করিতেন, কিন্তু কার্য্যে প্রায় স্বাধীন ছিলেন।

কিন্তু এ সময়েও কলিকাতার বিবরণ কিছু জানিবার উপায় নাই। তৎপরে সম্রাট আকবরের সময়ে আবার কলিকাতার কথা দেখা যায়।

জেলাল-উদ্দীন মহম্মদ আকবর সাহ খ্রীঃ ১৫৫৬ অব্দ হইতে ১৬০৫ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ শাসন করেন। খ্রীঃ ১৫৪২ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ইনি মানসিংহ, তোডরমল প্রভৃতির সাহায্যে উচ্ছৃঙ্খল বঙ্গদেশ স্বকরতলগত করিয়াছিলেন।

তোডরমল আকবরের সাম্রাজ্যের একটি রাজস্ব-হিসাব প্রস্তুত করেন। উহা "ওয়াশিল তুমার জমা" নামে বিখ্যাত। তাহাতে মোগল সাম্রাজ্য অষ্টাদশ সুবায় বিভক্ত করা হইয়াছে। বঙ্গদেশ ঐ ১৮ সুবার একটি। বঙ্গ আবার ১৮ সরকারে ও ৬৮২ মহলে বিভক্ত। এ দেশের রাজস্ব ১,০৬,৮৫,৯৪৪ টাকা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সাতগাঁও বা সপ্তগ্রাম ঐ আঠার সরকারের একটি এবং কলিকাতা

একটি মহল ছিল। খ্রীঃ ১৫৮২ অব্দে ঐ হিসাব প্রস্তুত হয়।

কিন্তু আকবরের সময়েই কলিকাতা অঞ্চলের দুর্দ্দশার দিন উপস্থিত হইয়াছিল। "১৫৮৫ অব্দে বেলা প্রায় তিন ঘটিকার সময় ভয়ানক ঝড় ও সমুদ্রের আক্রমণে দক্ষিণদিক নষ্ট হইয়া যায়। প্রায় দুই লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল। একটি মন্দির অবলম্বন করিয়া কতকগুলি লোক রক্ষা পায়। তৎপরে ঘোর ভূমিকম্প হইয়াছিল। গঙ্গার অসংখ্য শাখার বেগ পরিবর্ত্তিত হইয়া অনেক স্থান নষ্ট হইয়া যায়। তদবধি দক্ষিণদেশ ক্রমশঃ অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিল। যে দুই একজন অধিবাসী ছিল, তাহারাও মগদিগের উৎপাতে বাসস্থান পরিত্যাগ করে। প্রায় দুইশত বৎসর হইল সুন্দরবন সম্পূর্ণরূপে অরণ্য হইয়াছে।" এই সুন্দরবন কলিকাতার কতক অংশ গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল।

এই সময় হইতে কলিকাতার আবার ভগ্নদশা হয়। কালীঘাটের সন্নিকটের অবস্থা কতক ভাল ছিল বটে, কিন্তু সুন্দরবনের নিকটে সামান্য গ্রামের আকারে ঐ সকল স্থান অবস্থিত ছিল মাত্র। ঐ স্থানে দুই চারি ঘর অল্পবিত্ত কৃষকের কুটির ব্যতীত অন্য কিছু প্রায়ই দৃষ্ট হইত না। খ্রীঃ ১৬৪৮ অব্দের পর পর্য্যন্তও কলিকাতার সেই দশা ছিল, পরে ইংরাজেরা এই স্থান স্বায়ত্ত করিবার পর হইতেই ইহার উন্নতির দশা হইয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি—বঙ্গদেশে কোম্পানির প্রতিপত্তির সংক্ষেপ বিবরণ—কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা—সম্রাট ঔরঙ্গজেব প্রদত্ত সনন্দ—হেজেস সাহেব—বেহারের বিদ্রোহ—ইংরাজদিগের প্রতি সুবাদারের সন্দেহ—জব চার্ণক—কাপ্তেন নিকলসন—ফৌজদারের সহিত বিবাদ—হুগলী আক্রমণ—সুবাদারের ক্রোধ ও পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাসীমবাজারের কুঠি অধিকার—ইংরাজের বিপক্ষে সৈন্য প্রেরণ—ইংরাজগণের সুতানুটীতে পলায়ন—হিজলীতে পলায়ন ও দুর্দ্দশা—সুবাদারের সহিত সন্ধি—কাপ্তেন হিথ—মক্কাযাত্রীদের উপর উৎপাত—সম্রাটের আদেশ—ইংরাজগণের বঙ্গে পুনরাগমন—কলিকাতার সূত্রপাত—চাণক স্থাপন—চার্ণকের মৃত্যু—কলিকাতা প্রভৃতির অবস্থা।

কলিকাতার উন্নতির কথা বলিবার আগে, যাঁহাদের হইতে এই উন্নতি, তাঁহাদের বঙ্গদেশে আগমনের কথা এইখানে সংক্ষেপে বলা উচিত।

"মহারাণী এলিজাবেথের রাজত্বকালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নামে একদল ইংরেজ বণিক ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন (১৬০০)। ১৬১১ অব্দে তাঁহাদিগের বাণিজ্যতরী পিপ্লী পর্যান্ত আইসে। যখন ইব্রাহিম খাঁ বাঙ্গালার ও আফজুল খাঁ বেহারের সুবাদার ছিলেন, সেই সময়ে তাঁহারা এক বৎসরের জন্য পাটনায় কুঠী করেন(১৬২০)। অনন্তর (১৬৩৪) তাঁহারা সম্রাটের নিকট পিপ্লীতে কুঠী করিবার আদেশ পান। একদা সাহজাহান বাদসাহের একটী কন্যার কাপড়ে আগুণ লাগিয়া তাঁহার দেহ দগ্ধ হয়, বৌটন নামক একজন ইংরেজের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্যলাভ ঘটে এবং সম্রাট পুরস্কার দিতে চাহিলে বৌটন প্রার্থনা করেন যে, ইংরেজেরা যেন বাঙ্গালায় নিষ্করে বাণিজ্য করিতে পারেন (১৬৩৪)। বাদসাহ এই মর্ম্মের আদেশপত্র দিলে, বৌটন তৎসহ এদেশে আসেন, এবং সুজার অন্তঃপুরবাসিনী কামিনীবিশেষের পীড়া শান্তি করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনের সুবিধা পান (১৬৩৯)। এই সময় হইতে ইংরেজেরা সুজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন, হুগলী ও বালেশ্বরে কুঠী নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি পাইলেন এবং বিনা করে বাণিজ্য দ্রব্যজাত আমদানী রপ্তানী করিতে লাগিলেন।"[৫]

এইরূপে বঙ্গদেশে ইংরাজের ব্যবসায় বাণিজ্য বেশ চলিতেছিল। কিন্তু এখনও তাঁহারা কলিকাতায় পদার্পণ করেন নাই। মহারাষ্ট্রীয়দের উৎপাতে, মুসলমান সুবাদারের ফৌজদার প্রভৃতির উৎপাতে দুই দশজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অনেক মধ্যবিত্ত লোক নিরাপদ হইবার জন্য কলিকাতার সন্নিহিত প্রদেশে, এমন কি সুন্দরবনের মধ্যেও আশ্রয় লইতে কুণ্ঠিত হন নাই।

এই সময়ে সম্রাট ঔরঙ্গজেব দিল্লীর সম্রাট। ইংরাজেরা খ্রীঃ ১৬৭৪ অব্দে তাঁহার নিকট হইতে এক সনন্দ প্রাপ্ত হন, তাহাতে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিবার করস্বরূপ তাঁহাদিগকে বার্ষিক ৩০০০ টাকা হইবে এইরূপ নির্দ্দিষ্ট থাকে। এই সময়ে হুগলী, পাটনা, ঢাকা ও কাশীমবাজারে ইংরাজদিগের কুঠী ছিল। কুঠী-সমূহের শাসনকর্ত্তা হুগলীতে থাকিতেন। খ্রীঃ ১৬৮১ অব্দে কোম্পানির ডিরেক্টরগণ হেজেস সাহেবকে বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের শাসনকর্ত্তা করিয়া পাঠান।

খ্রীঃ ১৬৮২ অব্দে বেহারে একটি বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহীরা ইংরাজদিগের কোন অনিষ্ট করে নাই, ইহাতে সুবাদার, ইংরাজেরা বিদ্রোহে লিপ্ত আছেন

মনে করিয়া, সে বৎসর তাঁহাদের বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দেন। খ্রীঃ ১৬৮৫ অব্দে ইংরাজেরা সুবাদার সায়েস্তা খাঁর নিকট ভাগীরথী মোহানায় একটি দুর্গ স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা করেন। সুবাদার তাহাতে আরও অসন্তুষ্ট হন। ফল এই হইল, দুর্গ স্থাপনের অনুমতি দেওয়া দূরে থাকুক, সুবাদার ইংরাজদের নিকট নির্দ্দিষ্ট মাশুল বর্দ্ধিত করিয়া দিতে ইচ্ছা করেন।

এই সময়ে জব চার্ণক[৬] কুঠীসমূহের শাসনকর্ত্তা হইয়া হুগলীতে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সুবাদারের আদেশে ক্রুদ্ধ হইয়া ইংলণ্ডে সংবাদ পাঠাইলেন। খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দে কাপ্তেন নিকল্‌সন দশখানি রণতরী ও কতকগুলি সৈন্য লইয়া ভাগীরথীর মোহানায় আসিয়া উপস্থিত হন। কাপ্তেন সাহেবের উপর চট্টগ্রাম আক্রমণের আদেশ ছিল।

এই সময়ে ফৌজদারের কয়েকজন মুসলমান সিপাহীর সহিত ইংরাজ সৈনিকের বিবাদ হয়। তাহাতে ইংরাজেরা হুগলী নগরে গোলাবর্ষণ করেন। ফল এই হইল সুবাদার পাটনা, মালদহ, ঢাকা ও কাশীমবাজারের কুঠীগুলি অধিকার করিলেন এবং ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে বিপুল সৈন্য প্রেরণ করিলেন। চার্ণক বিপদ বুঝিয়া স্বীয় দলবল লইয়া সুতানুটীতে পলায়ন করিলেন (খ্রীঃ ১৬৮৬ অব্দ ২০এ ডিসেম্বর)। ইহাকেই বর্ত্তমান কলিকাতার প্রথম সূত্রপাত বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এখানে আসিয়াও তাঁহারা নিরাপদ হইলেন না। সুবাদারের সৈন্য এখানেও তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিল। চার্ণক তখন নিরুপায় হইয়া হিজলীতে পলায়ন করিলেন। এখানে আসিয়া তিনি ডিরেক্টরগণের নিকট সংবাদ পাঠাইলেন। তিনমাসকাল তাঁহাকে এখানে থাকিতে হইয়াছিল। এই অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার অনুচরগণের অর্দ্ধাধিক নষ্ট হয়। এইরূপ বিপদে পড়িয়া চার্ণক সুবাদারের সহিত সন্ধি করিয়া আবার সুতানুটীতে পুনরাগমন করেন।

এদিকে ডিরেক্টরগণের আদেশে কাপ্তেন হিথ তাঁহাদের সাহায্যার্থ আগমন করেন। তিনি সুবাদারের সহিত সন্ধি বিচ্ছিন্ন করিয়া সকলকে লইয়া মান্দ্রাজে প্রস্থান করেন। পথে তাঁহারা বালেশ্বর নগর লুণ্ঠন করিয়াছিলেন (১৬৮৮)।

বাঙ্গালায় বাণিজ্য বন্ধ হইলে, ইংরাজেরা জলপথে মক্কাযাত্রীদিগের উপর পীড়ন আরম্ভ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য তাঁহাদিগকে পুনরায় বঙ্গদেশে বাণিজ্য করিবার অধিকার প্রদান করেন, চার্ণক

পুনরায় স্বীয় দলবল লইয়া বঙ্গে আসিলেন। এবার সূতানুটীতেই তাঁহারা কুঠী স্থাপন করিলেন (খ্রীঃ ১৬৯০ অব্দ ২৪ এ আগষ্ট)। এই হইতেই কলিকাতা নগরের যথার্থ সূত্রপাত হইল।

চার্ণক অতুল সাহসী ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি যে স্থানে নিজের থাকিবার বাঙ্গালা করেন, সেই স্থান এক্ষণে চাণক (বারাকপুর) নামে প্রসিদ্ধ। এখানে ইংরাজদের ক্রয় বিক্রয়ের সুবিধার জন্য বাজার বসিত। ১৬৯২ অব্দে চার্ণকের মৃত্যু হয়।

এই সময়ে কলিকাতার পূর্ব্ব তীরবর্ত্তী স্থানসকলে বহুলোকের বাস হইয়াছিল। লোকে মহারাষ্ট্রীয় (বর্গী) গণের উৎপাত হইতে নিস্তার পাইবার জন্য দলে দলে এ সকল স্থানে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করে। এইরূপে এ প্রদেশের অবস্থা ক্রমে আবার উন্নত হইতে আরম্ভ হয়। কিন্তু তখনও স্থানে স্থানে দুর্গম অরণ্য এবং তাহাতে ব্যাঘ্রাদির ভয় ছিল। এখন যে স্থানকে বৈঠকখানা বলে, ঐ অঞ্চলের কোন স্থানে একটি প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ ছিল। বণিকেরা দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যপথে নানা স্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া ঐ বৃক্ষতলে বিশ্রাম করিত, পরে যে যথায় ইচ্ছা ক্রয় বিক্রয় করিয়া আবার ফিরিয়া যাইবার পূর্ব্বে ঐ স্থানে আসিয়া মিলিত হইত। এরূপ কথিত আছে, তাহারা আমোদ করিয়া ঐ বৃক্ষ-তলকে তাহাদের বৈঠকখানা বলিত, তাহা হইতেই ঐ স্থানের নাম বৈঠকখানা হইয়াছে।[৭] এই বৃক্ষ খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান ছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মহারাষ্ট্রদেশ—তাহার প্রাচীন ইতিহাস—শিবজী—চৌথ ও সর্দেশমুখী—শিবজীর মৃত্যু—গঙ্গার পূর্ব্বপারে জনপদ বৃদ্ধি—শোভাসিংহের বিদ্রোহ—ফোর্ট উইলিয়ম—হুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয়—প্রাচীন দুর্গের অবস্থিতির স্থান—নূতন কোম্পানি—নূতন পুরাতনে মিলন—মুর্শিদকুলি খাঁ—ডাক্তার হামিল্টন—নূতন সনন্দ—প্রথম গির্জা—খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দ—ডাক্তার হামিল্টনের মৃত্যু—কলিকাতার তাৎকালিক অবস্থা।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের শেষে লিখিত হইয়াছে বর্গীদিগের উৎপাতে লোকে ভাগী-রথীর পূর্ব্বতীরে আসিয়া বাস করিত, এক্ষণে এই বর্গী কাহারা, কি জন্য তাহারা এদেশে এরূপ উৎপাত করিত তাহার সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে। কেন না, কলিকাতার ইতিহাসে তাহাদের বিষয় অনেকবার উল্লিখিত হইবে।

বর্গীদিগের (মারহাট্টা) নিবাসভূমি মহারাষ্ট্র দেশ। ইহার উত্তর সীমা সাতপুর পর্ব্বতমালা, পশ্চিম সীমা ভারত সাগর, পূর্ব্ব দিকে বেণগঙ্গা, বেণগঙ্গা যথায় বরদা নদীর সহিত মিলিতা হইতেছেন, সেই স্থান হইতে সীমারেখা বরাবর পশ্চিম মুখে মাহুরনগরের দক্ষিণ পর্য্যন্ত আসিয়া ভীমানদীর সঙ্গমস্থলের কিঞ্চিৎ পশ্চিম দিয়া দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে শিবদাসগড়ের নিকট সাগরকূলে আসিয়া মিলিত ছিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ সকল সময়ে এই সীমা মান্য করিয়াও চলিতেন না।

মহারাষ্ট্রদেশের প্রাচীন ইতিহাস অতীতের অনন্ত গর্ভে নিহিত, জানিবার কিছুমাত্র উপায় নাই। শিবজীর সময় হইতেই এই জাতি অভ্যুত্থিত হয়। এই জন্য তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬২৭ অব্দে সিউনির দুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে দাদাজী কণ্ঠদেবের নিকট শিক্ষালাভ করিয়া যুবা বয়সে দিল্লীশ্বরকে পর্য্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ইঁহার প্রতাপেই মহারাষ্ট্রীয়দের প্রতাপ বর্দ্ধিত হয়। দিল্লীশ্বর পর্য্যন্ত ইঁহাকে দমন করিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হন নাই। অবশেষে তাঁহাকে বিজয়পুর রাজ্যের কতক অংশের চৌথ (চতুর্থাংশ) ও সর্দ্দেশমুখী (শতকরা দশ হিসাবে) দিয়া ও তাঁহার পুত্র শাম্বজীকে ৫০০০ সেনার অধিনায়ক করিতে স্বীকার করিয়াছিলেন। এই সর্দ্দেশমুখী ও চৌথই ভারতরাজ্যের কাল। ইহাই উপলক্ষ করিয়া মহারাষ্ট্রীয়েরা সময়ে সময়ে ভারতের নানাদেশ আক্রমণ করিত। বঙ্গদেশেও আসিত, ইহা ছাড়া বঙ্গে উৎপাত করিবার আর একটি কারণ ঘটিয়াছিল, তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

শিবজী, খ্রীঃ ১৬৮০ অব্দে ৫ই এপ্রিল রাজগড়ে বাতরোগে প্রাণত্যাগ করেন। ইহারই সহিত অভ্যুত্থিত বংশের পতন আরম্ভ হয়।

ভাগীরথীর পূর্ব্বপারে বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম না থাকাতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এদিকে বড় উৎপাত করিত না। এইজন্য লোকে ক্রমে এদিকে আশ্রয় লইতে লাগিল। কাজে কাজেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের চক্ষুও ক্রমে সে দিকে পড়িতে লাগিল।

খ্রীঃ ১৬৯৬ অব্দে শোভাসিংহ নামে বর্দ্ধমানের একজন জমিদার বর্দ্ধমান রাজ্যের বিরুদ্ধে উত্থিত হয়। সেই গোলযোগের সময় বঙ্গ-প্রবাসী ইউরোপীয়গণ নবাবের নিকট আত্মরক্ষার অনুমতি প্রাপ্ত হন। তদনুসারে খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম নামে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন। প্রায় ঐ সময়েই তাঁহারা সম্রাট আজিম ওসানের নিকট সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করিয়া লন।

খ্রীঃ ১৬৯৮ অব্দে যে দুর্গ নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা বর্ত্তমান দুর্গ হইতে স্বতন্ত্র। উহা বর্ত্তমান ফেয়ার্লি প্লেসে কষ্টম হাউস প্রভৃতির স্থানে অবস্থিত ছিল।

খ্রীঃ ১৭০০ অব্দের প্রারম্ভে আর একদল ইংরাজ বণিক ভারতে আগমন করেন। ১৭০৬ অব্দে উঁহারা পুরাতন সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইলে, ফোর্ট উইলিয়মে ১৩০ জন ইউরোপীয় সৈনিক সন্নিবিষ্ট হয়।

খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দে মুরশিদকুলি খাঁ বাঙ্গালা ও উড়িষ্যার নাজিম হন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি দেওয়ান ছিলেন। নাজিম পদ পাইয়া তিনি অন্য লোকের নিকট যেরূপ মাসুল আদায় করিতেন, ইংরাজদিগের নিকটও তদ্রূপ দাওয়া করিলেন। এই জন্য ইংরাজেরা দিল্লীতে সম্রাটের নিকট হামিণ্টন নামক একজন ডাক্তারকে দূতরূপে প্রেরণ করেন। এই সময় সম্রাট পীড়িত ছিলেন। ডাক্তার হামিণ্টনের চিকিৎসায় তাঁহার আরোগ্যলাভ হইলে, তিনি ডাক্তার সাহেবকে পারিতোষিক প্রার্থনা করিতে বলেন। হামিণ্টন সাহেব আপনার লাভের অপেক্ষা স্বজাতীয়-গণের লাভ অধিক প্রয়োজনীয় বোধ করিলেন এবং সম্রাটের নিকট হইতে সুবিধাজনক একখানি সনন্দ সংগ্রহ করিলেন। সে সনন্দের বলে ইংরাজেরা যে সকল উপকার লাভ করিয়াছিলেন, তাহা এই :- -

"১। ইংরেজ কোম্পানি বিনা মাসুলে বাঙ্গালায় বাণিজ্য করিতে পারিবেন।

২। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী ৩৮টি মৌজা ক্রয় করিতে পারিবেন।

৩। মুরশিদাবাদের টাকশালে সপ্তাহে তিনদিন তাঁহাদের জন্য টাকা মুদ্রিত হইবে।

৪। যাহারা ইংরেজদিগের কাছে ঋণী, নবাবের কর্ম্মচারীগণ তাহাদিগকে ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিবেন।"[৮]

এই সনন্দ লাভে ইংরাজদের বল অনেক বৃদ্ধি হয়।

খ্রীঃ ১৭১৬ অব্দে কলিকাতায় প্রথম গির্জ্জা নির্ম্মিত হয়। ঐ গির্জ্জা রাইটার্স বিল্‌ডিংসের পশ্চিমদিকে অবস্থিত ছিল। ঐ গির্জ্জার চূড়া ১৭৩৭ অব্দের ঝড় ও ভূকম্পে পতিত হয়। তৎপরে সিরাজের আক্রমণে উহার অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়।

উপরে যে সনন্দের কথা বলা হইয়াছে, উহা খ্রীঃ ১৭১৭ অব্দে লব্ধ হয়। সুতরাং ঐ অব্দ বঙ্গে ইংরাজাধিকারের একটি স্মরণীয় অব্দ বলিতে হইবে।

এই অব্দের শেষেই ডাক্তার হামিণ্টনের মৃত্যু হয়।[১]

এই সময়ে বর্ত্তমান চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণেই অরণ্য ছিল। এই অরণ্য ও খিদিরপুরের মধ্যে দুইটি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। শেঠবংশীয়দিগের আনীত লোক-দ্বারাই ঐ গ্রামদ্বয় অধ্যুষিত হয়। এক্ষণে যেখানে চৌরঙ্গীর পরমরমণীয় সৌধমালা বিরাজ করিতেছে, তৎকালে সেইখানে জীর্ণকুটীরপূর্ণ একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। বর্ত্তমান বেলিয়াঘাটার দুই মাইল পশ্চিম পর্য্যন্ত অরণ্য ছিল। রাত্রে লোকে ব্যাঘ্রাদির ভয়ে সশঙ্ক থাকিত। এত অসুবিধা সত্ত্বেও বাণিজ্যের বৃদ্ধি শীঘ্র শীঘ্রই হইয়াছিল। ইউরোপীয়গণ এ স্থানে অতি স্বচ্ছন্দেই থাকিতেন। হামিণ্টন সাহেব কলিকাতাবাসী ইংরাজগণের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন :—

> "বঙ্গে ইউরোপীয় নরনারীগণ সুখে ও স্বচ্ছন্দে বাস করেন। সকলেই প্রাতঃকালে বিষয়কর্ম্ম করিয়া মধ্যাহ্নে আহারান্তে বিশ্রাম করেন এবং অপরাহ্নে কেহ বা মাঠে ও বাগানে গাড়ী বা পাল্কীতে করিয়া, কেহ বা চারি দাঁড়ের বজরায় করিয়া নদীতে ভ্রমণ করেন। কখন কখন নদীতে মাছধরা বা পাখীমারা কখন বা উভয়বিধ আমোদই হয়। রাত্রি হইবার পূর্ব্বে তাঁহারা বন্ধুভাবে পরস্পরের সহিত দেখা-শুনা করিয়া থাকেন।"

সুতরাং এই সময়ে কলিকাতার উন্নতির অবস্থা বলিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

খ্রীঃ ১৭৩৭ অব্দের ঝড় ও ভূমিকম্প—বর্গীর হাঙ্গামা—মহারাষ্ট্রীয় খাত—সিরাজউদ্দৌলা—কলিকাতার গবর্ণরগণ—রোজার ড্রেক—কৃষ্ণদাস—সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণ—অন্ধকূপ হত্যা।

জগতে কাহারও অবস্থা চিরদিন সমান থাকে না। খ্রীঃ ১৭৩৭ অব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে ভাগীরথীতে ভয়ঙ্কর ঝড় হয়, সঙ্গে সঙ্গে ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পও হয়। এই ভূমিকম্পেই প্রাচীন সেণ্ট জন্‌স চর্চ্চের চূড়া ভাঙ্গিয়া যায়। কলিকাতায় প্রায় দুইশত গৃহ নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। শুনা যায় নৌকা ডিঙ্গা জাহাজ প্রভৃতিতে প্রায় ২০০০০ জলযান স্থানভ্রষ্ট হইয়া যায়। গঙ্গায় ইংরাজদের নয়খানি জাহাজের

মধ্যে আটখানি নষ্ট হইয়াছিল। নাবিকেরা প্রায় অনেকেই মরিয়াছিল। এই ঝড়ে ও ভূমিকম্পে প্রায় ৩০০,০০০ প্রাণী বিনষ্ট হইয়াছিল।[১০]

খ্রীঃ ১৭৪০ অব্দে নবাব আলিবর্দ্দি বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা হন। তাঁহারই সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ আক্রমণ করে। খ্রীঃ ১৭২০ অব্দে দাক্ষিণাত্যের স্থানে স্থানে যে চৌথ পাইবার কথা নির্দ্ধারিত হয়, সেই চৌথের জন্য তাহারা সর্ব্বত্রই দাবী করিত। এখন তাহারা সেই সূত্র অবলম্বন করিয়াই বঙ্গ আক্রমণ করে। কোন কোন গ্রন্থকার বলেন, নবাব আলিবর্দ্দি কোন মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, ইহাও তাহাদের জাতক্রোধ হইবার এক কারণ। যাহাই হউক তাহাদের উৎপাতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। ইহাই ইতিহাসে "বর্গীর হাঙ্গামা" নামে প্রসিদ্ধ। এই উপলক্ষেই মহারাষ্ট্রীয় খাত নিখাত হয়।

আলিবর্দ্দির পর সিরাজউদ্দৌলা বাঙ্গালার নবাব হন। কলিকাতা সংস্থাপক চার্ণকের সময়াবধি সিরাজউদ্দৌলার সময় পর্য্যন্ত ফ্রিক, ক্রুটেনডেন্, ব্রেডিল, ফরষ্টর, আলেকজাণ্ডার ডেসন্, উইলিয়ম কাউইচ ও রোজার ড্রেক ক্রমান্বয়ে ইংরাজদের অধ্যক্ষ ছিলেন।

এই ড্রেকের সময় এক কাণ্ড ঘটে, যাহাতে ইংরাজদের ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না হন। সিরাজউদ্দৌলা ঢাকার সহকারী শাসনকর্ত্তা রাজা রাজবল্লভের ধনহরণের চেষ্টা করে। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাস, ধনরাশি লইয়া সপরিবারে কলিকাতায় আগমনপূর্ব্বক ইংরাজের শরণাপন্ন হন। ড্রেক তাঁহাকে আশ্রয় দান করেন। সিরাজউদ্দৌলা প্রথমে ইংরাজদিগের নিকট কৃষ্ণদাসকে চাহিয়া পাঠান এবং বলেন কৃষ্ণদাসকে তাঁহার হস্তে না দিলে, তিনি কলিকাতা আক্রমণ করিবেন। ড্রেক তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। ফল এই হইল—খ্রীঃ ১৭৫৬ অব্দের ১৭ই জুন ৫০০০০ সৈন্য লইয়া সিরাজ কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন। হলওয়েলের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে ইংরাজ পক্ষে আন্দাজ ১৭০ জন মাত্র যুদ্ধ করিয়াছিল; তাহার মধ্যে ২৫ জন মৃত এবং প্রায় ৭০ জন আহত হইয়াছিল। ড্রেক সাহেব স্ত্রীলোক ও বালক বালিকাদিগকে লইয়া জলপথে পলাইয়াছিলেন। যখন সিরাজ দুর্গ অধিকার করেন, তখন ১৪৬ জন মাত্র বন্দী তাঁহার করতলগত হয়। সিরাজ বন্দীদিগকে শৃঙ্খলমুক্ত করিয়া আপনার সেনানায়কের হস্তে তাঁহাদের রক্ষাভার অর্পণপূর্ব্বক, বিশ্রাম জন্য শিবিরে প্রস্থান করেন। সেনানায়ক নির্বোধের ন্যায়, সেই বন্দীদিগকে 'অন্ধকূপ' নামক একটি ক্ষুদ্র কারাগারে সে

রাত্রির মত আবদ্ধ করিয়া রাখিল। প্রাতঃকালে সেই গৃহ হইতে মৃতপ্রায় ২৩ জনকে মাত্র পাওয়া গিয়াছিল, আর সকলেই প্রাণত্যাগ করিয়াছিল।

কিন্তু এই ১২৩ জনের রক্তেই, ইংরাজের ভারতে প্রোথিত সৌভাগ্যতরু কালে ফলবান হইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

হলওয়েল সাহেব—পুরাতনসেণ্ট জনের-গির্জ্জা—আলীনগর—মান্দ্রাজে কলিকাতা আক্রমণসংবাদ—ক্লাইব ও ওয়াটসন—কলিকাতা হইতে পলায়নের পর ড্রেক প্রভৃতির অবস্থা—ক্লাইবের বজবজিয়া অধিকার—কলিকাতা পুনরধিকার—হুগলী অধিকার—অন্ধকূপ স্মরণ-চিহ্ন—সিরাজউদ্দৌলার ইংরাজদের সহিত সন্ধি—ফরাসী ইংরাজে—চন্দননগর আক্রমণ—সিরাজউদ্দৌলার ক্রোধ—পলাসীর যুদ্ধ—মীরজাফর—মিণ্ট ও প্রথম মুদ্রা—খ্রীঃ ১৭৫৬ অব্দ।

অন্ধকূপ হইতে যে ২৩ জন পুনরায় সূর্য্যের মুখ দেখিয়াছিলেন, হলওয়েল সাহেব তাঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহারই বর্ণিত বিবরণ দ্বারা অন্ধকূপ ঘটনা জানিতে পারা যায়।

হলওয়েল সাহেবের বর্ণনাতে (Mr. Howell's Narrative) জানা যায়, তাঁহারা তৎপরদিন নবাব সেনাপতি মীরমদন কর্ত্তৃক অনেক অত্যাচার সহ্য করিয়া পরে নবাব কর্ত্তৃক মুক্ত হন।

সিরাজউদ্দৌলা সহস্র দোষে দোষী হইলেও অন্ধকূপ-হত্যা বা ইংরাজ কয়েদীদের উপর অত্যাচার জন্য দোষী নহেন।

সিরাজউদ্দৌলার কলিকাতা আক্রমণে বহিস্থিত যে সকল গৃহ নষ্ট হয়, কলিকাতার প্রথম গির্জ্জা (St. John's Church) তাহার মধ্যে একটি।

সিরাজউদ্দৌলা কলিকাতা জয় করিয়া, ইহার নাম আলীনগর রাখেন, এবং কয়েকদিন মাত্র এখানে অবস্থিতি করিয়া, আপনার সেনাপতি মাণিকচাঁদকে কয়েকজন মাত্র সৈন্যের সহিত রাখিয়া প্রস্থান করেন।

কলিকাতা আক্রমণের সংবাদ সাত সপ্তাহ পরে মান্দ্রাজে পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ পৌঁছিলে কর্ণেল ক্লাইব ও আডমিরাল ওয়াটসন ৫খানি রণতরী ও ৫খানি বাণিজ্যতরীতে ৯০০ ইউরোপীয় এবং ১৫০০ সিপাহী সৈন্য লইয়া ১০ই অক্টোবর কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ড্রেক প্রভৃতি এতদিনে ফলতায় জাহাজে বাস করিতেছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বর ক্লাইব এবং ওয়াটসন তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন ও ক্রমে ক্রমে বজবজিয়া, কলিকাতা ও হুগলী অধিকার করিলেন।

কলিকাতায় অতি অল্পমাত্র সৈন্য ছিল সুতরাং অধিকার করিতে অধিক আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। খ্রীঃ ১৭৭৫ অব্দে ২রা জানুয়ারি কলিকাতা পুনরায় অধিকৃত হয়।

অন্ধকূপ হত্যার স্মরণার্থ হলওয়েল সাহেব নিজ ব্যয়ে ৫ ফুট উচ্চ একটি স্তম্ভ (obelisk) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ঐ স্তম্ভ লালদীঘির উত্তর পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দে মার্কুইস অব হেষ্টিংস-এর আদেশে ঐ স্তম্ভ ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।

নবাব, কলিকাতা প্রভৃতি অধিকারের কথা শুনিয়া ইংরাজদের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করেন। এই সন্ধি অনুসারে ইংরাজেরা সম্রাটদত্ত ক্ষমতা ব্যতীত, কলিকাতায় একটি দৃঢ়তর দুর্গ নির্ম্মাণ ও টাঁকশাল স্থাপনের অধিকার প্রাপ্ত হন। তদ্ব্যতীত নবাব স্বীকার করেন, কলিকাতার আক্রমণে কলিকাতার যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহা পূরণ করিবেন।

এই সময়ে বিলাতে ফরাসী ও ইংরাজে যুদ্ধ বাধিয়াছিল, সেই জন্য ক্লাইব চন্দননগরে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। ঐ যুদ্ধ নবাবের অনভিমত হওয়াতে তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া ফরাসীদের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহারই ফল পলাশীর যুদ্ধ।

কিন্তু পলাশীর যুদ্ধের ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর কারণ ছিল।

> "মীরজাফর আলি খাঁ নামক এক ব্যক্তি আলিবর্দ্দি খাঁর দুহিতাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। নবাবের সৈন্যের অধ্যক্ষতা ইঁহার উপর সমর্পিত ছিল। এক্ষণে (সিরাজউদ্দৌলার) এই সৈন্যাধ্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মীরজাফর গোপনে নবাবের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইলেন। এই সময়ে জগৎশেঠ মহাতাব রায় মুর্শিদাবাদের দরবারে বিশেষ প্রতিপত্তি-শালী ও ক্ষমতাপন্ন ছিলেন। কারবারে তিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হন। নবাব, মহাতাব রায়কে বণিকদিগের নিকট হইতে তিন কোটি টাকা তুলিয়া দিতে বলেন, মহাতাব রায় ইহাতে এই উত্তর করেন যে, এরূপে টাকা তুলিতে গেলে অতিশয় অত্যাচার হইবে। নবাব এজন্য ক্রুদ্ধ হইয়া জগৎশেঠ মহাতাব রায়ের অপমান

করিলেন। মহাতাব রায় এ অপমান অমনি অমনি ভুলিতে পারিলেন না। প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য অধিকন্তু ইংরাজদিগের প্ররোচনায় গোপনে তাহাদের সহিত মিশিলেন।"[১১]

বাস্তবিক জগৎশেঠের ন্যায় ধনকুবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত না হইলে, ক্লাইব নবাবের সহিত বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহস করিতেন কি না সন্দেহ।

কৃষ্ণচন্দ্র চরিত প্রভৃতি গ্রন্থে দেখা যায় মীরজাফর, জগৎশেঠ, মহাতাব রায়, নবাবের মন্ত্রী ও কোষাধ্যক্ষ রায়দুর্লভ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রাণী ভবানী, খোজা বায়েজিদ, বণিক উমাচাঁদ প্রভৃতি নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিতে প্রস্তুত ছিলেন এবং রাণী ভবানী ব্যতীত সকলেই ইংরাজ-পক্ষ অবলম্বন করেন।

ক্লাইব প্রধান প্রধান দেশীয়দিগকে সহায় পাইয়া, নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। কলিকাতার প্রায় ৩৫ ক্রোশ উত্তরে পলাশীর বিস্তীর্ণ আম্রকাননে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ক্লাইব ১৮৮০ জন ইউরোপীয় এবং ২৮৮০ জন সিপাহী সঙ্গে নবাবের ৩৫০০০ পদাতি ও ১৫০০০ অশ্বারোহীর সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হন। এ যুদ্ধে তাঁহার প্রধান ভরসা মীরজাফর। বাস্তবিক মীরজাফর যুদ্ধের সময় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নবাবকে সৈন্য ফিরাইতে না বলিলে ক্লাইবের পক্ষে পলাশীক্ষেত্রে জয়লাভ করা কঠিন হইত। ইতিতত্ত্ববিদ হণ্টর সাহেব লিখিয়াছেন নবাব যখন প্রাতে ৬টার সময় ইংরাজদিগকে আক্রমণ করেন, তখন ক্লাইব, আপনার সৈন্যদিগকে আম্রকাননে লুকাইয়া রক্ষা করেন। তারপর যুদ্ধের অবসর হইলে যখন নবাব-সৈন্য আহারের উদ্যোগে ব্যস্ত, তখন তাহাদের শিবির আক্রমণ করিয়া অধিকাংশ সৈন্য নষ্ট করেন।[১২] বাস্তবিক এইরূপ কার্য্যই ইংরাজদের ভারতাধিকার কার্য্যে কলঙ্করেখা। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ২৩এ জুন এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

যুদ্ধে নবাবের দুইজন বাঙ্গালী সেনাপতিমাত্র প্রাণপণে যুদ্ধ করেন। মীরমদন যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করেন। আর সেনাপতি মোহনলালের নাম পলাশী-বৃত্তান্তে স্বর্ণাক্ষরে অঙ্কিত থাকিবে।

পরাজিত হইয়া সিরাজউদ্দৌলা ফকিরবেশে পলায়ন করেন। কিন্তু ধৃত হইয়া মীরজাফরের পুত্র মীরনের হস্তে তাঁহাকে প্রাণ হারাইতে হয়।

সিরাজউদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে নবাব করিলে, ইংরাজেরা সিরাজউদ্দৌলার সন্ধির মর্ম্মানুসারে টাকশাল (Mint) স্থাপিত করেন। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ১৭ই আগষ্ট প্রথম মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত হয়। তখন মুদ্রায় দিল্লীশ্বরের

নাম অঙ্কিত থাকিত। সম্রাট চতুর্থ উইলিয়মের সময় হইতেই ইংরাজেরা রাজনামাঙ্কিত মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করিতে আরম্ভ করেন।

খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দ কলিকাতার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় অব্দ। এই অব্দেই বর্ত্তমান দুর্গ আরব্ধ হয়—এইঅব্দ হইতেই সকল বিষয়ে কলিকাতার শ্রীবৃদ্ধি ঘটিতে আরম্ভ হয়—পুরাতন কলিকাতা সিরাজের উপদ্রবে একপ্রকার নষ্টই হইয়াছিল। বড়বাজার অঞ্চলের সমস্ত গৃহই নবাবের সৈন্যগণ পুড়াইয়া ফেলিয়াছিল, নগরের প্রধান প্রধান গৃহ বিশেষতঃ গির্জাটির ধ্বংসাবশেষে দুর্গমধ্যে একটি মসজিদ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কলিকাতার অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই দূরে অরণ্যে পলায়ন করিয়াছিল। নগর পুনঃ-অধিকৃত হইলে প্রায় ৫০,০০০ লোক ফিরিয়া আসিয়াছিল। অনেকে আর ফিরে নাই।

এই সময়ে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশীয়েরা সুন্দরবনের মধ্যে জঙ্গল কাটিয়া বাস করিতে আরম্ভ করেন। দক্ষিণাঞ্চলের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে এ বিষয়ের বিবরণ পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ক্লাইবের জীবনী—মীরজাফর কর্ত্তৃক ক্ষতিপূরণ—২৪ পরগণা—ক্লাইবের বাঙ্গালা ত্যাগ—বান্সিটার্ট—মীর কাসিম—ইংরাজে কাসিমে—লর্ড ক্লাইবের পুনরাগমন—বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ—লালগির্জা—ক্লাইবের ভারত ত্যাগ—হারি বেরেলষ্ট—জন কার্টিয়ার—ছিয়াত্তরে মন্বন্তর—মন্বন্তরের কারণ—কোম্পানির প্রকাশ্যরূপে বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ।

যাঁহার সহিত সম্পর্ক না ঘটিলে, কলিকাতার ভাগ্যে কখন সুখের দশা ঘটিত কি না সন্দেহ, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

খ্রীঃ ১৭২৫ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী শ্রফসায়র প্রদেশে ক্লাইবের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রিচার্ড ক্লাইব উকীলের ব্যবসায় দ্বারা পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ক্লাইব বাল্যকালে বড় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। দেশের লোকে তাঁহার জ্বালায় সর্ব্বদা অস্থির ছিল। তাঁহার পিতাও কাজে কাজেই তাঁহাকে দেখিতে পারিতেন না। এইজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটী কেরাণীগিরি কর্ম্ম করিয়া দিয়া, তাঁহার পিতা, তাঁহাকে ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দেন। ১৮ বৎসর বয়সে, খ্রীঃ ১৭৪৩ অব্দে তিনি মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। মান্দ্রাজে আসিয়া তাঁহার কষ্টের অবধি ছিল

না। মনোকষ্টে তিনি দুইবার আত্মহত্যার উদ্যম করেন, কিন্তু দৈববশে দুইবারই তাঁহার প্রাণ রক্ষা পায়। অবশেষে তিনি সৈনিক বিভাগে প্রবিষ্ট হন, এবং কর্ণাট যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া প্রসিদ্ধ হন। অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজের সৌভাগ্যের দ্বার উন্মুক্ত করেন।

মীরজাফর নবাব হইয়াই ইংরাজদের হস্তে কলিকাতার ক্ষতিপূরণের টাকা পাঠাইয়া দেন। খ্রীঃ ১৭৫৭ অব্দের ৬ই জুলাই মুরশিদাবাদ হইতে প্রায় ৭৬ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা ৭০০ সিন্দুকে বোঝাই হইয়া ১০০ খানি নৌকায় কলিকাতায় পোঁছে। ইহার পূর্ব্বে, ভারতে ইংরাজেরা একত্রে এত টাকা কখন প্রাপ্ত হন নাই। তৎপরে দেড়মাসের মধ্যেই আবার ৪০ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা আসিয়াছিল।[১৩]

খ্রীঃ ১৭৫৮ অব্দে ক্লাইব বঙ্গদেশীয় কুঠীসমূহের গবর্ণর হইলেন। এই সময়ে কোম্পানি, মীরজাফরের নিকট হইতে কলিকাতার চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগের স্বত্ব লাভ করেন। ইহাই বর্ত্তমান চব্বিশ পরগণা।

যদিও ইতিপূর্ব্বে কলিকাতায় একজন করিয়া গবর্ণর থাকিতেন, কিন্তু তৎকালে কোম্পানির ভূসম্পত্তি কিছুই ছিল না। এই জন্য লর্ড ক্লাইবকেই বঙ্গের প্রথম গবর্ণর বলা যাইতে পারে।

পলাশী বিজেতা ক্লাইব লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এইরূপে ইংরাজ রাজ্য বৃদ্ধি করিতে করিতে লর্ড ক্লাইব খ্রীঃ ১৭৬০ অব্দে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে গমন করেন। লর্ড উপাধি তিনি ইংলণ্ডে গমনান্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ক্লাইবের কলিকাতা ত্যাগের পর বান্সিটার্ট সাহেব গবর্ণর হন। ইনি মীরজাফরকে অকর্ম্মণ্য দেখিয়া তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে নবাব করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই অর্থ লইয়া ইংরাজে কাসিমে অনর্থ ঘটে। সেই অনর্থ নিবারণার্থ লর্ড ক্লাইব খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দের মে মাসে পুনরায় বঙ্গের গবর্ণর হইয়া আগমন করেন।

এইবার তিনি সম্রাট সাহ আলমের নিকট হইতে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি গ্রহণ করিলেন। খ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দের ১২ই আগষ্ট এই দেওয়ানির সনন্দ ক্লাইবের হস্তগত হয়।

খ্রীঃ ১৭৬৭ অব্দে পীড়িত হইয়া ক্লাইবকে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়। তিনি কোম্পানির কার্য্য সম্বন্ধে অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন।

এই সালে রেবরেণ্ড কির্ণন্দর (Revd. Mr. Kiernander) লালগির্জা (The Old or mission Church) নির্ম্মাণ করেন। তখন ক্লাইব

কলিকাতায় ছিলেন।

ক্লাইব যখন কলিকাতায় প্রথম পদার্পণ করেন তখন ইংরাজের কুঠী ভগ্নপ্রায়। আর যখন শেষবার ভারত ত্যাগ করেন তখন বাঙ্গালায় কোম্পানির আধিপত্য বদ্ধমূল।

ক্লাইব কলিকাতা ত্যাগ করিলে হারি বেরেলষ্ট গবর্ণর হইয়া খ্রীঃ ১৭৬৯ পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ শাসন করেন; তৎপরে জন কার্টিয়ার গবর্ণর হন। এই সময় দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। এই সময়ে একটি ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উৎপীড়নে সমগ্র বঙ্গ ছারখার হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৭৭০ অব্দে[১৪] এবং বাঙ্গালা ১১৭৬ সালে এই মহামারী সংঘটিত হয়। এজন্য ইহা ছিয়াত্তরে মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ। হিকে সাহেব লিখিয়াছেন কলিকাতায় ১৫ই জুলাই হইতে ১০ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৭৬,০০০ লোক প্রাণত্যাগ করে। ইহার উপর আবার অগ্নিকাণ্ডও ঘটিয়াছিল।

বঙ্গের সর্ব্বত্রই এই দুর্দ্দশা। পূর্ব্ব দুইবৎসর শস্য পর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মে নাই। তাহার উপর অনাবৃষ্টি উপস্থিত হইলে কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। রাস্তাঘাটে মৃতদেহের ছড়াছড়ি। প্রথমে টাকায় চারি সের চাউল বিক্রয় হইয়াছিল, অবশেষে তাহাও পাওয়া যাইত না। এই সময় ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বীরা প্রচার করিতে আরম্ভ করিল যে, ইংরাজেরা সব চাউল ও অন্যান্য শস্য ক্রয় করিয়া রাখিয়াছে বলিয়াই চাউল এত দুর্ম্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।

যাহা হউক, কোম্পানি এবিষয়ে বন্দোবস্ত করা উচিত বোধ করিলেন।

এই পর্যন্ত কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে আপন হস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করিলেন এবং যাহাতে সকল বিষয়ে সুবন্দোবস্ত হয়, তাহার জন্য ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে শাসনকর্ত্তা করিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

ওয়ারেণ হেষ্টিংস—হেষ্টিংসের সময়ে প্রধান প্রধান ঘটনা—হেষ্টিংসের বিচার—খ্রীঃ ১৭৭৩ অব্দের বন্দোবস্ত—নূতন কৌনসিল—নন্দকুমারের ফাঁসি—চাঁদপাল ঘাট—টলীর নালা—কালীঘাট—বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ—খিদিরপুর ডক—হিকের গেজেট—কলিকাতা মাদ্রাসা—সার উইলিয়ম জোন্স—এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল—পাথুরিয়া গির্জা—হেষ্টিংসের ভারত ত্যাগ—সার জন ম্যাকফারসন—কলিকাতার অবস্থা।

খ্রীঃ ১৭৭২ অব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রকাশ্যভাবে আপন হস্তে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিয়া ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে এদেশের শাসন-কর্ত্তৃত্ব পদে নিযুক্ত করেন।

খ্রীঃ ১৭৩২ অব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংসের জন্ম হয়। ইনি ওয়েষ্টমিনিষ্টর বিদ্যালয়ে ইলাইজা ইম্পে ও কবিবর উইলিয়ম কাউপারের সহিত একত্রে পড়িয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া অষ্টাদশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে কলিকাতায় কেরাণীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আগমন করেন। পলাশীর যুদ্ধের পর তিনি নবাবের দরবারে কোম্পানীর এজেণ্ট হন। ১৭৬১ অব্দে তাঁহাকে কলিকাতার কৌন্সিলের মেম্বর করা হয়। ইহার তিন বৎসর পরে তিনি বিলাতে গিয়া আবার সাত বৎসর পরে আগমন করেন, তখন তিনি মান্দ্রাজ কৌন্সিলের মেম্বর। ১৭৭২ অব্দে তিনি বাঙ্গালার গবর্ণর হন।

ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালা ও বেহার ১৮টি জিলায় বিভক্ত করিয়া, প্রত্যেক জিলায় এক একজন কালেক্টর নিযুক্ত করেন।

তাঁহার সময় কলিকাতার রেবেনিউ বোর্ড স্থাপিত হয়।

তাঁহার সময়েই রোহিলা যুদ্ধ ঘটিয়াছিল।

তিনিই মহারাজ নন্দকুমার রায়কে সামান্য অপরাধে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

তাঁহারই কর্তৃক বারাণসীরাজ চৈতসিংহের সর্ব্বনাশ সাধিত হয়।

প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহীসুর যুদ্ধও তাঁহার সময় সংঘটিত হইয়াছিল।

তাঁহারই সময় বাঙ্গালার প্রথম সংবাদপত্র হিকের গেজেট প্রচারিত হয়।

তাঁহার দ্বারা অনেক অপকর্ম্ম সাধিত হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৭৮৫ অব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন।

নন্দকুমারের ফাঁসি, রোহিলাযুদ্ধ, চৈতসিংহের নির্ব্বাসন, অযোধ্যার বেগমগণের অর্থাপহরণ প্রভৃতি অপরাধে হেষ্টিংস, বর্ক, সেরিডান ও ফক্স প্রভৃতি কর্ত্তৃক অভিযুক্ত হইয়া ৭ বৎসরকাল অনেক কষ্টভোগ করিয়াছিলেন। তাঁহার শাসন সময়ে খ্রীঃ ১৭৭৩ অব্দে বিলাতের মহাসভা কোম্পানির বন্দোবস্তে হস্তক্ষেপ করেন। তাহাতে কয়েকটি নূতন নিয়ম পালনার্থ কোম্পানির ডিরেকটরদিগের হস্তে অর্পিত হয়।

সে নিয়ম কয়টি এই—

(১) বৎসরে বৎসরে কোম্পানিকে ৪,০০,০০০ পৌণ্ড্ দিতে হইবে।

(২) কলিকাতার গবর্ণর, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের ইংরাজাধিকারের গবর্ণর জেনেরল হইবেন।

(৩) চারিজন সভ্যে তাঁহার একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হইবে। উহাদের প্রত্যেকের গবর্ণর জেনেরলের তুল্য ক্ষমতা থাকিবে।

(৪) গবর্ণর জেনেরল স্বীয় সভার সাহায্যে নূতন আইন প্রচারিত করিতে পারিবেন।

(৫) কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হইবে, তথায় একজন চিফ জষ্টিস ও ৩জন জজ নিযুক্ত হইবেন।

(৬) কোম্পানির ভারতসংক্রান্ত কার্য্য নিয়মিতরূপে ইংলণ্ডে মহামন্ত্রীর নিকট জ্ঞাপিত করিতে হইবে।

এই নিয়ম অনুসারে খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দের অক্টোবর হইতে হেষ্টিংস প্রথম গবর্ণর জেনেরল হন। বারওয়েল, কর্ণেল মন্‌সন্, ফ্রান্‌সিস এবং জেনেরল ক্লেবরিং তাঁহার মন্ত্রিসভার সভ্য হইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে বারওয়েল কেবল হেষ্টিংসের পক্ষ ছিলেন, অপর তিনজনের আন্তরিক ইচ্ছা হেষ্টিংসকে পদে পদে অপদস্থ করা। প্রথম প্রথম তাঁহাদের অভিসন্ধি প্রায়ই সিদ্ধ হইত।

মন্‌সন্ প্রভৃতি সভ্যত্রয়ের একজন সহযোগী ছিলেন। তিনি দেওয়ান মহারাজ নন্দকুমার রায়। ইনি রাঢ়ীশ্রেণীয় ব্রাহ্মণ। মুরশিদাবাদের অন্তঃপাতী ভদ্রপুর গ্রামে খ্রীঃ ১৭০৫ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ১৭৫৬ অব্দে তিনি হুগলীর ফৌজদার হন। ক্লাইব ইঁহাকে বড় ভালবাসিতেন। ১৭৬৩ অব্দে ইনি নবাব মীরজাফরের দেওয়ান হন। মন্‌সন্ প্রভৃতির পক্ষ হইয়া হেষ্টিংসের দোষসমুদায় প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলে, হেষ্টিংস মোহনপ্রসাদ নামক একজন ব্যবসায়ীকে উপলক্ষ করিয়া জাল করা অপরাধে তাঁহাকে সুপ্রীম কোর্টে উপস্থিত করেন। তাঁহারই যত্নে প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পে ইহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করেন। জাল করিয়া ক্লাইব পলাশী জয় করিলেন; ফল—লর্ড উপাধি। জাল করিয়া (?) নন্দকুমার রায় কাহার কি মহান্ অপকার করিয়াছিলেন জানি না, ফল—ফাঁসী। ১৭৭৫ অব্দে ৭০ বৎসর বয়সে মহারাজ নন্দকুমারের প্রাণবায়ুর অবসান হয়।

চাঁদপালঘাট (যেখানে ভারতের গবর্ণর জেনেরলগণ প্রায়ই কলিকাতায়

পদার্পণ করেন) এ সময়ে বর্ত্তমান ছিল।

খিদিরপুরের উত্তরস্থিত টলির নালা (Tolly's Nullah) বা টালিগঞ্জের খাল খ্রীঃ ১৭৭৫ অব্দে কর্ণেল টলি (Colonel Tolly) কর্ত্তৃক খনিত হয়। পূর্ব্বে ইহাকে গোবিন্দপুরের খাড়ী বলিত, পূর্ব্বে এখানে গঙ্গার শাখা প্রবাহিত ছিল।

হণ্টর সাহেব তাঁহার ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিপোর্টে লিখিয়াছেন, কালীঘাটের মন্দির প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। নাইট সাহেব বলেন—

"The temple of *Kulighat* probably stood for centuries, when the Ganges itself, some miles wide, laved its walls, when human blood streamed on its altars and when thugs, before proceeding on their expedition, made their devoirs to Kali."

কিন্তু আলিপুরে (১৮৮৫।২৩ শে জুন মঙ্গলবার) সম্প্রতি এক মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে তাহাতে মোকদ্দমার বাদী বরিশার সাবর্ণ চৌধুরীগণ বলিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান মন্দির ইং ১৮০৯।১০ সালে (বাঙ্গালা ১২১৬ সালে) নির্ম্মিত।

বর্ত্তমান মন্দির আদি পীঠের উপর নির্ম্মিত নহে।

খ্রীঃ ১৭৭৮অব্দে হালহেড সাহেব চার্লস উইল্‌কিন্সের খোদিত বাঙ্গালা অক্ষরে প্রথম বাঙ্গালা ব্যাকরণ প্রচারিত করেন। খ্রীঃ ১৭৮০ অব্দে কর্ণেল হেনরি ওয়াটসন খিদিরপুরের ডক্ প্রস্তুত করিয়া জাহাজের কাজ আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহাকে দশলক্ষ টাকা ক্ষতি সহ্য করিতে হয়।

এই সালের ২৯এ জানুয়ারি হইতে প্রথম সংবাদপত্র 'হিকের গেজেট' মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

খ্রীঃ ১৭৮১ অব্দে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয় এবং ১৮২০ সালে বর্ত্তমান বাটী প্রায় দেড়লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দে ইহাতে প্রথম ইংরাজী প্রবর্ত্তিত হয়। তৎপূর্ব্বে কেবল আরবী ও পারসীই শিক্ষা দেওয়া হইত। তৎপরে ইহার ক্রমে উন্নতি হইতেছে।

খ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দে সার উইলিয়মজোন্‌স সুপ্রীম কোর্টের জজ হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন,। ইনি খ্রীঃ ১৭৪৬ অব্দের ২০ এ সেপ্টেম্বর লণ্ডন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। যখন ইঁহার তিন বৎসর বয়স, তখন ইঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ইঁহার জননী অসামান্য গুণসম্পন্না ছিলেন। ইঁহার বাল্যশিক্ষার ভার জননীর হস্তে ছিল। ইনি জননীকে যখন কোন প্রশ্ন করিতেন, তখনি তিনি বলিতেন

"পড়িলেই জানিতে পারিবে।" সেই মাতৃ উপদেশেই ইঁহার পাঠ-তৃষ্ণা বৰ্দ্ধিত হয় এবং সেই জন্যই আজ তিনি জগতে পূজ্য। সাতবৎসর বয়সে তিনি হারো নগরের বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। তৎপরে ১৭৬৪ অব্দে অক্ষফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। ইনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন। অল্প বয়সেই ব্যবহারশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন হন। অক্ষফোর্ডে অধ্যয়নকালে, ইনি আলিপোবাসী একজন লোককে আরবী শিখাইবার জন্য নিযুক্ত করেন। তৎপূর্ব্বে গ্রীক ও লাটিন শিক্ষা করিয়াছিলেন। ছুটির সময় অশ্বারোহণ, তরবারিচালন, নৃত্য, গীত, বাদ্য, ইটালিয়, স্পানীয়, পর্তুগীজ ও ফরাসীস ভাষা শিক্ষা করিতেন। গ্রীঃ ১৭৬৫ অব্দে ইনি লর্ড আলথর্পের শিক্ষকতাকার্য্য স্বীকার করেন। গ্রীঃ ১৭৬৭ অব্দে তিনি স্বীয় ছাত্র লর্ড আলথর্পের সহিত, জর্ম্মনদেশের স্পানগারে অবস্থিতি করেন, সেই সময় তাঁহার জর্ম্মনভাষা শিক্ষা হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি পারসী হইতে নাদির সাহের জীবনী ফরাসীভাষায় অনুবাদ করেন। ১৭৭০ অব্দে তিনি টেম্পল বারে প্রবেশ করেন। ১৭৭৪ অব্দে তিনি ব্যবহারাজীবের কার্য্যে প্রবৃত্ত হন। গ্রীঃ ১৭৮৩ অব্দের মার্চ্চ মাসে তিনি কলিকাতার সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইয়া আসেন। এখানে আসিয়াই লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির আদর্শে "এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল" নামক সভার উদ্যোগ করেন। গ্রীঃ ১৭৮৪ অব্দেই ঐ সভা স্থাপিত হয়। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, ঐ সভার সভাপতি ছিলেন এবং উহার অনেক উন্নতিও করিয়াছিলেন। এ দেশে আসিয়া ইনি সংস্কৃত উত্তমরূপ শিক্ষা করিয়াছিলেন। গ্রীঃ ১৭৮৭ অব্দের ছুটিতে তিনি কৃষ্ণনগরে গমন করিয়া সংস্কৃত ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করেন। গ্রীঃ ১৭৮৯ অব্দে ইনি মহাকবি কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তল ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করেন। গ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দের প্রথমে তাঁহার অনুবাদিত মনুসংহিতা প্রকাশিত হয়। গ্রীঃ ১৮৯৪ অব্দে এপ্রিল মাসে যকৃৎরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁহার ৪৮ বৎসরমাত্র বয়স হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে ভারতবর্ষ—শুধু ভারতবর্ষ কেন—সমস্ত জগত বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভারতে ও ইংলণ্ডে নানা উপায় অবলম্বিত হইয়াছে।

মহাত্মা জোন্‌সের স্থাপিত এসিয়াটিক সোসাইটির গৃহনির্ম্মাণ জন্য পার্কষ্ট্রীটের উত্তর-পশ্চিম কোণে গবর্ণমেণ্ট একখণ্ড ভূমি প্রদান করেন, তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হয় তাহা অদ্যাপি আছে। এই স্থলে উক্ত সোসাইটীর কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল।

এই সভা ১৭৮৪ অব্দের ১৫ই জানুয়ারিতে সার উইলিয়ম জোন্স মহোদয় কর্ত্তৃক প্রথম স্থাপিত। তৎকালের গবর্ণর জেনেরল ওয়ারেণ হেষ্টিংস ইহার একজন উদ্যোগী ছিলেন। ইহার স্থাপনকর্ত্তা, ইহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "এসিয়ার মধ্যে মানুষকৃত বা স্বভাবত যাহা কিছু আছে তাহারই তত্ত্বানুসন্ধান ইহার উদ্দেশ্য।"

৫৭নং পার্ক ষ্ট্রীটে মাসের প্রথম বুধবার রাত্রি ৯টার সময় এই সভার নিয়মিত অধিবেশন হয়। ইহাতে বিজ্ঞান ও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে আন্দোলন হয়। সর্ব্বপ্রথমে এই সভা হইতে"এসিয়াটিক রিসার্চেস্" বাহির হয়। উহা খ্রীঃ ১৭৯৯ হইতে ১৮৩৯ অব্দ পর্য্যন্ত বাহির হয়। খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দ হইতে কাপ্তেন জেমস্, ডি, হারবার্ট, গ্লিনিংস ইন্ সায়েন্স নামক মাসিকপত্র এই সভা হইতে বাহির করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসর পরে জেম্স প্রিন্সেপ সাহেব ঐ পত্রের সম্পাদকতা গ্রহণ করিয়া ১৮৩২ অব্দ হইতে উহার নাম পরিবর্ত্তিত করিয়া, জরনাল আব দি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল এই নাম রাখেন। তিনি ১৮৩৮ অব্দ পর্য্যন্ত উহার সম্পাদক ছিলেন। এই সভা হইতে বিব্লিয়থিকা ইণ্ডিকা নাম দিয়া ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থসমূহ প্রকটিত হইতেছে। প্রথমে এই সভার একটি চিত্রশালিকা ছিল, উহা খ্রীঃ ১৮৬৮ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্টের হস্তে অর্পণ করেন। এক্ষণে সভার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রা,তাম্রশাসন মূর্ত্তি ও পুস্তকালয়মাত্র সভার হস্তে আছে। পুস্তকালয়ে অন্যূন ১৫০০০ গ্রন্থ আছে, তাহার মধ্যে প্রায় ৫০০০ সংস্কৃত, আরবী, পারসী ও হিন্দুস্থানী হস্তলিপি পুঁথী। এতদ্ব্যতীত, নেপালী ও ব্রহ্মদেশী অনেক পুঁথীও আছে। সভার সভ্যগণ প্রতিদিন ১০টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত (ছুটিবাদ) সভাস্থ দ্রষ্টব্যসকল দেখিতে পারেন। অন্য লোকের দেখিতে ইচ্ছা হইলে, সম্পাদকের নিকট অনুমতি লইতে হয়।

খ্রীঃ ১৭৮৪ অব্দের ৫ই এপ্রিল বর্ত্তমান সেণ্ট জনের গির্জার ভিত্তিপ্রস্তর প্রোথিত হয়। ইহা পাথুরিয়া গির্জা নামেই প্রসিদ্ধ। লর্ড মিণ্টোর সময় ইহার আয়তন বর্দ্ধিত হয়। এখন ইহাতে অন্যূন ৭০০ লোক বসিতে পারে।

এই স্থানেই জব চার্ণক, উইলিয়ম হামিণ্টন প্রভৃতির গোর আছে।

খ্রীঃ ১৭৮৫ অব্দে হেষ্টিংস স্বদেশে যাত্রা করেন। সেখানে তাঁহাকে স্বকৃত পাপের ফল ভুগিতে হইয়াছিল।

তাঁহার স্বদেশগমনের পর সার জন ম্যাকফারসন প্রায় ২০ মাস এ দেশের গবর্ণরী করেন। খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিস গবর্ণর জেনেরল হইয়া

আগমন করেন। এই সালেই শিবপুরের বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপিত হয়।

হেষ্টিংসের সময় যদিও কলিকাতার উন্নতি হইতেছিল বটে, কিন্তু দেশের অবস্থা বড় ভাল ছিল না। ম্যাকিণ্টস্ (Mackintosh) সাহেব বলেন,

> "It is a truth that from the Western extremity of California to the Eastern coast of Japan, there is not a spot where Judgement, taste, decency and conveniency are so grossly insulted, as in that scattered and confused chaos of houses, huts, sheds streets, lanes, alleys, windings gutters sinks and tanks which Tumbled into an and is tenquished mass of filth and corruption equally offensive to human sense and health, compose the capital ot the English Company's Government of India".

অষ্টম অধ্যায়

মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিস—রয়াল বোটানিকাল গার্ডেন—তিরেত্তা বাজার—কলিকাতায় সদর নিজামত—প্রোবিন্সিয়েল কোর্ট—সার জন সোর—ধর্ম্মতলার বাজার -সর এলুার্ড ক্লর্ক—লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস অব ওয়েলেসলি—গবর্ণমেণ্ট হাউস—এসিয়াটিক রিসার্চেস—ফোর্ট-উইলিয়ম কালেজ—বাঙ্গলা গ্রন্থ—রামায়ণ ও মহাভারত—টাউন হল—কর্ণওয়ালিসের দ্বিতীয়বার ভারতে আগমন ও মৃত্যু।

খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ম্যাকফারসন সাহেব মার্কুইস অব কর্ণওয়ালিসের হস্তে শাসনভার বুঝাইয়া দিয়া অবসর গ্রহণ করেন। কর্ণওয়ালিস দুইবার ভারতের গবর্ণর জেনেরলের পদ প্রাপ্ত হন। প্রথমবার তিনি খ্রীঃ ১৭৮৬-১৭৯৩ অব্দ পর্য্যন্ত এই পদে ছিলেন।

(১) চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং (২) মহীশূরের দ্বিতীয় যুদ্ধ ইঁহার সময়ের প্রধান ঘটনা।

খ্রীঃ ১৭৮৬ অব্দে জেনেরল কিড্ (Kyd) সাহেবের পরামর্শে শিবপুরের

রয়াল বোটানিকাল উদ্যান প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয়। ইহার কিছু উত্তরেই বিশপ্‌স্‌ কলেজ।

খ্রীঃ ১৭৮৮ অব্দে তিরেত্তা (টেরিটি) বাজার প্রথম স্থাপিত হয়। ইহা এক্ষণে বর্দ্ধমান-রাজের সম্পত্তি।

লর্ড কর্ণওয়ালিসের সময় সদর নিজামত পুনরায় কলিকাতায় আনীত হয় (১৭৯০)।

লর্ড কর্ণওয়ালিস বিচার সম্বন্ধীয় অনেক সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময়ে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানের প্রোবিন্সিয়াল কোর্ট স্থাপিত হয়।

কর্ণওয়ালিস ভারত ত্যাগ করিলে সার জন শোর বা লর্ড টিনমৌথ গবর্ণর জেনেরল হইয়া পাঁচ বৎসর এদেশ শাসন করেন। ইনিই সার উইলিয়ম জোন্‌সের জীবনীর রচয়িতা। খ্রীঃ ১৭৯৩-১৭৯৮ অব্দ পর্য্যন্ত ভারত শাসন করেন।

ইঁহার শাসন সময়ে খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে ধর্ম্মতলার বাজার স্থাপিত হয়। ইহাকে লোকে সেক্ষপীরের বাজার বলিত।

সার জন শোর ভারত ত্যাগ করিলে সার এলুার্ড ক্লার্ক কয়েকদিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন, তৎপরে লর্ড মর্ণিংটন বা মার্কুইস্‌ অব ওয়েলেস্‌লি বিলাত হইতে পৌছেন। ইনি খ্রীঃ ১৭৯৮-১৮০৫ পর্য্যন্ত গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করিয়াছিলেন।

ইঁহার সময়ে কোম্পানির অনেক রাজ্য বৃদ্ধি হয়।

ইনি হিন্দুদিগের গঙ্গাসাগরে সন্তান নিক্ষেপ প্রথা রহিত করেন।

ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ ইঁহারই সময়ে স্থাপিত হয়।

ইঁহাকে ইংরাজেরা কোম্পানির আকবর বলিতেন।

ইঁহারই সময়ে, খ্রীঃ ১৭৯৯ অব্দের ৫ই ফেব্রুয়ারিতে গবর্ণমেণ্ট হাউসের প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হইয়া ১৮০৪ অব্দ পর্য্যন্ত ইহার নির্ম্মাণে অতিবাহিত হয়। ইহার নির্ম্মাণে অন্যূন ১৩ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। ইহার ছাদের নিম্নভাগ, গবর্ণমেণ্ট শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ এচ্‌ এচ্‌ লক সাহেবের ডিজাইন অনুসারে সজ্জিত। এইখানে, মহারাণী ভিক্টোরিয়া, তৃতীয় জর্জ ও তাঁহার রাজ্ঞী, ক্লাইব, হেষ্টিংস, টিনমৌথ, কর্ণওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি, মিণ্টো, মার্কুইস অব হেষ্টিংস, অকলণ্ড, মেটকাফ্‌, এলেন্‌বরা, ডালহৌসী, মেও, জন আডম, আর্থার ওয়েলেস্‌লি, কুট, লেডি বেণ্টিঙ্ক, নবাব সাদত আলী খাঁ, পারস্যরাজ, ভরত-

পুরেশ্বর যশোবন্ত সিংহ প্রভৃতির প্রতিকৃতি আছে।

ইঁহারই সময় এসিয়াটিক রিসার্চেস্ (Asiatic Researches) বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজ খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে স্থাপিত হইয়াছিল। এই কালেজ উপলক্ষে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' এবং 'লিপিমালা', রাজীবলোচনের 'কৃষ্ণচন্দ্র চরিত', মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের 'রাজাবলী', কেরী সাহেবের বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও অভিধান রচিত হয়। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮০১ অব্দে কৃত্তিবাসের রামায়ণ ছাপাইয়া, কাশীদাসের মহাভারত ছাপাইতে আরম্ভ করেন। সুতরাং ইঁহার সময় হইতে বাঙ্গালা ভাষার চর্চ্চা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হয়, বলা যাইতে পারে।

খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে বর্ত্তমান টাউনহল প্রায় ৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নির্ম্মিত হয়। ইহার বড় ঘরটি দীর্ঘে ১৬২ ফুট ও প্রস্থে ৬৫ ফুট।

এখানে ওয়ারেণ হেষ্টিংস, ও মাকুইস অব কর্ণওয়ালিসের প্রস্তরমূর্ত্তি এবং মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার স্বামীর মূর্ত্তি, এবং লর্ড গফ, সার চার্লস মেটকাফ, দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি আছে।

খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দে ইনি ভারত ত্যাগ করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস পুনর্ব্বার গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়া, এই অব্দেই, উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের গাজীপুর নামক স্থানে প্রাণত্যাগ করেন।

নবম অধ্যায়

সর জর্জ বার্লো—আর্ল আব মিণ্টো—চার্লস মেটকাফের দৌত্য—মার্কুইস আব হেষ্টিংস—সর ডেবিড অক্টরলোনী—মনুমেণ্ট—সেণ্ট আন্ড্রুস চর্চ—হিন্দু স্কুল—ডেবিড হেয়ার—কষ্টমহৌস—বিশপস্ কলেজ—সমাচার দর্পণ—এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটি—ডাক্তার উইলিয়ম কেরি—জন আডাম—লর্ড আমহার্ষ্ট—বর্ত্তমান টাকশাল—সংস্কৃত কলেজ প্রভৃতি—আমহার্ষ্টের ভারত ত্যাগ—কলিকাতার অবস্থা।

কর্ণওয়ালিসের মৃত্যুতে, সার জর্জ বার্লো ভারতের শাসনকর্ত্তৃপদে নিযুক্ত হন। ইনি দুই বৎসর মাত্র এই কার্য্য করিয়াছিলেন। অবশেষে খ্রীঃ ১৮০৭ অব্দে আর্ল আব মিণ্টো গবর্ণর জেনেরল হইয়া ১৮১৩ অব্দ পর্য্যন্ত ভারতরাজ্য শাসন করেন।

মিণ্টোর শাসন সময়ে চার্লস মেটকাফ, গবর্ণর জেনেরল কর্তৃক প্রেরিত হইয়া পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের সহিত সন্ধি স্থাপনপূর্ব্বক বৃটিশ সাম্রাজ্যের বলবৃদ্ধি করেন।

তৎপরে লর্ড ময়রা, ভারতের গবর্ণর হন। ইনি মার্কুইস্ আব হেষ্টিংস নামেই বিশেষ পরিচিত। ইনি খ্রীঃ ১৮১৪ হইতে ১৮৩২ অব্দ পর্য্যন্ত একাদিক্রমে নয় বৎসরকাল ভারতবর্ষ শাসন করেন। ইহাঁর সময়ে নেপাল যুদ্ধ, পিণ্ডারী সমর ও শেষ মারহাট্টা সমর সংঘটিত হয়।

নেপালযুদ্ধে সেনাধ্যক্ষ সার ডেবিড অক্টরলোনী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই বীরবরের স্মরণার্থ অদ্যাপি কলিকাতায় গড়ের মাঠে অক্টরলোনী মনুমেণ্ট স্বীয় উন্নত মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহা ১৬৫ ফুট উচ্চ। এই সময়েই সেণ্ট আনড্রুর চর্চ (St. Andrew's Church or Scotch Kirk) নির্ম্মিত হয়। খ্রীঃ ১৮১৫ অব্দের ৩০শে নবেম্বর ইহার ভিত্তিপ্রস্তর প্রথম প্রোথিত হয়। ইহা লাটসাহেবের গির্জ্জা নামেই বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ইহার পরবৎসরই ডেবিড হেয়ার হিন্দুস্কুল স্থাপন করেন।

ডেবিড হেয়ার স্কটলণ্ড দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি খ্রীঃ ১৮০০ অব্দে এ দেশে আগমন করিয়া, ঘড়িওয়ালার কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তখন এদেশে বিদ্যার চর্চ্চা বড় অধিক ছিল না। তিনি দেখিলেন ইংরাজী শিক্ষার বিস্তার না হইলে দেশের উন্নতির আশা অতি অল্প, এ জন্যই হিন্দুস্কুল নামক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তৎপরে তিনি এ দেশের উপকার জন্য ও বিদ্যাবিস্তারের জন্য কায়মনে প্রায় ৪২ বৎসরকাল কাটাইয়া এই দেশেই মানবলীলা সম্বরণ করেন, ১৮৪২ অব্দের ১লা জুন তাঁহার মৃত্যু হয়। এই মহাত্মা রামগোপাল ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির উন্নতির প্রধান সহায়। তাঁহার সমাধি ও প্রতিমূর্ত্তি অদ্যাপি পটোলডাঙ্গায় বিরাজিত রহিয়াছে।

খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে কষ্টমহৌস নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই বৎসরই বিশপ্ মিড্‌লটন, বিশপ্‌স কালেজের ভিত্তি স্থাপিত করেন। কেরী সাহেব এই বৎসরেই এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সমিতি স্থাপন করেন। এই সময়েই সমাচার দর্পণ নামক বাঙ্গালা প্রথম সংবাদপত্র প্রথম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল।

এগ্রিকলটুরেল ও হর্টিকলটুরেল সমিতি (The Agricultural and Horticultural Society) বিখ্যাত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক Dr. Carey কর্তৃক খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে স্থাপিত হয়। এক্ষণে ইহার সভ্য সংখ্যা ৫০০ পাঁচ শতেরও

অধিক। ইহা এক্ষণে মেট্‌কাফ্‌ হলে স্থাপিত আছে।

যে কেরী সাহেবের চেষ্টায় এই সমিতি স্থাপিত হয়, সেই মহাত্মা অতি দরিদ্রের সন্তান ছিলেন। তাঁহার লোকের নিকট পরিচয় দিবার উপযুক্ত বংশ-মর্য্যাদা কিছুই ছিল না। তিনি অতি সামান্য লেখাপড়া শিখিয়া প্রথমে জুতা সেলাই করিতে শিক্ষা করেন, এই সামান্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত থাকিয়াও তিনি নিজ অধ্যবসায়গুণে ইংরাজী ও লাটিন শিক্ষা করেন। খ্রীঃ ১৭৯২ অব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন। এখানে দারিদ্র্য দুঃখে তাঁহাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। কিছুদিন পরে তিনি মালদহে নীলকুঠির অধ্যক্ষ হন। তথায় তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া সে প্রদেশের অনেক উপকার করেন। এখানে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি "নিউ-টেষ্টামেণ্ট" বাঙ্গালায় অনুবাদ করিয়া স্বহস্তে উহা মুদ্রিত করেন। খ্রীঃ ১৭৯৯ অব্দে তিনি মালদহ হইতে কলিকাতায় আসিয়া নীলকুঠি ক্রয় করেন। পরে মার্সমান প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া শ্রীরামপুরে গমনপূর্ব্বক, ধর্ম্মপ্রচারে যত্নবান হন। ১৮০১ অব্দে তিনি ফোর্টউইলিয়ম কালেজের বাঙ্গালার অধ্যাপক হন। এই সময়েই তাঁহার ব্যাকরণ ও কথাবলী প্রচারিত হয়। একবৎসর পরে তিনি ঐ কালেজের সংস্কৃত শিক্ষক হন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রচারিত করেন। মিণ্টোর সময়ে ইনি রামায়ণ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন ও সমাচার দর্পণ নামে একখানি সংবাদপত্র মার্সমান প্রভৃতির সাহায্যে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীঃ ১৮১৮ অব্দের ২৩শে মে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে তাঁহার এগ্রি ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটি স্থাপিত হয়। তৎপরে তিনি আইন বাঙ্গালায় অনুবাদ করেন ও একখানি অভিধান সংকলন করেন। খ্রীঃ ১৮০৪ অব্দে ৯ই জুন ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। শ্রীরামপুরের গির্জায় আজিও তাঁহার সমাধি আছে। তাঁহার স্থাপিত এগ্রি ও হর্টিকলটুরেল সোসাইটিতে অদ্যাপি তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি বিরাজিত রহিয়াছে।

মার্কুইস অব হেষ্টিংস্‌ স্বদেশে গমন করিলে, জন আডাম কিছুদিন গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন, তৎপরে খ্রীঃ ১৮২৩ অব্দের অগষ্ট মাসে লর্ড আমহার্ষ্ট ভারতবর্ষের শাসনকর্ত্তার ভার গ্রহণ করেন।

ইনি খ্রীঃ ১৮২৩-১৮২৮ পর্য্যন্ত পাঁচবৎসরকাল গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। ইঁহার শাসন সময়ে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ ও ভরতপুর অধিকৃত হয়। ইঁহারই শাসন সময়ে বর্ত্তমান টাকশাল নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। এই টাকশাল

পৃথিবীর মধ্যে সকল টাকশাল অপেক্ষা বৃহৎ। খ্রীঃ ১৮২৪ অব্দে সংস্কৃত কালেজ স্থাপিত হয়।

খ্রীঃ ১৮২৭ অব্দে হিন্দু কালেজের জন্য গৃহ নির্ম্মিত হয়। ক্রমে ক্রমে, বিদ্যাচর্চ্চার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কালেজ ষ্ট্রীটের বিদ্যামন্দিরগুলি স্থাপিত হইয়া ক্রমে ঐ অঞ্চলের শ্রীবৃদ্ধি করিতেছে। বাস্তবিক সেনেট হাউস্, হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সি কালেজ, সংস্কৃত কালেজ ও হিন্দুস্কুলের নয়নরঞ্জক দৃশ্য দেখিলে কাহার না তৃপ্তিলাভ হয়।

বেঙ্গল ক্লবও এই বৎসর স্থাপিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার উন্নতির দশা। এই সময়েই এ দেশের বিখ্যাত ব্যক্তিগণ আবির্ভূত হইয়া বঙ্গ উজ্জ্বল করেন। রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি ব্যক্তিবর্গ এই সময়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া দেশের মহিমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সে সকল কথা অন্য স্থানে আলোচিত হইবে।

দশম অধ্যায়

বটরওয়ার্থ বেলী—লর্ড উইলিয়ম কাবেন্দিস্ বেণ্টিঙ্ক—ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটি—দ্বারকানাথ ঠাকুর—বেণ্টিঙ্কের ভারত ত্যাগ।

লর্ড আমহার্ষ্টের ভারত ত্যাগের পর বেলী সাহেব চারিমাসকাল গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন। খ্রীঃ ১৮২৮ অব্দের জুলাই মাসে লর্ড উইলিয়ম কাবেন্দিস্ বেন্টিঙ্ক ভারতের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আসিয়া প্রায় সাত বৎসর কাল ভারতবর্ষ শাসন করেন, ইঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উন্নতি হয়। কলিকাতাতেও অনেক উন্নতির কার্য্য আরম্ভ হইয়াছিল।

ইঁহার সময়ে—

(১) রাজ্য সম্পর্কীয় নানা প্রকার উন্নতি সাধন,

(২) সতীদাহ প্রথা নিবারণ,

(৩) ঠগদিগের শাসন,

(৪) ইউরোপীয় প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষাদান প্রণালী স্থাপন প্রভৃতি আরম্ভ হয়।

এই সময়ে স্বর্গীয় দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রাদুর্ভূত হন। স্বর্গীয় মহাত্মা

রামমোহন রায়ও এই সময়েই সনাতন হিন্দু ধর্ম্মের সার অবলম্বনে ব্রাহ্মধর্ম্ম স্থাপনে কৃতসংকল্প হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী রামগোপাল ঘোষ এই সময়েই প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় বাগ্মীতার বলে অনেক সৎকার্য্যের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। মহাত্মা হেয়ার প্রভৃতি এই সময়ে কার্য্যক্ষেত্রে বিদ্যমান ছিলেন। ফলতঃ যে সময়ে দেশের উন্নতির সূত্রপাত হয়, সে সময় এইরূপ মণিকাঞ্চনযোগই ঘটিয়া থাকে, কিন্তু এ সকল কথা সংক্ষেপে সারিলে কলিকাতার ইতিহাস অসম্পূর্ণ থাকিবে এজন্য একটু বিস্তৃত বিবরণ আবশ্যক।

লর্ড বেণ্টিঙ্কের সময়েই ডিষ্ট্রিক্ট চারিটেবল সোসাইটি স্থাপিত হয় (১৮৩০)। খ্রীঃ ১৮৩৮ অব্দে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয়, দরিদ্র অন্ধদিগের সাহায্যের জন্য এই সভার হস্তে অনেক অর্থদান করেন।

দ্বারকানাথ যোড়াসাঁকোর প্রসিদ্ধ ঠাকুর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৭৯৪ অব্দে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার পূর্ব্ব পুরুষ জয়রাম ঠাকুর প্রথমে কলিকাতা অঞ্চলে আসিয়া সুতানুটীতে বাস করেন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের দুইজন হইতে কলিকাতার ঠাকুরদিগের দুই গোষ্ঠী হয়। দ্বারকানাথ সেই দুইজনের অন্যতম নীলমণি ঠাকুরের পৌত্র। ইঁহার জ্যেষ্ঠতাত ইঁহাকে দত্তকপুত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ বাল্যকালে, পাঠশালে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া সেরবোর্ণ সাহেবের বিদ্যালয়ে ইংরাজী শিক্ষা করিয়াছিলেন। তৎপরে রেবরেণ্ড উইলিয়ম আডাম (Rev. William Adam) গর্ডন (Mr. J. G. Gordon) ও কালডর (James Calder) সাহেবের নিকট তাঁহার বিদ্যার উৎকর্ষ সাধিত হয়। অল্প বয়সে (রাজা) রামমোহন রায়ের সহিত ইঁহার বিশেষ বন্ধুত্ব হইয়াছিল। প্রথম বয়সে হিন্দুধর্ম্মের ক্রিয়াকলাপের প্রতি ইঁহার অচলা ভক্তি ছিল, কিন্তু রাম-মোহনের সহবাসে তাহার সে সকলের প্রতি কতকটা বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল—ইহাই ক্রমে ব্রাহ্মধর্ম্মের উৎপত্তির কারণ। কিন্তু সে সকল কথা স্থানান্তরে উল্লিখিত হইবে। ইংরাজী বাঙ্গালা ব্যতীত তিনি আরব্য ও পারস্য ভাষায় ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তদ্ব্যতীত জমিদারী কার্য্যেও তাঁহার দক্ষতা ছিল। যখন তাঁহাকে জমিদারী কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে হইয়াছিল, সেই সময় হইতে তিনি ফর্গুসান (Mr. Cutler Fergusson) নামক বিখ্যাত ব্যারিষ্টারের নিকট আইন শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে তিনি বঙ্গদেশের অনেক জমিদারের আইন বিষয়ে পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। তদ্ব্যতীত তিনি বিলাতে নীল ও

রেশম চালান দিতেন, এই সময়ে চব্বিশ পরগণায় নিমকের এজেণ্ট ও কালেক্টর প্লোডেন সাহেবের দেওয়ানের পদ শূন্য হওয়াতে দ্বারকানাথ সেই পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তৎপরে তিনি বোর্ডের দেওয়ান হন। কিছুদিন পরে তিনি ঐ সমুদায় সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করেন এবং Messrs. Carr, Tagore and Co. নামে এক কুঠি স্থাপন করেন। তাঁহার এরূপ স্বাধীনভাবে ব্যবসার কথা শুনিয়া গবর্ণর জেনেরল বেণ্টিঙ্ক সাহেব তাঁহার অনেক প্রশংসা করেন। এতদ্ব্যতীত ইউনিয়ন ব্যাঙ্কের সহিত তাঁহার বিশেষ সম্পর্ক ছিল। ইনি নীল, রেশম, পাথুরিয়া কয়লা এবং চিনির ব্যবসা করিয়াছিলেন এবং পৈতৃক জমিদারীতে রাজসাহীর কালীগ্রাম, পাবনার সাহাজাদপুর, রংপুরের স্বরূপপুর, মণ্ডলঘাট পরগণার তের আনা অংশ, দ্বারবাসিনীর জগদীশপুর, যশোহরের মহম্মদশাহী, কটকের সোরগাড়া প্রভৃতি যোগ করিয়াছিলেন। তিনি দেশের উন্নতির জন্য অনেক করিয়াছিলেন। শিক্ষা সংক্রান্ত বা দাতব্য বিষয়ে যে কোন সভা সমিতি হইত, তাহাতেই তিনি যোগ দিতেন। স্বীয় সহচরগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি যে সকল কার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরকাল সকলের স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবেক সন্দেহ নাই। হিন্দু কালেজ, মেডিকেল কালেজ, সহমরণ নিবারণ, মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রভৃতিতে আমরা দ্বারকানাথ প্রভৃতির হস্ত দেখিতে পাই। তিনি ডেবিড হেয়ার ও এচ্. এচ্. উইলসন সাহেবের কার্য্যক্ষেত্রের প্রধান সহচর ছিলেন এবং মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণকে তিন বৎসরের পারিতোষিক দান জন্য দুই সহস্র টাকা দান করিয়াছিলেন। জমিদারদিগের সভাও তাঁহার একটি কীর্ত্তি।

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতার উন্নতিকল্পে যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হয়, সেই সকলের সহায়তায় তিনি যে যে কার্য্যে যেরূপ যোগ দিয়াছিলেন, সে সকল কথা যথাস্থানে উল্লিখিত হইবে।

এই অব্দেই (১৮৩৫) বেণ্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করেন, তাঁহার সময়ে কলিকাতার যে রূপ উন্নতির সময়, তাহা স্বতন্ত্ররূপে সমালোচিত হওয়া কর্ত্তব্য। এইজন্য তাহা এ অধ্যায়ে বিবৃত হইল না।

একাদশ অধ্যায়

সতীদাহ বিষয়ক আন্দোলন—ডাক্তার জন্‌স্—জে, পেগ্‌স্—বিবি ফ্যানি পার্কস—রাজা রামমোহন রায় ও তাঁহার সংক্ষিপ্ত আত্মজীবন—সতীদাহ নিবারণ সম্বন্ধে গবর্ণর জেনেরলের সহিত পরামর্শ—সতীদাহ নিবারণ—তদ্বিরুদ্ধে ধর্ম্মসভার বিলাত আপীল—সংবাদ প্রভাকর—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—ডফ্ সাহেব—আদি ব্রাহ্মসমাজ।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, বেণ্টিঙ্কের সময়ে সতীদাহ প্রথা নিবারিত হয়; এ স্থলে ঐ সম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বলা প্রয়োজন বোধ হইতেছে।

সহমরণ প্রথা বহুকাল হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। হিন্দুগণ এই প্রথাটি হিন্দু ধর্ম্মসঙ্গত বলিয়া প্রতিপালন করিয়া আসিতেছিলেন। কখন কখন পতিপ্রাণা রমণী স্বেচ্ছায় পতির জলচ্চিতায় অকাতরে দেহ ঢালিয়া দিয়া পতি-বিয়োগ দুঃখের অবসান করিতেন বটে, কিন্তু অনেক স্থলে কুটিল দায়াদগণের কূটচক্রে এরূপ ভয়ঙ্কররূপে নারীহত্যা ঘটিত, যে, তদ্দর্শনে সহৃদয় মাত্রেরই হৃদয় কাঁদিয়া থাকে। ধর্ম্মবীর আকবর সাহ এই বীভৎস কাণ্ড নিরাকৃত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং কতক অংশে সফল মনোরথও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে কার্য্য স্থায়ী হয় নাই। ইংরাজেরা প্রথমতঃ হিন্দুদিগের ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ হইবার ভয়ে এ বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই বটে, কিন্তু ক্রমে এ বিষয়ে তাঁহাদের চিত্ত আকর্ষিত হয়।

> "রাজা রামমোহন রায়ের বন্ধু আডাম সাহেব তাঁহার বিলাতের এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি যে, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গদেশে ইংরাজের রাজ্য সংস্থাপন অবধি গবর্ণমেণ্ট ও তাহার কর্ম্মচারীদিগের চক্ষুর সম্মুখে প্রতিদিন অন্ততঃ এইরূপ দুইটি হত্যাকাণ্ড সুস্পষ্ট দিবালোকে সংঘটিত হইত, এবং প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৫/৬ শত অনাথা রমণীকে এইরূপে নিহত করা হইত[১৫]।"

প্রথমে যে ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট, হিন্দুধর্ম্মে হস্তক্ষেপ ভয়ে সতীদাহ নিবারণে উপেক্ষা করিতেন, তাহাই নহে, অন্য কোন ইংরাজ যাহাতে এ বিষয়ে কোন কথা না কহেন, সে বিষয়েও সতর্ক ছিলেন, এমন কি ডাক্তার জন্স নামে একজন খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারক, "সতীদাহ নিবারণ" সম্বন্ধে আন্দোলন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রচার করিয়া ভারত হইতে বিতাড়িত হন।

খ্রীঃ ১৮২৮ অব্দের ৯ই মার্চ্চ, জে, পেগ্‌স নামক এক ব্যক্তি, "The

Suttee's cry to Britain" এবং তৎপরে বিবি ফ্যানি পার্কস (Fanny Parks) তাঁহার "Wanderings of a Pilgrim &c." নামক গ্রন্থে এই বিষয়ের হৃদয়বিদারক দৃশ্যসকল বর্ণনা করেন। তৎপরে রাজা রামমোহন রায় এই আন্দোলনে যোগ দেন।

এই সহজ ধার্ম্মিক মহাত্মা হুগলী জেলার অন্তঃপাতী খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকটবর্ত্তী রাধানগর নামক গ্রামে খ্রীঃ ১৭৭৪ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি সংক্ষেপে আত্মজীবন বর্ণনা করিয়া যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাঁহার বাঙ্গালা জীবনচরিতে[১৬] তাহার অনুবাদ প্রকাশিত আছে, এ স্থলে তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত হইতেছে।

> "আমার পূর্ব্ব পুরুষেরা উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ছিলেন। স্মরণাতীত কাল হইতে তাঁহারা তাঁহাদিগের কৌলিক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কর্ত্তব্যসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। পরে প্রায় একশত চল্লিশ বৎসর গত হইল, আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বৈষয়িক কার্য্য ও উন্নতির অনুসরণ করেন। তাঁহার বংশধরেরা সেই অবধি তাঁহারই দৃষ্টান্ত অনুসারে চলিয়া আসিয়াছেন"।
>
> * * * "কিন্তু আমার মাতামহ বংশীয়েরা কৌলিকধর্ম্মানুসারে ধর্ম্ম-যাজক ব্যবসায়ী * * *।"
>
> "আমার পিতৃবংশের প্রথা ও আমার পিতার ইচ্ছানুসারে আমি পারস্য ও আরব্য ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলাম।"
>
> * * * "আমার মাতামহ বংশের প্রথানুসারে আমি সংস্কৃত ও উক্ত ভাষায় লিখিত ধর্ম্মগ্রন্থসকল অধ্যয়নে নিযুক্ত হই * * *।"
>
> "ষোড়শ বৎসর বয়সে আমি হিন্দুদিগের পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে একখানি পুস্তক রচনা করিয়াছিলাম। উক্ত বিষয়ে আমার মতামত এবং ঐ পুস্তকের কথা সকলে জ্ঞাত হওয়াতে আমার একান্ত আত্মীয়-দিগের সহিত আমার মনান্তর উপস্থিত হইল। মনান্তর উপস্থিত হইলে, আমি গৃহ পরিত্যাগপূর্ব্বক দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলাম। ভারতবর্ষের অন্তর্গত অনেকগুলি প্রদেশ ভ্রমণ করি। পরিশেষে বৃটিশ শাসনের প্রতি অত্যন্ত ঘৃণাবশতঃ আমি ভারতবর্ষের বাহির্ভূত কয়েকটি দেশভ্রমণ করিয়াছিলাম। আমার বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর হইলে, আমার পিতা আমাকে পুনর্ব্বার আহ্বান করিলেন;—আমি পুনর্ব্বার তাঁহার স্নেহ-

লাভ করিলাম। ইহার পর হইতেই আমি ইউরোপীয়দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও তাঁহাদিগের সংসর্গে আসিতে আরম্ভ করিলাম। আমি শীঘ্রই তাঁহাদিগের আইন ও শাসনপ্রণালী সম্বন্ধে একপ্রকার জ্ঞানলাভ করিলাম। তাঁহাদিগকে সাধারণতঃ অধিকতর বুদ্ধিমান, অধিকতর দৃঢ়তাসম্পন্ন এবং মিতাচারী দেখিয়া তাঁহাদিগের সম্বন্ধে আমার যে কুসংস্কার ছিল, তাহা আমি পরিত্যাগ করিলাম; তাঁহাদিগের প্রতি আকৃষ্ট হইলাম। আমার বিশ্বাস জন্মিল, তাঁহাদিগের শাসন, বিদেশীয় শাসন হইলেও উহা দ্বারা শীঘ্র দেশবাসীগণের অবস্থোন্নতি হইবে। আমি তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেরই বিশ্বাস-পাত্র ছিলাম। পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য কুসংস্কার বিষয়ে ব্রাহ্মণদিগের সহিত আমার ক্রমাগত তর্ক বিতর্ক হওয়াতে এবং সহমরণ ও অন্যান্য অনিষ্টকর বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করাতে আমার প্রতি তাঁহাদিগের বিদ্বেষ পুনরুদ্দীপিত ও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল এবং আমাদিগের পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের ক্ষমতা থাকাতে, আমার পিতা প্রকাশ্যরূপে আমার প্রতি পুনর্ব্বার বিমুখ হইলেন, কিন্তু আমাকে কিছু কিছু অর্থসাহায্য প্রদত্ত হইত। আমার পিতার মৃত্যুর পর, আমি অধিকতর সাহসের সহিত পৌত্তলিকতার পক্ষ সমর্থনকারীদিগকে আক্রমণ করিলাম। এই সময়ে ভারতবর্ষে মুদ্রাযন্ত্র সংস্থাপিত হইয়াছিল। আমি উহার সাহায্য লইয়া তাঁহাদিগের ভ্রমাত্মক মতসকলের বিরুদ্ধে দেশীয় ও বিদেশীয় ভাষায় অনেক প্রকার পুস্তক ও পুস্তিকা প্রচার করিলাম। ইহাতে লোকে আমার প্রতি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল, যে দুই তিনজন স্কট্‌লণ্ডবাসী বন্ধু ব্যতীত আর সকলেই আমাকে পরিত্যাগ করিলেন। সেই বন্ধুগণের প্রতি ও তাঁহারা যে জাতি অন্তর্গত তাহাদিগের প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ।"

"আমার সমস্ত তর্ক বিতর্কে আমি কখন হিন্দুধর্ম্মকে আক্রমণ করি নাই। উক্ত নামে যে বিকৃত ধর্ম্ম এক্ষণে প্রচলিত, তাহাই আমার আক্রমণের বিষয় ছিল। আমি ইহাই প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলাম যে, ব্রাহ্মণদিগের পৌত্তলিকতা তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরণের ও যে সকল শাস্ত্রকে তাঁহারা শ্রদ্ধা করেন ও যদনুসারে তাঁহারা চলেন বলিয়া স্বীকার পান, তাহার মতবিরুদ্ধ। আমার

. মতের প্রতি অত্যন্ত আক্রমণ ও বিরোধ সত্বেও আমার জ্ঞাতিবর্গের ও অপরাপর লোকের মধ্যে কয়েকজন অত্যন্ত সম্রান্ত ব্যক্তি আমার মত গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন।"

"এই সময়ে ইয়ুরোপ দেখিতে আমার বলবতী ইচ্ছা জন্মিল। তত্রত্য আচার, ব্যবহার, ধর্ম্ম ও রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞানলাভ করিবার জন্য স্বচক্ষে সকল দেখিতে বাসনা করিলাম। ইত্যাদি"—

সতীদাহ নিবারণ পক্ষে যত্ন করাতে রামমোহনকে অনেক লাঞ্ছনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কিন্তু তিনি সেসকলই অচলের ন্যায় অটল হইয়া সহ্য করিয়াছিলেন।

খ্রীঃ ১৮০৫ অব্দ হইতে গবর্ণমেণ্ট বুঝিয়াছিলেন যে, সহমরণ প্রথা নিবারণ করা একান্ত প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। পরে গবর্ণর জেনেরল লর্ড উইলিয়ম কেভেণ্ডিস বেণ্টিঙ্ক, ইঁহারই যুক্তিতে, সতীদাহ নিবারণে হিন্দুর ধর্ম্মে হস্তক্ষেপ করা হইবে না, বুঝিয়া খ্রীঃ ১৮২৯ অব্দের শেষভাগে ইহা আইন দ্বারা নিবারিত করেন।

এই উপলক্ষে বেণ্টিঙ্ককে অভিনন্দন পত্র প্রদান করা হয়, তাহাতে বাবু দ্বারকানাথ ঠাকুর, বাবু কালীনাথ রায়, তেলেনীপাড়ার বাবু অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি তিন চারিজন লোক ব্যতীত দেশের কোন সম্রান্ত লোক স্বাক্ষর করেন নাই।

সতীদাহ নিবারণের আইন রদের জন্য ধর্ম্মসভা বিলাতে আপীল করেন। সেই সময়ে খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে মহাত্মা রামমোহন রায় বিলাত গমন করেন।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকর বাহির হইতে আরম্ভ হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত খ্রীঃ ১৮০৯ অব্দে ত্রিবেণীর পরপারস্থ কাঞ্চনপল্লী বা কাঁচড়াপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম হরিনারায়ণ গুপ্ত। ইঁহারা বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। ইনি যদিও বাল্যকালে রীতিমত শিক্ষালাভ করেন নাই তথাপিও এক কবিত্বগুণেই আজ তিনি বঙ্গদেশে বিখ্যাত। সংবাদ প্রভাকর প্রথম সাপ্তাহিকরূপে প্রকাশিত হইয়া ক্রমে ১৭৬১ শকের ১লা আষাঢ় হইতে প্রাত্যহিকরূপে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইয়া অদ্যাপিও প্রকাশিত হইতেছে। তৎপরে ইনি সাধুরঞ্জন ও পাষণ্ড পীড়ন নামে আরও দুইখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করেন, এতদ্ব্যতীত প্রতি মাসে কবিতাময়ী মাসিক প্রভাকর প্রকাশিত

হইত। এতদ্ব্যতীত ইনি ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ কবিকঙ্কণ প্রভৃতি কবিগণের জীবনী সম্বন্ধে যাহা কিছু সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন প্রকাশিত করিয়াছিলেন। ইনি পাঁচালীর দলে হাফ আখড়াই প্রভৃতিতে গীতাদি রচনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত প্রবোধ প্রভাকর, হিত প্রভাকর, বোধেন্দুবিকাশ প্রভৃতি রচনা করিয়া খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে ইহলোক ত্যাগ করেন। এই সময়েই মহাত্মা ডফ্‌ কলিকাতায় আগমন করিয়া তাঁহার বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ঐ বিদ্যালয় প্রথম রাজা রামমোহন রায়ের সাহায্যে ব্রাহ্মসমাজ গৃহেই স্থাপিত হয়।

খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলিকাতায় ব্রাহ্মসমাজ প্রথম স্থাপিত হয়। এই সমাজ অদ্যাপি যোড়াসাঁকোতে বর্ত্তমান রহিয়াছে, ইহারই বর্ত্তমান নাম আদি ব্রাহ্মসমাজ।

দ্বাদশ অধ্যায়

সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা—রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব—শব্দকল্পদ্রুম—ধর্ম্মসভার বিলাত আপীলের ফল—মেডিকেল কলেজ—সার চার্লস মেট্‌কাফ—'মুদ্রণ স্বাধীনতা' আইনের মূলমর্ম্ম—মেট্‌কাফ হল—কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে সঙ্গেই 'সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা' সংস্থাপিত। রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভার সভাপতি ছিলেন।

স্যর রাধাকান্ত খ্রীঃ ১৭৯৩ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। শোভাবাজার রাজবংশের প্রসিদ্ধ রাজা গোপীমোহন দেব তাঁহার পিতা। তিনি বাঙ্গালা, হিন্দী, পারসী, আরবী, ইংরাজী ও সংস্কৃতে সুশিক্ষিত ছিলেন। তাঁহার সঙ্কলিত "শব্দ কল্পদ্রুম" আজিও তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিতেছে। গোপীকান্ত সিংহের প্রপৌত্রীর সঙ্গে তাঁহার বিবাহ হয় এবং তাঁহার গর্ভে কুলধুরন্ধর তিন পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ঐ তিন পুত্র যথাক্রমে মহেন্দ্রনারায়ণ, রাজেন্দ্রনারায়ণ ও দেবেন্দ্রনারায়ণ নামে পরিচিত। তাঁহার বিদ্যার পুরস্কারস্বরূপ, বঙ্গ, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জর্ম্মনী, ডেন্মার্ক, রুসিয়া ও আমেরিকার অনেক সভা, তাঁহাকে স্ব স্ব সভাশ্রেণীভুক্ত করিয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে তিনি কলিকাতার মাজিষ্ট্রেট পদ ও খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দে পৈতৃক রাজা উপাধি ও খেলাত কৌন্সিল হইতে প্রাপ্ত হন। খ্রীঃ ১৮৪৩ অব্দে গয়া গমন প্রসঙ্গে মুর্শিদাবাদের নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নবাব সাহেবও তাহাকে খেলাত প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

"শব্দকল্পদ্রুম" তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। তিনি তদ্ব্যতীত স্কুল বুক সোসাইটীতে "নীতিকথা", "বাঙ্গালা শিক্ষা" প্রভৃতি পুস্তক, বালকগণের শিক্ষা-সৌকর্য্যার্থে রচনা করিয়া অর্পণ করেন। পারস্য ভাষায়ও তাঁহার শিল্পিনৈপুণ্য অল্প ছিল না। ঐ ভাষায় তিনি "হেকমতে আশ্‌পীর" নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এ গ্রন্থ তিনি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া বিলাতে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে প্রেরণ করিয়াছিলেন। এইরূপে গ্রন্থাদি প্রণয়ন জন্য তিনি গ্রন্থ জগতে একজন উপযুক্ত লেখক ছিলেন বলিতে হইবে। সনাতন ধর্ম্মরক্ষার জন্যও তিনি অল্প চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার আশ্রিত সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা, সনাতন ধর্ম্মের রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিয়াছিল।

পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা "সতীদাহ নিবারণ আইন" রদ করিবার জন্য বিলাতে আপীল করিয়াছিলেন কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই

খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে মহাত্মা বেন্টিঙ্ক কলিকাতার মেডিকেল কলেজ স্থাপন করেন। এই সময়ে এ দেশে চিকিৎসার বড়ই দুরবস্থা ছিল। বৈদ্যকশাস্ত্রের রীতিমত আলোচনা না থাকায় চিকিৎসকের সংখ্যা এত অল্প হইয়াছিল যে অল্পবিত্ত লোকদিগের পক্ষে চিকিৎসা একপ্রকার দুষ্প্রাপ্যই হইয়াছিল। মহাত্মা বেন্টিঙ্ক দেশের সেই কষ্ট নিবারণের জন্য এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে বর্ত্তমান কলেজ গৃহ নির্ম্মিত হয়। ক্রমেই ইহার উন্নতি সাধিত হইতেছে।

মহাত্মা বেন্টিঙ্ক ভারত ত্যাগ করিলে, তাঁহার কৌন্সিলের প্রধান সভ্য সার চার্লস মেট্‌কাফ অতি অল্প দিনের জন্য (খ্রীঃ ১৮৩৫-৩৬) ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরলের কার্য্য করেন, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে ইনি যেরূপ কার্য্য করিয়া গিয়াছেন তাহাতে ইঁহার নাম চিরকাল ভারতবাসীর স্মৃতিপথে জাগরূক থাকিবে। ভারতে মুদ্রণ-স্বাধীনতা ইঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি।

পূর্ব্বে, কি ইংরাজী, কি বাঙ্গালা, কোন সংবাদপত্রেরই স্বাধীনতা ছিল না। হেষ্টিংসের সময়ে "হিকের গেজেট" নামে একখানি ইংরাজী সংবাদপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়, এ কথা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। লর্ড ওয়েলেসলির সময় যখন ইংরাজ ফরাসীতে ঘোরতর বিবাদ চলিতেছিল, সেই সময়ে সংবাদপত্রের জন্য এই নিয়ম হয় যে রীতিমত পরীক্ষিত না হইয়া কোন প্রবন্ধ সংবাদপত্রে

প্রকাশিত হইতে পারিবে না। এই বিধি লঙ্ঘিত হইলে সংবাদ পত্রের স্বত্বাধিকারীকে বিলাতে ফিরিয়া যাইতে হইত, এ দেশে বাস করিবার অধিকার আর তাঁহার থাকিত না। এই নিয়ম অবিচ্ছিন্ন ভাবে অনেকদিন চলিয়া আসিয়াছিল। লর্ড হেষ্টিংস সে নিয়মে তত লক্ষ্য রাখেন নাই; তাঁহার সময়ে সংবাদপত্রে তাঁহার কার্য্য সমালোচিত হইতে পারিত। তৎপরে আবার আডাম সাহেব কর্ত্তৃক ঐ নিয়ম পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয় এবং "কলিকাতা জর্ণলের" এডিটর ভারতবর্ষ হইতে নিষ্কাশিত হন।

মেটকাফ গবর্ণরজেনেরল হইয়াই ঐ আইন রদ করেন। খ্রীঃ১৮৩৫অব্দের এপ্রিল মাসে মুদ্রণ স্বাধীনতা সম্বন্ধীয় আইন বিধিবদ্ধ হয়। আইনের স্থূল মর্ম্ম এই—

> "ব্রিটিশ রাজ্যে যে সমস্ত সংবাদপত্র আছে বা হইবে তাহার মুদ্রাকর ও প্রকাশকদিগকে যে যে বিভাগে ঐ সমস্ত সংবাদপত্র বাহির হইবে সেই সেই বিভাগের মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইয়া, আপনাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে হইবে। এই অবধি সমস্ত মুদ্রিত পুস্তক, পত্রিকা ও কাগজাদিতেই মুদ্রাকর ও প্রকাশকের নাম থাকিবে। যাহার মুদ্রাযন্ত্র থাকিবে, তাহাকেই যথানিয়মে তদ্বিষয় স্বীকার করিতে হইবে। যাহারা এই আইনের কোন ধারার বিরুদ্ধে কার্য্য করিবে, তাহারা জরিমানা ও কারাদণ্ড পাইবে। সংবাদপত্রাদির প্রকাশক ও মুদ্রাযন্ত্রের অধিকারীর নাম ধাম প্রকাশ করা ব্যতীত নূতন আইন মুদ্রণ-স্বাধীনতায় অন্য কোনরূপে হস্তক্ষেপ করিবে না।"[১৭]

খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এই আইন অনুসারে কার্য্য হইতে আরম্ভ হয়। মেটকাফের এই মহৎ কার্য্য চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ভাগীরথীতীরে "মেটকাফ হল" নামক সুপ্রশস্ত ও সুদৃশ্য অট্টালিকা দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। এই গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দে প্রোথিত হইয়া ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য ১৮৪৪ অব্দে সমাপ্ত হয়।

মেটকাফ সাহেবের শাসন সময়ে, খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দের আগষ্ট মাসে, একটি সাধারণ সভা আহূত হইয়া স্থির হয় যে কলিকাতায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার স্থাপিত হওয়া আবশ্যক। তদনুসারে "কলিকাতা সাধারণ গ্রন্থাগার" (Calcutta Public Library) খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দের মার্চ মাসে স্থাপিত হয়। প্রথমতঃ গ্রন্থাগারটি এস্প্লানেডে ডাঃ এফ., পি, ষ্ট্রং (Dr. F. P. Strong)

সাহেবের বাটিতে অবস্থিত ছিল। তথায় উহা খ্রীঃ ১৮৪১ অব্দের জুলাই পর্য্যন্ত অবস্থিত ছিল। তৎপরে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে স্থানান্তরিত হয়। তথায় খ্রীঃ ১৮৪৪ অব্দের জুন মাস পর্য্যন্ত ছিল, তৎপরে মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত হয়, এবং ঐ গৃহে ইহা এ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মেটকাফ হল নির্ম্মাণ—মেটকাফের স্থলে লর্ড অক্লাণ্ড—অক্লাণ্ডের সময়ের প্রধান প্রধান ঘটনা—ব্লাক অ্যাক্ট—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য প্রাপ্তি—মহারাণীর সংক্ষিপ্ত জীবনী—মেকানিক্স ইনষ্টিটিউসন—ডাক্তার ফ্রেড্‌রিক করবিন্—মেকানিক্স ইনষ্টিটিউসনের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত—তত্ত্ববোধিনী সভা—মতিলাল শীলের দাতব্য বিদ্যামন্দির—জর্জ টমসন—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মূল স্থাপন—অক্লাণ্ডের ভারত ত্যাগ।

মেটকাফ হল সি, কে, রবিন্সন্ সাহেবের তত্ত্বাবধানে, বরণ কোম্পানীর দ্বারা প্রস্তুত হয়। ইহার নির্ম্মাণ ব্যয় সাধারণের নিকট হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল, এগ্রি-হর্টিকল্‌চুরাল সোসাইটী এবং পাবলিক লাইব্রেরীর অর্থ হইতেও ইহার নির্ম্মাণে অনেক সহায়তা হয়। ইহা যদিও ভাগীরথীতীরে অবস্থিত বটে, কিন্তু ইহার প্রবেশদ্বার হেয়ার ষ্ট্রীটে। এইখানেই মহাত্মা মেটকাফের আবক্ষ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে।

যাহাই হউক এই মহাত্মা বড় অধিক দিন ভারতবর্ষের উপকার ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারিলেন না। যাহার অদৃষ্ট তিমিরাবৃত, তাহার সৌভাগ্য দামিনী চমকের ন্যায় ক্ষণস্থায়ী। খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দের অবসান হইতে না হইতেই লর্ড অক্লাণ্ড গবর্ণর জেনেরল পদে নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষ সমরানলে দগ্ধ হইয়াছিল।

ইঁহারই সময়ে—

(১) অযোধ্যার রাজ্যাধিকার লইয়া গোলযোগ ঘটে।

(২) সাতারার রাজার বিদ্রোহও একটি প্রধান ঘটনা।

(৩) আফগানিস্থানে যুদ্ধ বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

(৪) অহিফেন ব্যবসায়ের শ্রীবৃদ্ধির জন্য চীনরাজের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। ব্ল্যাক অ্যাক্ট লইয়া আন্দোলন এই সময়ে প্রধান ঘটনা।

এই সময়েই (খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দ) মহারাণী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই উপলক্ষে কলিকাতার অধিবাসীগণ মহারাণীকে আপনাদের হৃদয়ের কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপক অভিনন্দন অর্পণ করেন।

যাঁহার শাসনে ভারত নানারূপ সুবিধা ভোগ করিতেছে, যাঁহার শাসনে থাকিয়া আমরা সুখী, তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী এস্থলে বোধ হয়, অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

মহারাণী ভিক্টোরিয়া তৃতীয় জর্জের পঞ্চম সন্তান এডওয়ার্ড (Edward Duke of Kent)-এর কন্যা। ইঁহার মাতার নাম ভিক্টোরিয়া মেরিয়া লুইসা অব্ সাক্সি কোবর্গ সালফিল্ড। ইঁহার জন্মের আটমাস পরেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। ইনি অতি অল্প বয়সেই নিজের প্রতিভাবলে বৈদেশিক ভাষা পর্য্যন্ত অভ্যাস করিতে সমর্থ হন। খ্রীঃ ১৮৩৫ অব্দে স্থির হয় যে তিনিই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজ্ঞী পদপ্রাপ্ত হইবেন। দুই বৎসর পরে, খ্রীঃ ১৮৩৭ অব্দের ৩০শে জুন, রাজ্ঞীর খুল্লতাত রাজা চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হয়। সেই সময়ে ইনি অষ্টাদশ বর্ষমাত্র বয়ঃক্রমে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাজ্ঞী-পদ প্রাপ্ত হন। খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দের ১০ই ফেব্রুয়ারীতে, প্রিন্স আলবার্ট ফ্রান্সিস্ আগষ্টস্ চার্লস এমানুয়েল, ডিউক অব্ সাক্সি, প্রিন্স অব্ সাক্সি, কোবর্গ ও গথার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়।

খ্রীঃ ১৮৪০ অব্দে মহারাণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ১৮৪১ অব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্রের জন্ম হয়। খ্রীঃ ১৮৬১ অব্দে মহারাজ্ঞী বিধবা হন। তাঁহার রাজত্বকাল নানা ঘটনাজালে জড়িত। তাঁহার ভারতেশ্বরী উপাধি গ্রহণ প্রভৃতির কথা আমরা স্থানান্তরে উল্লেখ করিব।

এই সময়ে ভারত রাজ্যের সহিত মহারাণীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সম্বন্ধ ছিল না।

খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দের প্রারম্ভেই কলিকাতায় একটি মেকানিক্স্ ইন্‌ষ্টিটিউসন স্থাপনের কল্পনা হয়। ডাক্তর ফ্রেড্‌রিক করবিন্ প্রভৃতি এই বিদ্যামন্দির স্থাপনের প্রধান উদ্যোগী।

ফ্রেড্‌রিক করবিন্ খ্রীঃ ১৭০৯ অব্দে মে মাসে মানচেষ্টর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। খ্রীঃ ১৮১৩ অব্দে তিনি বঙ্গরাজ্যে চিকিৎসক হইয়া আগমন করেন। খ্রীঃ ১৮১৪ অব্দে তিনি সৈন্য চিকিৎসক হইয়া তরাই পথে নেপাল যাত্রা করেন। সৈন্যগণ তরাই অঞ্চলের ভয়ঙ্কর জ্বরে আক্রান্ত হয়। ইনি তাহাদের চিকিৎসা দ্বারা ঐ জ্বরের স্বরূপাদি বিশেষ রূপ বুঝিয়া খ্রীঃ ১৮১৮ অব্দে "তরাই জ্বরের"

লক্ষণ ও চিকিৎসাদিবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তৎপরে তিনি আরও কয়েকখানি চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে তিনি মেডিকেল জর্ণালের এডিটর হন, এবং খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দে হইতে ইণ্ডিয়া রিবিউ নামক পত্রিকা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ পত্র তিনি খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দ পর্য্যন্ত চালাইয়া গ্রাণ্ট সাহেবের হস্তে উহার পরিচালনভার অর্পণ করেন।

খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দের ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবারে টাউন হলে একটি বৃহতী সভা আহূত হয়। তাহা হইতে ঐ বিদ্যামন্দির স্থাপন প্রস্তাব স্থিরীকৃত হয়।

প্রথমতঃ ডব্লিউ ব্রাইন সাহেবের বাটীতে একটি সমিতি আহূত হইয়া এই বিদ্যামন্দির স্থাপনের ইতিকর্ত্তব্যতা বিষয়ে স্থিরীকৃত হয়; তদনুসারে জি, গ্রাণ্ট সাহেব একখানি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত করেন। তৎপরে উল্লিখিত ২৬শে ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার অপরাহ্নে একটি মহতী সভা আহূত হয়, সর জন পিটর গ্রাণ্ট ঐ সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেইদিন জি, গ্রাণ্ট ও সি, গ্রাণ্টকে সম্পাদক, সর জন পিটর গ্রাণ্টকে সভাপতি ও রেবরেণ্ড টি বোয়াজ ও ডাঃ এফ্, করবিনকে সহকারী সভাপতি এবং ২৩ জন এদেশীয় ও বিদেশীয় সভ্যে ম্যানেজিং কমিটি গঠিত হইয়া বিদ্যালয়ের কার্য্যারম্ভ হয়। ঐ দিনেই প্রায় ১০০্ টাকা চাঁদা স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রথমতঃ যেরূপ দেখা গিয়াছিল তাহাতে উহা স্থায়ী হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। প্রথম প্রথম ইহার কার্য্য টাউনহলেই হইত। কিন্তু ঐ স্থানের দৈনিক ব্যয় অনেক, এজন্য বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগণ সাঁ স্যুসি থিয়েটারের অধ্যক্ষদিগের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া, তথায় বিদ্যালয় স্থানান্তরিত করিলেন এবং বিদ্যালয়ের জন্য একটি নিজস্ব বাটী নির্ম্মাণের চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে গবর্ণমেণ্ট হাউসের পূর্ব্ব সম্মুখে একটি পুরাতন গৃহ স্থির হইল ও তাহার সংস্কার আরম্ভ হইল। এদিকে বিদ্যালয় সাঁ স্যুসি থিয়েটার হইতে মিঃ ভস্ সাহেবের বাটিতে স্থানান্তরিত হইল। নূতন-বাটী নির্ম্মিত হইলে, সি, গ্রাণ্ট একটি ড্রয়িং ক্লাস খুলিলেন, উহা সপ্তাহে দুইদিন মাত্র খোলা হইত। এই বিদ্যামন্দিরে যে সকল বিষয় বক্তৃতা দ্বারা শিখান হইত, তাহার কতক তৎকালিক সাময়িকপত্রে কতক বা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু এই সময়েই ক্রমে ক্রমে বিদ্যালয়ের অধঃপতন আরব্ধ হয়। ক্রমে আর লোক যুটিত না। ইহাকে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন ফল হইল না।

ঠিক এই সময়ে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের যত্নে তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত

হয়। এবং দ্বারকানাথ বিলাতে যাইবার জন্য ইচ্ছুক হন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের ৩রা জুন কলিকাতায় একটি ভয়ানক ঝড় হয়।

এই বৎসরেই কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী স্বর্গীয় মতিলাল শীলের দাতব্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সংপ্রতি উহার একটি সুন্দর অট্টালিকা নির্ম্মিত হইয়াছে। এতদিন উহা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভাড়াটিয়া বাটীতে ছিল।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের জানুয়ারী মাসে দ্বারকানাথ বিলাত যাত্রা করেন।

দ্বারকানাথ বিলাত গমনে উদ্যত হইলে, তাঁহার দেশীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তাঁহার সঙ্গে চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, পরমানন্দ মৈত্র, তিনজন হিন্দু ভৃত্য, একজন মুসলমান খানসামা ও ডাক্তার ম্যাগগোয়ের বিলাত গিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ পথে নানাস্থান দর্শন করিয়া জুন মাসে ইংলণ্ডে উপস্থিত হন। ১৬ই জুন মহারাণীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ব্রিটিশ দ্বীপের নানা স্থান দর্শন করিয়া ও উপযুক্ত অভ্যর্থনা লাভ করিয়া ১৫ই অক্টোবর লণ্ডন ত্যাগ করেন এবং স্বদেশাভিমুখে আগমন করিতে আরম্ভ করেন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দের শেষে তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার সহিত জর্জ টমসন ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

জর্জ টমসন ১৮০৪ অব্দের ১৮ই জুন লিবরপুল নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার দুই বৎসর বয়সের সময় তাঁহার পিতা মাতা লণ্ডনে আগমন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের তাদৃশ সঙ্গতি ছিল না, এজন্য তাঁহার বিদ্যাশিক্ষা প্রায় গৃহেই হইয়াছিল। দ্বাদশবর্ষ বয়সে তিনি চাকরি করিতে নিযুক্ত হন এবং নানা প্রকার চাকুরি করিয়া খ্রীঃ ১৮৩০ অব্দে বিবাহিত হন। ইনি দাস-ব্যবসায় লোপের জন্য অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং ইংলণ্ডের নানাস্থানে এই দাস-ব্যবসায় লোপের জন্য বক্তৃতা করিয়া লোকের সহানুভূতি আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করেন। খ্রীঃ ১৮৩৪ অব্দে ঐ উপলক্ষেই তিনি সপরিবারে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌সে গমন করেন। সেখানে অনেকে তাঁহার শত্রু হয়। কিন্তু তিনি ভীত হইবার লোক ছিলেন না। তিনি প্রাণপণে স্বকার্য্য সাধনে চেষ্টা করিয়া, অনেককে আপনার দলভুক্ত করেন, অবশেষে খ্রীঃ ১৮৩৬ অব্দে ইংলণ্ডে পুনরাগমন করেন। তথায় ভারত হিতকর অনেক বিষয়ের আন্দোলন করিয়া, অবশেষে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন।

ইনি কলিকাতায় আসিয়া তৎকালের যুবক সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া

ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের মূল স্থাপিত করেন।

খ্রীঃ ১৮৪২ অব্দেই লর্ড অকলাণ্ড ভারত ত্যাগ করেন। তাঁহার ভারত ত্যাগের পূর্ব্বে লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় আসিয়াছিলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ইডেন গার্ডেন—লর্ড এলেনবরা—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্ত—লর্ড হার্ডিঞ্জ—দ্বারকানাথের দ্বিতীয়বার বিলাতযাত্রা—ডাঃ সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী—দ্বারকানাথের মৃত্যু—গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট—মেডিকেল কলেজ হস্পিটাল।

মহাত্মা অক্‌লাণ্ডের ভগিনীগণ—(Misses Eden) ইডেন উদ্যানের স্থাপনা দ্বারায় আপনাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী করিয়া যান। এই উদ্যান কলিকাতায় একটি প্রধান দ্রষ্টব্য স্থান।

লর্ড অক্‌লাণ্ডের পর লর্ড এলেনবরা ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

এই সময়ে (১৭৬৫ শকের ভাদ্র মাস হইতে) তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত এই পত্রের সম্পাদক হইয়া ১২ বৎসর-কাল ইহার কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

এলেনবরার পর লর্ড হার্ডিঞ্জ গবর্ণর জেনেরল হন (১৮৪৪-১৮৪৮)। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহোদয় দ্বিতীয়বার বিলাত যাত্রা করেন। এইবার ইনি নিজ ব্যয়ে দুইজন ও গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে দুইজন ছাত্রকে কলিকাতা মেডিকেল কালেজ হইতে বিলাতে লইয়া যান। ইঁহাদের অন্যতম ডাক্তার সূর্য্যকুমার গুডিব চক্রবর্ত্তী নামে খ্যাত হইয়াছেন।

খ্রীঃ ১৮৪৬ অব্দের ১লা আগষ্ট দ্বারকানাথ বিলাতেই মানবলীলা সম্বরণ করেন। ২রা ডিসেম্বর ইঁহার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ ও স্মরণচিহ্ন স্থাপন জন্য কলিকাতা টাউন হলে এক মহতী সভা সম্মিলিত হইয়াছিল।

এই সময়ে কলিকাতার গোয়ালিয়র মনুমেণ্ট নির্ম্মিত হয় এবং মেডিকেল কালেজ হস্পিটালের ভিত্তি প্রোথিত হয়।

পঞ্চদশ অধ্যায়

লর্ড ড্যালহৌসী—বিডন বালিকা বিদ্যালয়—মদনমোহন তর্কালঙ্কার—ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন—দেশীয় ভাষাশিক্ষার ব্যবস্থা—কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়—সোসাইটি ফর্ দি প্রোমোসন অব ইণ্ডষ্ট্রীয়াল আর্টস্—প্রথম আর্ট ষ্টুডিওর কার্য্য বিবরণ—শিক্ষাদান প্রণালী—মুসে রিগো—কলিকাতার প্রথম আর্ট ষ্টুডিও।

খ্রীঃ ১৮৪৮ অব্দে লর্ড ড্যালহৌসী ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনেরল হইয়া আগমন করেন। ইঁহার শাসনকাল অশান্তিময় ঘটনাজালে জড়িত। ইঁহার শাসনের ফল সিপাহী যুদ্ধ।

খ্রীঃ ১৮৫০ অব্দে মাননীয় জে, ই, ডি, বীটন সাহেবের প্রসিদ্ধ মহিলা বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় এ বিষয়ে তাঁহাকে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

তর্কালঙ্কার মহাশয় ১৭৩১ শকে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বিল্বগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা ৺রামধন চট্টোপাধ্যায় কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের একজন পুথিলেখক ছিলেন। তর্কালঙ্কার সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করেন। পঠদ্দশায় পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সঙ্গে বিশেষ সৌহৃদ্য হয়। পঠদ্দশাতেই ইনি রসতরঙ্গিণী ও বাসবদত্তা রচনা করেন। বালক বালিকাগণের প্রথম শিক্ষার্থ তিনভাগ শিশুশিক্ষা রচনা করিয়া প্রচারিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পর আর বড় গ্রন্থ রচনা করেন নাই। ইনি প্রথমে জজ পণ্ডিত পরে ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট হন। ১৭৭৯ শকে কান্দীগ্রামে তিনি ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করেন।

খ্রীঃ ১৮৫১ অব্দ হইতে টমসনের সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন নামে বিখ্যাত হয়।

সম্ভবতঃ এই সময় হইতেই এখানে হোমিওপ্যাথির চর্চ্চা আরম্ভ হয়, এবং দেশীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য আয়োজন হইতে আরম্ভ হয়।

কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ও এই সময়ে স্থাপিত হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৫৪ অব্দে এদেশে ব্যবহারিক শিল্পের (Industrial Art) উন্নতি সাধন মানসে "সোসাইটি ফর দি প্রোমোসন অব ইণ্ডষ্ট্রীয়াল আর্টস" (Society for the Promotion of Industrial Arts) নামে একটি সমিতি সংগঠিত হয়। ঐ সমিতিতে দেশীয় ও বিদেশীয় অনেক ভদ্রলোক মিলিত হন। ইহার প্রথম

অধিবেশন. ঐ বৎসর মার্চ্চ মাসে মহাত্মা হজসন প্রাট সাহেবের আবাসে হইয়াছিল। সার সিসিল বিডন ইহার সভাপতি হন, এবং রেবরেণ্ড জে, লঙ, উইলিয়ম মনি, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ প্রভৃতি মহোদয়গণ ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির সভ্য হন। প্রথমতঃ স্থির হয়, ইহাতে—

(১) —গঠিত দ্রব্য (Models) এবং প্রকৃত দ্রব্য (Natural objects) দৃষ্টে অঙ্কন ও প্রাসাদ সম্পর্কীয় অঙ্কন (Architectural drawings)—

(২) —এচিং (Etching)-ধাতুর উপর খোদাই কার্য্য, কাষ্ঠের উপর খোদাই কার্য্য (Wood Engraving), লিথোগ্রাফি—

(৩) —মৃন্ময়পাত্র নির্ম্মাণ (Pottery) এবং মৃত্তিকা, মোম প্রভৃতিতে বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণ প্রভৃতি—

শিক্ষা দেওয়া হইবে। উচ্চ অঙ্গের শিল্পশিক্ষা দিবার উদ্দেশ্য আদৌ ছিল না। যাহাতে দেশের কতকগুলি লোক সহজে জীবিকার্জ্জনে সমর্থ হয়, সেই উদ্দেশেই ব্যবহারিক শিল্প বিদ্যালয় (The Calcutta School of Industrial Arts) এই নামে বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। মুসে রিগো (M. Regaud) সাহেবের তত্ত্বাবধানে বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ হয়। অক্টোবর মাসে মহাত্মা রিগো ৩০০ টাকা বেতনে মডেলিং ও আর্কিটেক্‌চুরাল ড্রয়িং এর শিক্ষকরূপে নিযুক্ত হন। তৎপরবর্ষে ফাউলার সাহেব বিলাত হইতে আসিয়া এন্‌গ্রেভিং ও লিথোগ্রাফি ক্লাসের ভার গ্রহণ করেন। কিন্তু অতি অল্পদিন পরেই তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে এন্‌গ্রেভিং ক্লাস বন্ধ হয়; ফ্রেজার ও বেনেট সাহেব লিথোগ্রাফির ক্লাস চালাইয়াছিলেন। তৎপরে খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে হুইট্‌লি সাহেব আসিয়া এন্‌গ্রেভিং ক্লাসের ভার গ্রহণ করেন, এই সময় লিথোগ্রাফি ক্লাস বন্ধ হয়।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভিন্নরূপ বেতন লইয়া নিম্নলিখিত বিষয় গুলি শিক্ষা দেওয়া চলিতে থাকে—

১. মুসে বি, রিগো সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রাতে ৬॥ টা হইতে ৮॥ টা পর্য্যন্ত মৃন্ময় গঠন (Modelling) ও প্লাষ্টারের ছাঁচ (Moulding) নির্ম্মাণ শিক্ষা। বেতন মাসিক ১॥০ টাকা।

২. মিঃ জর্জ হুইট্‌লির তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১১টা হইতে ৩টা ও একদিন অন্তর প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত এন্‌গ্রেভিং শিক্ষা। বেতন মাসিক বার আনা।

৩. মুসে বি, রিগো সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত ফিগার ড্রয়িং (Figure Drawing) শিক্ষা। বেতন মাসিক বার আনা।

৪. জর্জ হুইট্‌লি সাহেবের তত্ত্বাবধানে একদিন অন্তর প্রাতে ৬॥টা হইতে ৮॥টা পর্য্যন্ত ল্যাণ্ডস্কেপ ও পরিপ্রেক্ষিত ড্রয়িং (Perspective Drawing) শিক্ষা। মাসিক বেতন বার আনা।

৫. মুসে ম্যালিয়েট সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রতিদিন ১০টা হইতে ৪টা পর্য্যন্ত ফটোগ্রাফি শিক্ষা। মাসিক বেতন ১॥০ টাকা।

এই পাঁচটি ক্লাস ছিল। এই সময় মেডিকেল কালেজের নিকট পটলডাঙ্গায় বিদ্যালয়ের কার্য্য হইত। তৎপূর্ব্বে বিদ্যালয়ের বেতন ছিল না।

এই সময় মুসে রিগো নিজে একটি কারখানা স্থাপন করেন, তাহাতে তিনি বিদ্যালয়ের ভাল ভাল ছাত্রকে লইয়া সমস্ত দিন কার্য্য করিতেন ; ঐ জন্য ছাত্রগণ পারিশ্রমিকও পাইত। ছাত্রগণ গড়পড়তা মাসে ১৬।১৭ টাকা পাইত। এই সময়ই লেজিসলেটিব কৌন্‌সিল গৃহের প্লাষ্টারের কাজ, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ, মেসার্স চার্লস্‌ নেফিউ কোম্পানিদের গৃহ প্রভৃতির জন্য প্লাষ্টারের কাজ তাঁহাদিগের দ্বারা নিষ্পন্ন হয়।

এই সময়ে বঙ্গদেশের প্রথম আর্ট ষ্টুডিও স্থাপিত হয়। বিদ্যালয়ের চারিজন ছাত্র (দিননাথ দাস, নবীনচন্দ্র ঘোষ, হীরালাল দাস ও তিনকড়ি মজুমদার) ১নং জিগ্‌জাগ্‌ লেন কসাইটোলায় পেন্‌টিং, লিথোগ্রাফি, ডেকোরেসন, এন্‌গ্রেভিং প্রভৃতি বিষয় অবলম্বন করিয়া কার্য্য আরম্ভ করেন।

ষোড়শ অধ্যায়

বিধবা বিবাহ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়—বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী—ডালহৌসীর কার্য্যত্যাগ—লর্ড ক্যানিং—প্রথম নাট্যাভিনয়—প্রথম ঐক্যতানবাদ্য সৃষ্টি—শকুন্তলা অভিনয়—বিধবা বিবাহ অভিনয়—প্রসিদ্ধ নাট্যামোদীগণ—সংগীত সংস্কার ও পাথুরিয়াঘাটার রাজভ্রাতৃদ্বয়—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান—কেশবচন্দ্রের জীবনী—সোমপ্রকাশ ও বিদ্যাভূষণ মহাশয়—মহারাজ্ঞীর ঘোষণাপত্র—উপসংহার

পূর্ব্ব অধ্যায়ে যে আর্ট ষ্টুডিওর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এক্ষণে আর বর্ত্তমান নাই।

খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দে জগদ্বিখ্যাত দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যত্নে বিধবাবিবাহ বিধি বিধিবদ্ধ হয়।

যদিও সুপরিচিত বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই, তথাপি এই প্রবন্ধের রীতি অনুসারে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে প্রকটিত হইল।

ইনি জেলা হুগলির অন্তর্গত থানাকুলের সন্নিহিত বীরসিংহ (বীরসিঙ্গা) গ্রামে ১৭৪২ শকের ১২ই আশ্বিন জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় বাল্যকালে পাঠশালায় সামান্যরূপ লেখাপড়া শিখিয়া ৯ বৎসর বয়সে পিতার নিকট কলিকাতায় আসেন। ১৮২৯ অব্দের ১লা জুন এখানে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হন। ইঁহার পিতার অবস্থা ভাল ছিল না, এজন্য ইঁহাকে কদর্য্য স্থানে বাস, সামান্য দ্রব্য ভক্ষণ ও কুৎসিত শয্যায় শয়ন করিয়া যৎপরোনাস্তি ক্লেশভোগ করিতে হইয়াছিল। খ্রীঃ ১৮৪৬ অব্দের নবেম্বর পর্য্যন্ত সংস্কৃত কালেজে অধ্যয়ন করেন। খ্রীঃ ১৮৩৯ অব্দে "হিন্দু-ল" বিষয়ে পরীক্ষা দিয়া প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হন। কালেজে মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রভৃতি তাঁহার প্রিয়তম সহাধ্যায়ী ছিলেন। ইনি প্রথমে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজে পণ্ডিত হন, তৎপরে সংস্কৃত কালেজের এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি হন। কিন্তু সেক্রেটারির সহিত মতের অনৈক্য হওয়াতে কর্ম্মত্যাগ করেন। তৎপরে ফোর্টউইলিয়ম কালেজের হেড কেরাণী, পরে সংস্কৃত কালেজের সাহিত্যাধ্যাপক হন। এই সময়ে পূর্ব্বতন সেক্রেটারি পদত্যাগ করাতে ইনি তৎপদে নিযুক্ত হন। ইনি সংস্কৃত কালেজ কিরূপে চালিত হওয়া উচিত তৎপক্ষে এডুকেশন কৌন্সিলে এক রিপোর্ট করেন, তদ্দর্শনে কৌন্সিল সন্তুষ্ট হন এবং কিছুদিন পরে সেক্রেটারি ও এসিষ্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি এই দুই পদ উঠাইয়া দিয়া প্রিন্সিপাল পদ সৃষ্টি করিয়া সেই পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। তাঁহার কথিত উপায়ে এক্ষণে কালেজে শিক্ষা প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, তৎপরে তিনি বিদ্যালয় সমূহের এসিষ্ট্যাণ্ট ইনেস্পেক্টর হন। ১৮৮৫ অব্দে কর্ত্তৃপক্ষগণের উপর অসন্তুষ্ট হইয়া পদত্যাগ করেন। ইনি ক্রমে ক্রমে বাসুদেবচরিত, বেতাল পঞ্চ-বিংশতি, বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ, জীবনচরিত, বোধোদয়, উপক্রমণিকা তিনভাগ ব্যাকরণ কৌমুদী, বাঙ্গালা শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ উচিত কিনা? ২ খণ্ড, ২ ভাগ বর্ণপরিচয়, চরিতাবলী, কথামালা, সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ, সীতার বনবাস, চতুর্থ ভাগ কৌমুদী, ভ্রান্তিবিলাস,

বহু বিবাহ হওয়া উচিত কি না? প্রভৃতি পুস্তক রচনা করেন; প্রথমখানি এবং আরও কতকগুলি পুস্তক অপ্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ঋজুপাঠত্রয় প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থও তিনি সংকলিত ও প্রকাশিত করেন।

বিধবা বিবাহ প্রচলিত করিবার জন্ত তাঁহাকে অনেক কষ্ট ও অর্থব্যয় করিতে হয়। ইনি নিজপুত্রকে বিধবার সহিত বিবাহ দিয়াছেন।

ইঁহার স্থাপিত মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ও ইঁহার একটি কীর্ত্তি। বোধহয় উহা শাখাদি পরিবৃত হইয়া চিরকাল তাঁহার নামের পতাকাস্বরূপ বর্ত্তমান থাকিবে।

ইং খ্রীঃ ১৮৫৬ অব্দেই—ইদন উদ্যানে, ব্রহ্মদেশীয় পাগোদা আনীত হইয়া স্থাপিত হয়। এই অব্দেই ডালহৌসি পদত্যাগ করেন এবং তৎপদে মহাত্মা ক্যানিং আগমন করেন।

এই সময়ে এ দেশে প্রথম নাট্য অভিনয় আরম্ভ হয় এবং পাথুরিয়াঘাটার রাজপরিবারে প্রথম ঐকতান বাদ্য সৃষ্ট হয়।

খ্রীঃ ১৮৫৭ অব্দে সিমুলিয়ার আশুতোষ দেব (ছাতু বাবু) মহাশয়ের বাটীতে শকুন্তলা নাটক প্রথম অভিনীত হয়। বঙ্গ রঙ্গভূমির সুপ্রসিদ্ধ অধ্যক্ষ মৃত শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহাশয় তাহাতে শকুন্তলা সাজিতেন।

তৎপরবৎসর কলুটোলার মেট্রপলিটন ইনষ্টিটিউসনে স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে বিধবা বিবাহ নাটক অভিনীত হয়, বঙ্গ রঙ্গভূমির বর্ত্তমান সুযোগ্য তত্ত্বাবধায়ক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় তাহাতে নায়িকা সুলোচনার অংশ অভিনয় করিতেন।

আশুতোষ দেব মহাশয় নিতান্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন; তাঁহার রচিত অনেক গীত আজিও বর্ত্তমান আছে। মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, পাইক পাড়ার মৃত রাজা প্রতাপ নারায়ণ সিংহ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ইঁহারা নাট্যামোদী ছিলেন।

ক্যানিং সাহেবের সময়েই সিপাহী বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

উপরে উল্লেখ করা হইয়াছে যে পাথুরিয়াঘাটার রাজ পরিবারে প্রথম ঐকতান বাদ্য সৃষ্টি হয়। রাজভ্রাতৃদ্বয় যতীন্দ্রমোহন ও সৌরীন্দ্রমোহন, মৃত সঙ্গীতাচার্য্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী মহাশয়ের সাহায্যে মৃত সংগীতশাস্ত্রের এক প্রকার পুনরুদ্ধার করিয়াছেন বলা যাইতে পারে।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন।

ইনি খ্রীঃ ১৮৩৮ অব্দের ১৯ এ নবেম্বর কলিকাতার অন্তঃপাতী কলুটোলায়

জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺প্যারীমোহন সেন। কেশবচন্দ্র সুবিখ্যাত অভিধানকার রামকমল সেন মহাশয়ের পৌত্র; অতি অল্প বয়সেই ইঁহার পিতৃবিয়োগ হয়। অষ্টম বর্ষ বয়সে ইনি হিন্দু কালেজে প্রবিষ্ট হন। এখানে তিনি সেকেণ্ড সিনিয়ার ক্লাস পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। এক্ষণকার বি, এ, পরীক্ষার্থীদিগকে যতদুর পড়িতে হয় তিনি ততদুর পড়িয়াছিলেন। যৌবনে ইনি ইংরাজ কবিদিগের কাব্য পড়িতে বড়ই ভালবাসিতেন। সেক্সপিয়রের রচনা এত ভালবাসিতেন, যে তিনি ১৮৫৭ অব্দে নিজ পৈতৃক বাসগ্রামে হ্যামলেট অভিনয় করেন, সেই অভিনয়ে তিনি রঙ্গমঞ্চ ও দৃশ্যপট নিজে প্রস্তুত করিয়াছিলেন। খ্রী: ১৮৫৫ অব্দে ইনি কলুটোলায় একটি বাল্য বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তথায় বন্ধুগণের সহিত মিলিত হইয়া তিনি দরিদ্র বালক ও শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষা দিতেন।

খ্রী: ১৮৫৬ অব্দের ২৭ এ এপ্রেল তাঁহার বিবাহ হয়। হাবড়ার সন্নিহিত বালি গ্রামের চন্দ্রকুমার মজুমদারের কন্যা ইঁহার সহধর্ম্মিণী। ইনি ধর্ম্মগ্রন্থ আলোচনা করিতে বড় ভালবাসিতেন। বাইবেল তাঁহার প্রিয় গ্রন্থ ছিল। লাট পাদরী বাবল সাহেবের নিকট তিনি বাইবেল পাঠ করিতেন।

ব্রাহ্ম বলিয়া আদি সমাজে প্রবেশের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি পক্ষে তিনি অশেষ যত্ন করেন।

খ্রী: ১৮৫৯ অব্দে ইনি আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের সঙ্গে সিংহলে গমন করেন। ইহার পরে তিনি 'ইয়ংবেঙ্গল' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকটিত করেন। এই সময়েই সংগীত সভা স্থাপিত হয়। জাতিভেদ ত্যাগ, ব্রাহ্ম সামাজিক অনুষ্ঠান, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ প্রভৃতি তাঁহার সভায় আলোচ্য ছিল।

বিধবা বিবাহ সমর্থন জন্য তিনি খ্রী: ১৮৫৯ অব্দে কলুটোলায় মেট্রপলিটন বিদ্যালয়ে উমেশচন্দ্র মিত্রের বিধবা বিবাহ নাটক অভিনয় করিয়াছিলেন, এই সম্প্রদায়ে তিনি নিজে অভিনয় শিক্ষক ছিলেন।

সংগীত প্রচার হইতেই ব্রাহ্ম প্রচারক দলের সৃষ্টি। ইনি নিজে প্রথম বয়সেই বোম্বাই ও মাদ্রাজে প্রচারকার্য্য করিয়াছিলেন।

খ্রী: ১৮৬৮ অব্দে তিনি ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাহাতে নিজের ধর্ম্মমত প্রচার করিতে আরম্ভ করেন।

ইনি আজন্ম বাগ্মী। ইঁহার বাগ্মীতার পরিচয় আমাদের দিতে হইবে না। সমস্ত পৃথিবীই বিশেষরূপে অবগত আছে।

তাঁহার মতবৈপরীত্যে তিনি আদি সমাজ ছাড়িয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন।

ইহার পরই ব্রাহ্ম বিবাহ বিধিবদ্ধ করাইয়া লন।

তৎপরে তিনি বিলাতে গমন করেন। সে সমুদায় বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা প্রস্তাব বর্দ্ধিত করিব না, শুদ্ধ এইমাত্র বলিব যে বিলাতে তিনি রাজনৈতিক আলোচনাও করিয়াছিলেন। বিলাত হইতে আসিয়া তিনি যে সকল কার্য্য করেন, তাহার মধ্যে ভারত সংস্কারক সভা স্থাপন প্রধান। সুলভ সাহিত্য প্রচার, দাতব্য, শ্রমজীবিদিগকে শিক্ষাদান, স্ত্রীশিক্ষা প্রচার, সুরাপান নিবারণ এই পাঁচ বিভাগে সভা বিভক্ত। প্রথম বিভাগ হইতে 'সুলভ সমাচার' স্থাপিত হয়। দাতব্য বিভাগ হইতে সুশিক্ষা দানে সাহায্য প্রদত্ত হয়। শ্রমজীবিদের জন্য একটি ব্যবস্থা ও স্ত্রীলোকদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। শেষ বিভাগ হইতে 'মদ না গরল' নামে একখানি পত্রিকা প্রকাশিত হইয়া বিনামূল্যে বিতরিত হইত।

কুচবিহারী বিবাহ সম্বন্ধে আমরা এ প্রস্তাবে কোন কথাই বলিব না। সেদিনকার ঘটনা যিনি যেভাবে লইয়াছেন তিনি সেইভাবে গ্রহণ করুন; যদি এ সম্বন্ধে ভাল করিয়া কিছু জানিবার অভিপ্রায় থাকে "কেশব চরিত" পাঠ করুন, এইমাত্র বলিতে পারি।

কুক্ষণে তাঁহার এমন রোগ জন্মিল যে এ জগতে তাহা আরোগ্য হইল না।

১২৯০ সালের ২৫এ পৌষ তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন।

কেশবচন্দ্র এ দেশের উন্নতির এক প্রধান মূল বলিতে হইবে।

খ্রীঃ ১৮৫৮ অব্দের নবেম্বর মাস হইতে সোমপ্রকাশ প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। স্বর্গীয় দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয় ইহার প্রথম হইতে সম্পাদকতা করেন।

১৭৪২ শকে (খ্রীঃ ১৮২০ অব্দে) কলিকাতাস্থ দক্ষিণ চাঙ্গাড়িপোতা গ্রামে ৺হরচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ঔরসে ইঁহার জন্ম হয়। ইনি দাক্ষিণাত্য বৈদিক বংশ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। খ্রীঃ ১৮৩২ অব্দে সংস্কৃত কালেজে প্রবেশ করিয়া খ্রীঃ ১৮৪৫ অব্দ পর্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করেন, পরে ঐ কালেজে পুস্তকাধ্যক্ষ হন। অতি অল্পদিন পরেই তথাকার ব্যাকরণ শাস্ত্রের অধ্যাপক হন। যৎকালে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রিন্সিপাল হন তৎকালে ইনি কিছুদিন তাঁহার সহকারী ছিলেন। তৎপরে বহুকাল সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপকের কার্য্য করেন। তৎপরে

বহুদিন পেন্সন লইয়া জন্মভূমিতে বাস করিয়াছিলেন। ইনি যৎকালে সংস্কৃত বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেন সেই সময় স্বদেশে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন; বহুদিন নানা দেশহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া শেষদশায় বহুমূত্র রোগাক্রান্ত হন। তদানুষঙ্গিক কারবাঙ্কল রোগে ৫৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

সোমপ্রকাশ আজিও প্রকাশিত হইতেছে। কিন্তু আগের সে প্রভা এখন নাই।

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে মহারাণী স্বীয় করে ভারত রাজ্য গ্রহণ করেন। সেই সময়ে তিনি যে ঘোষণাপত্র প্রকাশিত করেন তাহাতে সমস্ত ইংরাজাধিকৃত ভারতের দুঃখ-সম্পদের দায়িত্ব তিনি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছেন।

ঐ সকল অতি অল্প দিনের ঘটনা; যাঁহারা এ সকল প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন তাঁহারা এখনও অনেকেই জীবিত আছেন। ইহার পর কলিকাতার উন্নতি যদিও খুব দ্রুত হইয়াছে তথাপি তাহা আজিও সাধারণের স্মৃতিপথে জাগরূক আছে, এজন্য আমরা এইখানেই কলিকাতার ইতিহাস সমাপ্ত করিলাম।

শরচ্চন্দ্র দেব

১. "The Sirkar of Satgawn contained, among others, the three towns of Calcutta, Barbakpur, Bakuya jointly paying into the Imperial Exchequer the annual sum of Rs 23,405."***"The spelling given in the Ai'n is 'Kalkatta as pronounced by the natives now-a-days."—J. B. Knight's *Calcutta,* p. I

২. গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

৩. "Calcutta is a place known from remote antiquity. The ancient Hindus called it by the name of Kalikshetra. It extended from *Bahula* to *Dakhinashar*. *Bahula* is modern *Behala*, and the site of *Dakhinashar* still exists.

According to the purans a portion of the mangled corpse of SATI or KALI fell somewhere with that boundary; whence the place was called *Kalikshetra.* Calcutta (Kalikata) is a corruption of *Kalikshetra.* In the time of Bolálsen it was assigned to the descendant's of *Sera.—Pundit Padmanav Ghoshál's letter, dated Calcutta July 1873 in the Indian Antiquary.*

৪. গৌড়ীয় ভাষাতত্ত্ব, প্রথম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

৫. বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৪৯-৫০ পৃষ্ঠা দেখ।

৬. Mr. Job Charnock অথবা Jobus Charnock.

৭. Received its name from the famous old tree, which stood there and formed a "Baitak-Khana" or resting place for the merchants who traded to Calcutta and whose caravans rested under its shade. "Here the merchants met to depart in bodies from Calcutta to protect each other from robbers in the neighbouring jungle, and here they dispersed when they arrived at Calcutta with merchandise for the Factory".

J. B. Knight's *Calcutta*

৮. বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙ্গালার ইতিহাস ৫৮ পৃঃ।

৯. St John's Church (সেণ্টজনস চার্চ্চ) বা পাথুরিয়া গির্জার সন্নিহিত ভূমিতে ইঁহার স্মরণস্তম্ভে এইরূপ লিপি আছে—

"Under this stone lies interred the body of
William Hamilton Surgeon.

Who departed this life, 4th December, 1717.

"His memory ought to be dear to his nation, for the credit he gained the English, in curing Ferruksier, present king of Indostan, of a malignant distemper, by which he made his own name famous at the court of that great monarch, and without doubt, will perpetuate his memory as well in Great Britain as other nations of Europe."

এই লিপি পারসী ভাষাতেও আছে। *J. B. Knight's, Calcutta* p. 120.

১০. এইরূপ বর্ণনা ঐ সময়ে প্রকাশিত বিলাতী *Gentleman's Magazine* নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

১১. বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত ভারতের ইতিহাস ইংরাজ রাজত্ব, ৩১-৩২ পৃষ্ঠা।

১২. Vide W. W. *Hunter's Brief History of the Indian People* p. 166.

১৩. *J. B. Knight's Calcutta* p, 14-15.

১৪. *Martin's Medical Topography of Calcutta.*

১৫. মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী। ৮১ পৃষ্ঠা।

১৬. শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ৪-৮ পৃঃ।

১৭. শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাস।

নির্দেশিকা

গ্রন্থ-পরিচিতি

প্রাক্-মুদ্রণ যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রাসঙ্গিকভাবে কোথাও কোথাও কলকাতার উল্লেখ দেখা গেছে। কিন্তু শহর কলকাতার কোন পরিচয় সেখানে নেই। কারণ গদ্যের বিকাশ তখনো ঘটেনি। মুদ্রণের যুগে কলকাতার সর্বপ্রাচীন পরিচয় আমরা পেয়েছি সেটি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে। ২৪ এপ্রিল, ১৮১৯ তারিখের "সমাচার দর্পণ" পত্রিকায় মুদ্রিত 'কলিকাতার বিবরণ' শীর্ষক এই সংক্ষিপ্ততম ইতিহাস সম্প্রতি 'পুরশ্রী' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছে (হরিপদ ভৌমিক, 'সেকালের সংবাদপত্রে কলকাতার কথা : সমাচার দর্পণ'। পুরশ্রী, ৩য় বর্ষ, ২৩শ সংখ্যা, ১১ এপ্রিল ১৯৮১, পৃ. ৬০৮)। আমরা বিবরণটি এখানে পুনরুদ্ধার করলাম।

কলিকাতার বিবরণ

এক শত আটাইশ বৎসর হইল যখন আওরঙ্গজেব বাদশাহের সহিত ইংগ্লণ্ডীয় বাণিজ্যের কুঠীর সাহেবেরদের সৌহৃদ্য হইল তখন চার্নক সাহেব ইংগ্লণ্ডীয়েরদের পক্ষে অধ্যক্ষ ছিলেন তখন হুগলিতে ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতি ছিল সেই পূর্ব্বোক্ত সনে চার্নক সাহেব প্রথম মোং কলিকাতায় গিয়া ইংগ্লণ্ডীয়েরদের বসতির বীজরোপণ করিলেন এবং মোং চানকে প্রথম ঐ চার্নক সাহেব আপনার বসতির কারণ এক বাঙ্গালা করিলেন তদবধি তাহার নাম চানক হইল। চার্নক সাহেব কলিকাতায় বসতি করিলে দুই বৎসর পরে আপনি মরিলেন। তাহার চারি বৎসর পরে কলিকাতার পুরাণা কিল্লা গাঁথা গেল তাহাকেই এখন পুরাণা কুঠী বলে।

সতর শত সাইত্রিশ সনে ১১ অক্তুবরে এক মহাঝড় হইল ও ঝড় কালীন বৃহৎ ভূমিকম্প হইল। সে সময়ে কলিকাতার দুই শত পাকা ঘর পড়িয়া গেল এবং কলিকাতার বড় গ্রিজা ঘরের চূড়া ভাঙ্গিয়া ভূমিতে পড়িল ও জাহাজ ও নৌকা প্রভৃতি বিশ ছাজার [হাজার] মারা পড়িল এবং ইংগ্লণ্ডীয়েরদের নয় জাহাজের মধ্যে আট জাহাজ মারা পড়িল ওলন্দেজের-

দের চারি জাহাজের মধ্যে তিন জাহাজ নষ্ট হইল। আর অতিশয় ভারি বোঝাই নৌকা ঐ সময়ে অর্দ্ধ ক্রোশপর্য্যন্ত ভূমিতে উঠিল তিন লক্ষ লোক মারা পড়িল।

ইহার পরে বিশ বৎসর গত হইলে সতর শত সাতান্ন সালে নবাব সিরাজদ্দৌলা দুরাচার অন্যায়সিন্ধু কলিকাতায় আসিয়া অনেক জন ইংগ্লণ্ডীয়েরদিগকে এক অতি ক্ষুদ্র কুঠরীতে বদ্ধ করিয়া সমুদায় রাত্রি সেখানে রাখিল তাহাতে বায়ুর গমন রোধ প্রযুক্ত অল্প জন ব্যতিরিক্ত আর সকলে সেই রাত্রিতে মরিলেন। সেই উপপ্লবেতে কলিকাতার ক্ষুদ্র ২ ঘর ও বাটী ও কাগজপত্র অনেক নষ্ট হইল।

তারপর লর্ড ক্লীব সাহেব মোং মান্দরাজ হইতে সাত শত গোরা ও বারো শত সিপাহী আনিয়া মোং কলিকাতায় পঁহুছিলেন তখন নবাব সিরাজদ্দৌলা মুরশেদাবাদে ফিরিয়া গিয়াছিল। নবাব সিরাজদ্দৌলার সৈন্যের সেনাপতি মীর জাফরালী খাঁ লর্ড ক্লীব সাহেবকে পূর্ব্বে লিখিয়াছিল যে তুমি মোং কাটোয়াতে আসিবা আমি সেইখানে তোমার সহিত মিলিব। এই লিখনানুসারে লর্ড ক্লীব সাহেব মোং কটোয়াতে গিয়া পুনর্ব্বার মীর জাফরালী খাঁর পত্র পাইলেন তাহাতে মীর জাফর এই লিখিয়াছেন যে তোমার সহিত যে আমার মিলিবার কথা ছিল তাহা এখানে প্রকাশ হওয়াতে যাইতে পারিলাম না। ইহা শুনিয়া বড় সাহেব কলিকাতা না আসিয়া মোং পলাশীতে গিয়া থাকিলেন ঐ পলাশিতে নবাব সিরাজদ্দৌলার সহিত ইংগ্লণ্ডীয়েরদের মহাযুদ্ধ হওয়াতে সিরাজদ্দৌলা পলাইলে ইংগ্লণ্ডীয়েরা মীর জাফরালী খাঁকে বাঙ্গালার নবাবি দিলেন কিছু দিন পরে পুনর্ব্বার কলিকাতা শহর গাঁথিতে আরম্ভ হইল। সে বাষট্টি বৎসর হইল। এই বাষট্টি বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহর কত বড় হইয়াছে তাহা লিখা ভার এতৎকালীন কলিকাতা দেখিয়া পূর্ব্বকালীন কলিকাতা মনে ভাবিলে বিস্ময় বোধ হয় তখন যে স্থানে ছয় হাজার টাকার ইমারত পাওয়া ভার ছিল এখন সেই স্থানে অনুমান তিন কোটি টাকার অধিকের পাকা ঘর দেখা যাইতেছে। অন্য ২ ধন সম্পত্তি প্রভৃতির বিষয় কত লিখিব।

কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ই সম্ভবতঃ প্রথম বাঙালী, যিনি বাংলা ভাষায় কলকাতার ইতিহাস লিখেছিলেন। তাঁর 'কলিকাতা কল্পলতা' আনুমানিক

১৮৫১ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে প্রথম লেখা হয় এবং অন্তত ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এর সংশোধন করেছিলেন। তাঁর রচনা সেকালে প্রকাশিত হয়নি। তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরে তাঁর প্রপৌত্র শিবলাল বন্দ্যোপাধ্যায় 'রঙ্গলাল রচনাসংগ্রহ' (১৯৫৯ খ্রীঃ) গ্রন্থে এটি প্রকাশ করেন। পাণ্ডুলিপিটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে শরচ্চন্দ্র দেব 'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকায় 'কলিকাতার ইতিহাস' নামে যে ধারাবাহিক রচনাটি লেখেন, সেটি মূলতঃ কলকাতাকে কেন্দ্র করে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও প্রসারের কাহিনী। এর সময়সীমা উনিশ শতকের মাঝামাঝি কাল পর্য্যন্ত। কলকাতার নানা সভাসমিতি, সামাজিক আন্দোলন, এবং স্মরণীয় ব্যক্তিদের পরিচয়ও এই রচনায় বর্ণিত।

'শিল্পপুষ্পাঞ্জলি' পত্রিকার প্রথম সম্পাদক ছিলেন শরচ্চন্দ্র দেব (পৌষ ১২৯২ পর্য্যন্ত); পরবর্তী সম্পাদক হন অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। এই পত্রিকায় 'কলিকাতার ইতিহাস' প্রকাশের বিবরণটি নিম্নরূপ :

১২৯২	শ্রাবণ	১ম-২য় অধ্যায়
	ভাদ্র	৩য় অধ্যায়
	আশ্বিন	৪র্থ-৭ম অধ্যায়
	কার্তিক	৮ম-৯ম অধ্যায়
	অগ্রহায়ণ	১০ম অধ্যায়
	পৌষ	১১শ অধ্যায়
	মাঘ	১২শ অধ্যায়
	চৈত্র	১৩শ অধ্যায়
১২৯৩	বৈশাখ	১৪শ-১৫শ অধ্যায়
	জ্যৈষ্ঠ	১৬শ অধ্যায়

এই রচনাটি পরবর্তীকালে রামগোপাল সেনগুপ্ত সম্পাদিত 'বীণাপাণি' পত্রিকায় পুনর্মুদ্রিত হয়েছিল (আষাঢ়-আশ্বিন ১৩০২)।

প্রাণকৃষ্ণ দত্তের 'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' দেবীপ্রসন্ন রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'নব্যভারত' পত্রিকায় অনিয়মিত ১০টি কিস্তিতে প্রকাশিত হয় (১৯০১-০৪খ্রী.)।

বাংলা ভাষায় নেটিভ কলকাতার ইতিহাস রচনায় প্রয়াস এই প্রথম। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত এই শহরেরই একটি প্রাচীন পরিবারের সন্তান ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে এর বেশি কোন পরিচয় আমরা পাইনি। তিনি দেশী ও বিদেশী নানা গ্রন্থ থেকে তথ্য আহরণ করেছেন। এর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা ও সেকালের প্রবীণ ব্যক্তিদের সান্নিধ্যে সংগৃহীত তথ্য ও যুক্ত হওয়ায় রচনাটি সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এই বইয়ের সব থেকে মূল্যবান অংশ 'কয়েকটি প্রাচীন পরিবার' ও 'প্রাচীন আচার ব্যবহার' শীর্ষক অধ্যায়গুলি। সেকালের কলকাতার রীতিনীতি, পাল-পার্বণ, আচার ব্যবহার, ধর্মকর্ম সবকিছুরই অন্তরঙ্গ পরিচয় এখানে রয়েছে, যা লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে উজ্জ্বল। এই পরিচয় অন্যত্র দুর্লভ।

'কলিকাতার ইতিবৃত্ত' সাময়িকপত্রে প্রকাশের বিবরণটি নিম্নরূপ :

১৩০৮ আশ্বিন	(১)	ভূতত্ত্ব
কার্ত্তিক	(২)	কালীঘাট
পৌষ	(৩)	
চৈত্র	(৪)	
১৩০৯ বৈশাখ	(৫)	
জ্যৈষ্ঠ	(৬)	
শ্রাবণ	(৭)	
কার্ত্তিক	(৮)	
পৌষ	(৯)	
চৈত্র	(১০)	প্রাচীন আচার ব্যবহার
১৩১০ বৈশাখ	(১১)	ঐ
ভাদ্র	(১২)	ঐ
অগ্রহায়ণ	(১৩)	ঐ
মাঘ	(১৪)	

উপরিধৃত তালিকায় যেগুলির শিরোনাম নেই সেগুলির শিরোনাম আমাদের দেওয়া। ৪র্থ সংখ্যক কিস্তির রচনাটিকে 'সন্নিহিত জনপদ' ও 'কয়েকটি প্রাচীন পরিবার — ১' এই শীর্ষকে বিভক্ত করা হয়েছে।

পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে পুরাতন বানানপদ্ধতি যথাসম্ভব অক্ষুন্ন রাখা হয়েছে।

দ্বিত্ব] বা 'য'-ফলা' বর্জন করা হয় নি। শুধুমাত্র ভুল বানানের ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে এবং বানানের সমতা রাখতে সাধ্যমত চেষ্টা করা হয়েছে। অন্যবিধ মুদ্রণপ্রমাদ ও ছেদচিহ্নেরও সংশোধন করা হয়েছে। পাদটীকার ক্ষেত্রে দুই অংশে দুইরকম পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে। 'কলিকাতার ইতিবৃত্তে' পাদটীকাগুলি প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে দেওয়া হয়েছে ; আর পরিশিষ্ট অংশে প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে পাদটীকা না দিয়ে একেবারে রচনার শেষে দেওয়া হয়েছে। পাদটীকাগুলি সংখ্যাক্রমে চিহ্নিত করা হয়েছে, যা পত্রিকায় ছিল না।

———